অনুবাদক : ভগীরথ শীল

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২-বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
ছবিরাণী হাজরা
দিবাকর মুদ্রণ
৫৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৬

সিংহ সেনাপতি

তক্ষশীলায় আচার্য বহুলাশ্বের সামনে

× × × × [অন্যান্য সাথীদের] পর আমি আচার্যের সামনে উপস্থিত হলাম। আচার্য বহুলাশ্ব জিজ্ঞাসা করলেন —তোমার নাম-গোত্র কি, বৎস ?

ঢালখানা হাত থেকে আচার্যের সামনে নামিয়ে রেখে বললাম —গোত্র কাশ্যপ, নাম সিংহ।

আচার্য নানাস্থানে লোহার কাঁটা লাগানো সেই ঢালখানি হাতে নিয়ে বললেন —ঢালখানি তো বেশ সুন্দর আর মজবুত দেখছি।

—আমার পিতার নিজের শিকার করা গণ্ডারের চামড়া থেকে যে ঢাল-গুলি তৈরী হয়েছিলো, এটি তার অন্যতম।

—তাহলে বৎস সিংহ! তোমার পিতা জানেন যে তক্ষশীলাবাসীর প্রিয় বস্তু কি। তাই তিনি নিজে এটি তৈরী করে পাঠিয়েছেন।

—কিন্তু আচার্য আমার পিতা তেরো বছর আগে পরলোকগমন করে-ছেন। সে সময় আমার বয়স ছিলো মাত্র পাঁচ বছর।

—আহা বৎস। পিতৃহীন পুত্রের কষ্ট আমি বেশ অনুভব করতে পারি। আমারও পিতার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিলো মোটে আট বছর। কিন্তু আমার তিনটি বড়ো ভাই এবং মা ছিলেন। তোমারও মা জীবিত আছেন তো ?

—হ্যাঁ, আমার পুত্র-প্রাণ মা জীবিত আছেন। আমি তাঁর প্রথম সন্তান। তিনি আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নতুন স্বামী আমার দ্বিতীয় পিতৃতুল্যই হয়েছেন। তাঁরই কৃপায় আমি কিছু শিক্ষা-লাভ করেছি।

—তবে তো বৎস, তুমি শুল্ক দিয়ে পড়তে পারবে বলে।আমার মনে হয় না। কিন্তু সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না। তোমার মতো নিঃসম্বল অন্তেবাসীর [শিষ্যের] জন্যে বহুলাশ্বের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত।

—আচার্যের এই অসীম করুণার জন্যে মুখে আর কি বলবো!

—কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। তুমি নিজেকে আমার বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র প্রমাণ করো।

—আমি সেই চেষ্টাই করবো আচার্য! এবং বৈশালীতে যেমন আচার্য

মহালীর যোগ্য শিষ্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এখানেও সেই-রকমই করবো।

—ও! তুমি বৈশালী গণ-এর অধিবাসী। পূর্বের বজ্জি দেশ থেকে এসেছো? তাছাড়া আমার মিত্র এবং সহপাঠী আচার্য মহালী লিচ্ছবির শিষ্য তুমি? শুনে বড়ো খুশী হলাম। বৎস সিংহ! তুমি তক্ষশীলাকে বৈশালী বলেই মনে করবে। পূর্বে একমাত্র বৈশালীই আছে, আমরা যার গর্ব করতে পারি। আর সব জায়গায়ই তো রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। —কুরু, পঞ্চাল, বৎস, কোশল, মগধ সবই রাজতন্ত্রের অধীন। ওখানে আর্যত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে কাঁধের ওপর মাথা সিধে রেখে চলার মতো পুরুষ কোথায়? এই রাজা-রাজড়ারা নিজেদের দেবতাও বলে, আবার আর্যও বলে। আর্যরা ভাই-ভাই হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ দেবতা বা রাজা হতে পারে না। সতলজের এপারে কোনোও রাজাকে দেখেছো কি বৎস?

—না, আচার্য।

—হ্যাঁ, পুত্র। আমাদের সপ্তসিন্ধুতে 'মল্ল'তেই যাও, 'মদ্র'তেই যাও আর পূর্ব গান্ধারেই যাও, সব জায়গাতেই গণ-শাসন পাবে। এখানে কোনো রাজা নেই। বৈশালীর মতোই তক্ষশীলা আর সাগল (শিয়ালকোট)-এ গণ-সঙ্ঘের শাসন। রাজতন্ত্রের সমুদ্রে পূর্বে বৈশালীই একমাত্র গণ-দ্বীপ। হ্যাঁ—ওই একটিই—শাক্য, কোলিয়, মল্ল তো নামমাত্র 'গণ'। কোশলের রাজা—কি যেন তাঁর নাম?

—প্রসেনজিৎ, আচার্য।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রসেনজিৎ। তিনি আমাদের আচার্য ভূরিশ্রবার কাছে পড়তেন। একেবারে মেধাশূন্য ছিলেন। তবে তাঁর ছিলো অর্থ—নইলে তিনি তক্ষশীলায় বিদ্যার্থীই হতে পারতেন না। পূর্ব থেকে আগত বিদ্যার্থীদের মধ্যে বন্ধুল মল্ল আর মহালীর ওপর আমাদের আচার্যের আস্থা ছিলো, আর আস্থা ছিলো কনিষ্ঠ গুরুভাইদের মধ্যে আমার ওপরও।

—বন্ধুল মল্ল, আচার্য! তিনি তো এখন কোশল রাজ্যের সেনাপতি!

—ধিক্ তাকে। রাজার অধীনে চাকরী করার চেয়ে না খেয়ে মরা ভালো ছিলো, বিষ খেয়ে মরাও ভালো ছিলো—কি বলো বৎস সিংহ!

—হ্যাঁ, আচার্য। আমরা গণ-পুরুষদের কাছে অন্তত এই আশাটুকু করতে পারি।

—বৎস সিংহ! আমরা পূর্ব দেশের গণগুলির ভাইদের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ যত্ন নিই। কেন জানো? আমরা তাদের পূর্ব দেশে আমাদের ধ্বজা-ধারী বলে মনে করি। আমরা স্বতন্ত্র মানুষ—আমরা আর্য। আর তাই

আমরা প্রত্যেক আর্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখতে চাই। আমাদের পূর্বজ কিছু ভ্রাতা এখান থেকে পূর্ব দেশে গিয়ে বাস করছেন। তাঁরা আর্যদের বিশেষত্ব ত্যাগ করে কুরু-পঞ্চালে গণ-জনের পরিবর্তে রাজতন্ত্র কায়েম করেছেন। সেই থেকে আমরাও তাঁদের পতিত বলে ধরে নিয়েছি। আমরা তাঁদের আর্য বলে মনে করি না। তাঁরা নিজেদের আর্য বলে বৃথাই প্রচার করেন। এই হলো আর্যদের দেশ, আর্যদের ধর্ম এখানেই প্রচলিত আছে —আর্যদের বর্ণ-রূপ এখানেই দেখা যাবে। হ্যাঁ বৎস —পূর্বের গণগুলির পুরুষদের এইজন্যেই আমরা প্রীতির চক্ষে দেখি। তাদের বর্ণ আর রূপ আমাদেরই মতো। মহালী লিচ্ছবিও এমনি ছিলেন, বন্ধুল মল্লও তাই। কিন্তু প্রসেন-জিতের মুখ দেখলেই তাকে বর্ণসংকর বলে মনে হয়।

হ্যাঁ আচার্য। রাজারা কামুক হয়ে থাকেন। আর কামের বশবর্তী হয়ে তাঁরা আর্য, অর্ধ-আর্য বা অনার্য কিছুরই প্রভেদ মানেন না। এইজন্যেই তাঁদের রক্তে আর্য-ধারা মিশে গেছে। তাঁরা বীর্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন।

—তাঁদের মাথা করেন! কোথাও একবার বাঁধ ভাঙলো, তো অমনি পাহাড়ের চেয়ে সুরক্ষিত পূর্বপুরুষদের বিশেষত্ব বর্ণসম্পত্তি ধুলোয় মিশে গেলো। যে আঙুলে সর্প দংশন করে, আমরা সে আঙুল কেটে ফেলি। যে ডালে ঘুণ ধরে, তাকে আমরা গাছে থাকতে দিই না। এই কারণেই তুমি এখানকার সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে গৌরবর্ণ দেখতে পাবে। সকলেরই কেশ পিঙ্গল, ধূসর বা পাণ্ডুর —সকলেরই চোখ নীল বা সুবর্ণের বর্ণ। এখনি তোমার আগে পূর্ব দেশের তিন জন তরুণ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলো —তাদের মধ্যে কি আর্যদের এই বর্ণসম্পদ দেখতে পেয়েছো?

—কিন্তু আচার্য! এর অন্য কারণও আছে। পূর্ব দেশে আর্যদের চেয়ে অনার্য আর অর্ধ-আর্যদের সংখ্যা অনেক বেশী। অবশ্য তারা আর্যদেরই অধীন। তবু তাদের এই সংখ্যাধিক্য আর্য-রক্ত দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

—কিন্তু তোমার রক্ত কেন দূষিত হয়নি বৎস? তোমাকে যদি আমার রোহিণীর পাশে দাঁড় করিয়ে দিই, তবে কে বলবে যে তুমি তার ভাই নও? ঠিক তেমনি পিঙ্গল কেশ, তেমনি অতসী-নীল নেত্র। মহালীকেও আমি এমনিই দেখেছিলাম, বন্ধুল মল্লকেও।

—কিন্তু এর জন্যে আমাদের পূর্ব দেশের গণগুলিকে কঠোর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হয়েছে। আমাদের পিতা-মাতারা কিছুতেই কোনোদিক দিয়ে বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে দেন না। আমরা নিজেদের কিংবা নিজেদের মতো কোনো গণ-এর বাইরে বিবাহ করি না। তবুও এর অর্থ এই নয় যে,

আমাদের দেশে অর্ধ-আর্য নেই। অনার্য কৃষ্ণবর্ণা দাসীই আমাদের ঘরে বেশী দেখা যায়।

—এ তো চিন্তার কথা বৎস! বড়োই চিন্তার কথা। আর্য-রক্ত অনার্য ক্ষেত্রে যাবে, আর তার ফলেই শুরু হবে আর্যদের সর্বনাশ। আমাদের এখানে দেখো—দাস-প্রথা নেই। কিছু অনার্য কর্মচারী—চাকর আছে। আমাদের গণ-শাসনে তাদের কোনো অধিকার নেই; কিন্তু সেজন্যে আমরা তাদের দেহকে কেনা-বেচার জিনিসও মনে করি না। অবশ্য সতলজের এপারে তুমি খুব কম অনার্যকেই দেখে থাকবে। আচ্ছা, এখন এ কথা থাক। বৈশালী গণ-এর কুশল তো? সৌম্য মহালী সুস্থ এবং প্রসন্ন আছেন নিশ্চয়!

—হ্যাঁ আচার্য! বৈশালী স্ফীত সমৃদ্ধ। তার ক্ষেত্রে গন্ধশালী জন্মায়, তার গাভীর দুধ-ঘি-মাংস লিচ্ছবিদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট রাখে। মল্ল, শাক্য, কৌলিয়দের কোশলরাজের চরণে অবনত দেখে মগধরাজ বিম্বিসার বৈশালীরও মাথা তাঁর কাছে নত করতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ এবং উত্তর অঙ্গ (অঙ্গুত্তরাপ) জয় করার পর তিনি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বৈশালীর সমস্ত বৈভব। কিন্তু লিচ্ছবিদের খড়্গ এখনো তীক্ষ্ণ, শরাসন এখনো শরশূন্য নয়, তাদের রক্তধারা এখনো উষ্ণ রয়েছে। লিচ্ছবিদের বাহুবলের কাছে মগধরাজের এমন শোচনীয় পরাজয় হয়েছিলো যে, তারপর তেরো বছর গত হয়েছে, মগধরাজের আর বৈশালীর দিকে চাইতে সাহস হয়নি। সেই যুদ্ধেই আমার পিতা দেহত্যাগ করেন।

—তবে তো বৎস বীরপুত্র তুমি। আচ্ছা, আমার ভ্রাতা মহালী তোমাকে কি কি শিক্ষা দিয়েছেন?

—আচার্য! আমি মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছি। মল্লযুদ্ধ, খড়্গযুদ্ধও জানি। ধনুকে শব্দ-বেধ, চল-বেধ জানি। অশ্ব, রথ, গজ, পদাতিক সেনার আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ কৌশল এবং ব্যূহ আর দুর্গ-রচনা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান প্রারম্ভিক।

—তবে তো বৎস, আঠারো বছর বয়েসে যতোটুকু জ্ঞান হওয়া উচিত, তুমি তার অনেক বেশী জ্ঞান অর্জন করেছো! কিন্তু বিদ্যার শেষ নেই—হবেও না। তা দিন দিন বেড়েই যাবে। আমার কাছে শুধু পূর্বের নয়, পশ্চিমেরও বিদ্যার্থীরা আসে। এখানে পশ্চিম গান্ধার, কম্বোজ, পর্শু [পারস্য], ববেরু [ব্যাবিলন] এবং যবন দেশেরও শিক্ষার্থী আছে। আমাদের এই দূর দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে শুধু ছাত্র নয়, তাদের কাছেও আমরা নতুন যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করে থাকি। এই যে পার্শব শাহ্‌ যবন বীরদের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন, তাতে যবনরা সম্পূর্ণ নতুন এক কৌশল অবলম্বন করেছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো সামুদ্রিক যুদ্ধ। কাজেই আমার বা

তোমার গণ-এর কাছে সেটা শিক্ষার গুরুত্ব শুধু বিদ্যা-বিলাস মাত্র। কিন্তু বৎস, এটুকু তো বুঝতে পারছো যে, যুদ্ধবিদ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা তক্ষশীলাবাসীরা এই ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবিদ্যার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়-গুলিকে পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যদি আমরা কেবল প্রাচীন বিদ্যাই শিক্ষা দিতে থাকি, তাহলে তক্ষশীলা কতোদিন তার স্থান বজায় রাখতে পারবে ? আর এইজন্যেই তক্ষশীলা তার উপযুক্ত সম্মান পেয়েছে। পূর্ব দিকে বৈশালী যতো দূর, পশ্চিম দিকে পার্শব শাহ্-এর রাজধানী পশুপুর ঠিক ততো দূরে। যবন তার থেকে অনেক দূরে হলেও তারা আমাদের মিত্র। —শত্রুর যে শত্রু, সে মিত্রই হয়। যবনরা শাহ্‌কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে, এই খবর আমাদের এই পূর্ব গান্ধারে পৌঁছানো মাত্র সব জায়গায় উৎসব-আনন্দের স্রোত বয়ে গিয়েছিলো। আমাদের দুঃখ এই যে, মহাসিন্ধুর ওপারের প্রদেশ পশ্চিম গান্ধার এখনো পার্শবদের হাতেই রয়েছে। শুধু তাই নয়, তখন যদি ওরা যবনদের কাছে পরাজিত না হতো, তাহলে ওরা তক্ষশীলার দিকে অগ্রসর হতো।

—আচার্য। পশ্চিম থেকে তক্ষশীলার যে ভয়, সেই ভয় আমাদের বৈশালীর মগধের কাছে। তক্ষশীলার ভীতির কারণ একটি —পশ্চিম থেকে। কিন্তু বৈশালীর পূর্ব আর দক্ষিণ —দু'দিকেই দুষ্ট বিম্বিসারের রাজত্ব। বিম্বিসার আজ চুপ করে থাকলেও যে-কোনো সময় আবার আক্রমণ করতে পারে —একথা আমরা লিচ্ছবি-কুমাররা সকলেই জানি।

—কিন্তু পার্শব শাহ্‌এর তুলনায় মগধরাজ কিছুই নয়। মহাসিন্ধু এখান থেকে তিন-চার দিনের পথ। সেখান থেকে যবন দেশ পর্যন্ত এই দুরাত্মার রাজত্ব। আমরা গান্ধারবাসীরা যুদ্ধবিদ্যায় কম পারদর্শী নই, কিন্তু তারা আমাদের অর্ধেক লোককে তাদের অধীন করে রেখেছে। এই আমাদের সবচেয়ে দুঃখ যে, এর জবাব আমরা দিতে পারছি না। যদি সপ্ত-সিন্ধুর সমস্ত গণ একত্র হতো, তবে হয়তো এর প্রতীকার হতে পারতো। কিন্তু একত্রিত হতে গেলে গণগুলির স্বাতন্ত্র্য ছাড়তে হবে, গণধর্ম বিসর্জন দিতে হবে।

—এই সমস্যা আমাদেরও সামনে এসেছিলো আচার্য। এইজন্যেই শাক্য, কৌলিয়, মল্লকে কোশলের চরণাশ্রিত হতে হয়েছে। কারণ তারা নিজেদের গণ-পরম্পরার বিরুদ্ধাচরণ করে এক হতে পারেনি, আর আলাদা আলাদা থেকে কোশলসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তিও তাদের ছিলো না।

……আর সেই কোশলের সেনাপতি হলেন বন্ধুল মল্ল। ধিক্ তাঁকে।

—সবাই ধিক্কার দিচ্ছে, আচার্য। এখন সে শুধু নামেই মল্ল। কোনো মল্লই তাঁকে আপন বলে মনে করে না।

—কিন্তু বৎস, বন্ধুল কেন আপনার দেহ বিক্রয় করতে গেলেন, তার কোনো কারণ জানো কি ?

—লোকে বলে, একবার তক্ষশীলার বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে মল্লরা সাতটি খুঁটি পুঁতে দিয়ে সেগুলো কেটে ফেলতে বলেছিলো।

—তারপর ?

—বন্ধুল মল্ল অবশ্য কেটেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু কাটবার সময় ঝন্ ঝন্ করে আওয়াজ হতে তিনি দেখেন যে প্রত্যেক খুঁটির ভেতর লোহার গোঁজ পুরে দেওয়া হয়েছে।

—মল্লদের এ-রকম কাজ বীরের মতো —আর্যদের মতো হয়নি।

—বন্ধুল মল্ল প্রচণ্ড দুঃখ পেলেন। তিনি বললেন —কুশীনারায় আমার কেউ নেই, কুশীনারায় আমার কোনো প্রয়োজনও নেই। তখন তিনি তাঁর তক্ষশীলার সহপাঠী কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে আত্মবিক্রয় করলেন। নীচ, পামর বন্ধুল !

—ঠিক যে সময় মল্লভূমির স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশী !

—হ্যাঁ, ঠিক সেই সময়ে !

—বন্ধুলের কাছে এটা আশা করিনি বৎস ! তক্ষশীলা আমাকে অপমানিত করুক, নির্যাতন করুক —তবু তক্ষশীলার শত্রুদের সঙ্গে আমার মিলিত হওয়া কখনো আমার যোগ্য হবে না। বন্ধুল ! তুমি ভালো কাজ করোনি। তুমি আচার্য ভূরিশ্রবার নামে কলঙ্ক আরোপ করেছো। আচ্ছা বৎস, তোমার বিষয়ে আর বেশী কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। আজ থেকে তুমি আমার শিষ্যত্ব লাভ করলে।

এই কথা বলে আচার্য তাঁর কন্যাকে বললেন —রোহিণী ! সিংহকে নিয়ে যাও। ওকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। ওর থাকার আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো। আর অন্য কোনো কিছু জানবার প্রয়োজন হলে মায়ের কাছে জেনে নিও।

আমাদের আলোচনার সময় রোহিণী আচার্যের পাশে বসেছিলো। যখন আচার্য আমার বর্ণ-রূপের সঙ্গে রোহিণীর বর্ণ-রূপের তুলনা দিয়ে ভ্রাতা ভগ্নীর মতো বলেছিলেন, সেই সময়ই রোহিণীর মুখের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছিলো ; আর সেই সময়ই নিজের ভগ্নী সোমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। সোমার বয়স দশ বছর। সেও এমনি সুবর্ণকেশী। তার নাসাও এমনি উন্নত, ললাট এমনি প্রশস্ত, বর্ণ এমনি দীপ্তিমান, চক্ষু দুটি এমনি বিশাল। তবে সোমার চেয়ে রোহিণী বড়ো। সার্থের [ব্যবসায়ী সার্থদল] সঙ্গে পায়ে হেঁটে হেঁটে আট মাসে তক্ষশীলায় পেঁছেছি। এর মধ্যে সোমার

স্মৃতি কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু রোহিণীকে দেখে তা আবার সহস্রগুণে জাগরূক হয়ে উঠলো। আমার সামনে রোহিণী বসেছিলো; কিন্তু আমি যেন সোমাকেই দেখছিলাম। আচার্য এবং অন্যেরা আমার এ ভাব দেখে কি বলবেন এই কথা ভেবে আমি আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। যদি আচার্যের মনোহর অথচ শিক্ষাপ্রদ কথাবার্তা আমার সহায়তা না করতো, তাহলে হয়তো আমি অশ্রুরোধ করতে পারতাম না। কথাবার্তার মাঝে মাঝে যখনই রোহিণীর দিকে নজর পড়ছিলো, তখনই যেন বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো অনুভূতি জাগছিলো। তখন সময়টা ছিলো শীতকালের মাঝামাঝি, আর তক্ষশীলার আশপাশের পাহাড়গুলোও শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন ছিলো।

আচার্য আদেশ দেবার পর রোহিণী আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমি তার সঙ্গে নীরবে চলতে লাগলাম। আচার্য বহুলাশ্ব তক্ষশীলা গণতন্ত্রের একজন সমৃদ্ধ এবং প্রধান ব্যক্তি। তিনি গণ-এর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। গণ-সংস্থায় [প্রজাতন্ত্র সভা] তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর বাড়ীটা সাত মহলে বিভক্ত। বাইরের মহলে অশ্বশালার সার। সৈন্ধব [সিন্ধু দেশের] ঘোড়ার এতো কদর কেন, তা আমি এখানকার ঘোড়াগুলিকে দেখেই বুঝতে পারলাম। কেবল অশ্ব পালনেই নয়, তাদের সুন্দর স্বাস্থ্যবান করার দিকেও আচার্যের শখ যথেষ্ট। তক্ষশীলার অন্যান্য নাগরিকদের মতো আচার্য বহুলাশ্বেরও নগরের বাইরে বহু দূরে দূরে অনেকগুলি কর্মান্ত [ক্ষেত] ছিলো। তারই মধ্যে একটা অশ্ব পালনের জন্যে তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। অশ্বারোহণ আচার্যের খুব প্রিয় শখ ছিলো। এই ষাট বছর বয়েসেও তিনি প্রতিদিন সকালে নিয়মিত এক ঘণ্টা অশ্বারোহণ করতেন আর এইজন্যেই তাঁর আস্তাবলে সব সময় ষোলোটি করে ঘোড়া প্রস্তুত থাকে। রোহিণী আমাকে সাদা রঙের ঘোড়াটার দিকে চাইতে দেখে বললো —ভ্রাতা সিংহ! তোমারও কি অশ্বারোহণের শখ আছে?

—নিশ্চয়, রোহিণী। আমাদের দেশে সৈন্ধব অশ্ব এখান থেকেই যায়। কিন্তু এই ঘোড়াগুলো দেখে বুঝছি, সেগুলো এখানকার বাতিল জীব।

—হ্যাঁ, আমাদের কাছ থেকেও বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘোড়া ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু পিতা কখনো ভালো বাচ্চা বিক্রী করেন না।

—তা তো ঘোড়াগুলোকে দেখেই বুঝতে পারছি। আমাদের বৈশালীতে এমন ঘোড়া কারো কাছে দেখিনি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি রোহিণী! তুমি অশ্বারোহণ করতে শিখছো কি?

—শিখছি? আমি এই ষোলোটা ঘোড়ার যে-কোনোটাতে চেপে তাকে দৌড় করাতে পারি। বাবার সঙ্গে আমিও রোজ সকালে অশ্বারোহণ করে থাকি।

—আমার ছোট বোন ঘোড়ায় চড়ে না, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—ভাই সিংহ! তোমার বোনও আছে?

—হ্যাঁ, আমার মায়ের মেয়ে। তোমারই মতো। এখন তার বয়স দশ বছর। তোমার কতো?

—ওহো! কী মিল! আমারও বয়স দশ বছর।

—কিন্তু দেখতে সে তোমার চেয়ে ছোট বলেই আমার মনে হয়। হতে পারে, গত আট মাসে সে আরো কিছুটা বড়ো হয়েছে। কিন্তু সোমা খুব স্বল্পভাষিণী।

—আর আমি বুঝি বড্ড বেশী কথা বলি? —বলেই রোহিণী কিছুটা আনমনা হয়ে পড়লো। আমি তার পৃষ্ঠ-বিলম্বিত সুবর্ণতন্তুর মতো কেশ-গুচ্ছে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম —না রোহিণী! আমি তোমার সঙ্গে তুলনায় সোমাকে বোবা বলতে চাইছিলাম। কোনো মেয়ে বোবা হোক, এটা আমি পছন্দ করি না। আচ্ছা, একদিন আমিও তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বো।

—হ্যাঁ ভাই সিংহ! তুমি ঐ ঘোর লাল ঘোড়াটাতে চড়বে। ওর নাম রোহিত। ওইটাই সবচেয়ে ভালো আর বাবার অত্যন্ত প্রিয় ঘোড়া। দেখো, আমি ওর কাছে যাচ্ছি।—বলেই রোহিণী তার দিকে যেতে লাগলো। রোহিণীকে আসতে দেখে ঘোড়াটা আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো এবং সে কাছে যেতেই ঘোড়াটা তার মাথার ঘ্রাণ নিতে লাগলো। রোহিণী খুশী হয়ে বললো —রোহিত আমায় খুব ভালোবাসে। বাবা আমার ললাট চুম্বন করেন, উপাঘ্রাণ করেন। রোহিত তা জানে, তাই ও তেমনি করে আমার চুলে উপাঘ্রাণ করছে। তাই না সিংহ ভাই? তুমি কি এমন, মানুষের মতো বুদ্ধিমান ঘোড়া কোথাও দেখেছো?

আমি হেসে বললাম —না তো! মানুষের মতো এতোটা বুদ্ধিমান ঘোড়া আর দেখিনি। তুমি কখনো ওর পিঠে চেপেছো?

—চেপেছি বৈকি! কিন্তু এই দেখো, হাত উঁচু করেও আমি ওর পিঠ ছুঁতে পারি না। তাই চড়তে হলে বাবার সাহায্য নিতে হয়। —এই বলে ম্লান মুখে রোহিণী আমার কাছে সরে এলো।

আমি তার চিবুক ধরে মুখখানি তুলে বললাম —না রোহিণী! তুমি তো চিরকাল এতো ছোট থাকবে না। ঘোড়ার পিঠের চেয়েও উঁচু হয়ে যাবে। আর তোমার যখনই রোহিতের পিঠে ওঠবার ইচ্ছে হবে, আমি তোমাকে তুলে দেবার জন্যে প্রস্তুত আছি।

—কিন্তু সিংহ ভাই। তোমাকে রোহিতের কাছে যেতে দেবো না। রোহিত অচেনা লোককে নিজের কাছে যেতে দেয় না —যে ওকে বিরক্ত করে তাকেও না। হেসো না ভাই। রোহিত খুব বুদ্ধিমান কিন্তু আমি তোমাকে

এর উপায় বলে দেবো। রোহিত সবুজ গম খেতে ভালোবাসে। ওর মুখে সবুজ গম দিয়ে ওকে খাওয়াতে শুরু করো। যখন তোমাকে দেখে চিঁহি চিঁহি করবে, তখনি বুঝবে রোহিত তোমার বন্ধু হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন চলো। বোধ হয় তোমার খুব খিদে পেয়েছে। মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে আগে তোমার খিদে মেটাই।

—হ্যাঁ রোহিণী! আমার খিদে পেয়েছে। আর তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, মাকে দর্শন করতে চাই।

—আমার মা বড়ো ভালো। তিনি যখন শুনবেন যে আমার মতো তোমার একটি বোন আর আমার মায়ের মতো তোমারও মা আছে, তখন তিনি তোমায় খুব ভালোবাসবেন। চলো —চলো। —বলতে বলতে রোহিণী আমার আগে আগে চলতে লাগলো।

আমার আচার্যের বহুলাশ্ব (বহু অশ্বের মালিক) নামটি সত্যি সার্থক!

দুই

আচার্য-পত্নী

এই প্রথম আচার্য-পত্নীর কাছে যাচ্ছি ; তাই তাড়াতাড়ি করে গোশালা আর একটি ছাত্রশালা পার হয়ে সেখানে পেঁছোলাম। এখানের বাড়ীর গঠনের সঙ্গে বৈশালীর বেশ মিল আছে। তেমনি একটি আঙ্গিনার ধারে প্রশস্ত কক্ষ, দালান এবং ঘরের সারি। কোনো বাড়ী দোতলার কম নয়। আস্তাবল আর গোশালার ওপরতলায় পশুখাদ্য রাখার ঘর, দুগ্ধশালা এবং কর্মকরদের (বেতনভুক্ কর্মী) বাসগৃহ। —হ্যাঁ, এখানে বেচা-কেনার দাস-দাসী (ক্রীতদাস-দাসী) নেই। আচার্য বহুলাশ্বের আর্য-বর্ণসম্পত্তির ওপর লক্ষ্য খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে। তাঁর দাস-দাসীদের মধ্যে কোনো কৃষ্ণবর্ণ বা অর্ধকৃষ্ণবর্ণের মানুষ নেই। তারা বেশীর ভাগই গান্ধার, পখ্ত আর কম্বোজের অধিবাসী। কিছু পার্শবও [ইরাণী] আছে। বাড়ীর ছাদগুলো আমাদের বৈশালীর মতো মাটি-পোড়ানো খোলায় ছাওয়া নয়। ঠিক পশ্চিম কোশলের মতো সমতল। মাটি আর কাঁকর পাথরের সঙ্গে পিটে এই ছাদ তৈরী হয়। অসমান পাথরের টুকরো থেকে বেছে নিয়ে দেওয়াল তৈরী হয়। তার ওপর মোটা করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। আমার ধারণাই ছিলো না যে, ছোট-বড়ো অসমান পাথরের টুক্রো থেকে এমন সমান আর মজবুত দেওয়াল তৈরী হতে পারে। খিড়কী [পেছনের দ্বার], দরজা প্রভৃতিতে দেবদারু কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই কাঠে নানারকম ফুল-ফল আর মূর্তি খোদাই করা। এই খোদাই করার কাজে এখানকার তক্ষকরা [খোদাইকারী শিল্পী] বৈশালীর পেছনে পড়ে নেই। আচার্যের বাড়ীর আঙ্গিনাটি সবচেয়ে বড়ো। তাতে ফুলগাছের সারি। এখন শীতকাল বলে গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। দ্রাক্ষা [আঙুর] লতাগুলোও পত্রহীন হয়ে ঝোপের আকার ধারণ করেছে। রোহিণী বললো —এ সাধারণ দ্রাক্ষালতা নয়। 'কপিশা'র বিখ্যাত দ্রাক্ষা। বাবার একজন শিষ্য কপিশা থেকে তাঁকে এই দ্রাক্ষালতা পাঠিয়েছিলো। এর ফলের সময় তো চলে গেছে, নইলে দেখতে সবুজ পাতার মধ্যে পাণ্ডুর দ্রাক্ষাগুচ্ছগুলি কতো সুন্দর দেখতে।

—আর মিষ্টিও ?

—সে কথা বললে তো তোমার বিশ্বাস হবে না ভাই। আমি তোমাকে খাইয়েই দেখাবো।

—কিন্তু শুকনো দ্রাক্ষার স্বাদ তো আর তাজার মতো হবে না।

—শুকনো নয়, তাজাই খাওয়াবো।

— পাঁচ মাস আগে তোলা দ্রাক্ষা তাজা পাবে কেমন করে?

—দেখতেই পাবে। আর কপিশার দ্রাক্ষা থেকে তৈরী সুরা তো তুমি বোধ হয় পান করেছো?

না, কেবল উপমাই শুনেছি।

—তবে আজই মাকে বলছি। আজই তুমি কপিশার দ্রাক্ষা খাবে —তবে এই লতার। কিন্তু কাপিশায়নী সুরা তো খাস কাপিশা থেকে এসেছে। আমাদের সার্থ (বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পণ্য সহ লোকজন) এখান থেকে প্রতি বছর ব্যবসা উপলক্ষে কপিশায় যায়। আর প্রতি বছরই হাজার হাজার কুপ্পী কাপিশায়নী সুরা আমাদের ঘরে আসে।

তাহলে তো তোমাদের ঘরে কাপিশায়নী সুরা পান করা হয়, রোহিণী?

—না, ও তো ব্যবসার জিনিস। কেন, পূর্ব দেশ থেকে তো সার্থবাহরা তক্ষশীলা থেকে হাজার হাজার চামড়ার কুপ্পী ভরে কাপিশায়নী সুরা নিয়ে যায়। তুমি কি কখনো তা খাওনি?

—আমাদের ওখানে যেতে যেতে তা মহার্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা, পূর্ব দেশের গণতন্ত্রীরা খুব সাদাসিধে অশন-বসন ব্যবহার করি।

আচার্য-পত্নীর দৃষ্টি পড়েছে এবার আমার দিকে। সুতরাং পত্রহীন এই দ্রাক্ষালতার নীচে আর বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আমি আচার্য-পত্নীকে নমস্কার করলাম। রোহিণী নিজের ভাষায় আমার পরিচয় দিলে — মা! এ হলো সিংহ ভাই। বাবা সিংহকে রোহিণীর ভাই বলেছেন। আর এই সেই ভাই। এসো ভাই! আমার পাশে দাঁড়াও তো। আমি তো তোমার বুকের ছাতি পর্যন্ত লম্বা দেখছি। আচ্ছা মা· বাবা ঠিক বলেছেন না? — সিংহ আমার বড়ো ভাই।

—হ্যাঁ মা, ভাই হয় বৈকি! কিন্তু সিংহ ভাইকে খাওয়াতেও তো হবে —না শুধু 'ভাই ভাই' করেই পেট ভরিয়ে দেবে? এসো বৎস সিংহ। ওখানে বাইরে জল দিয়ে মুখ-হাত ধোও। পরে খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

—কিন্তু মা, আমি যে কাপিশেয়ী দ্রাক্ষা খাওয়াবো বলেছি।

—তবে দৌড়ে যা। দেখছিস্ কি! এক পিটারী (মাটির ভাণ্ড-জাতীয় বস্তু) দ্রাক্ষা নিয়ে আয়।

—আর মা, সন্ধ্যেবেলা কাপিশেয়ী সুরাও দিতে হবে। —ব্যস্ত হয়ে রোহিণী বললো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাপিশেয়ী সুরাও দেওয়া হবে। সবটুকু আদরযত্ন যে তুই একাই করতে চাইছিস্ রে। সিংহ কি শুধু তোর ভাই, আমার ছেলে নয়? যা, পিটারী নিয়ে আয়। সন্ধ্যেবেলা ভাইবোনের অভ্যর্থনা কাপিশেয়ী সুরা দিয়েই হবে। আর তুই রোশনার কাছে শেখা পার্শবী নাচটাও তখন দেখিয়ে দিস্।

রোহিণী খাদ্যভাণ্ডারের দিকে দৌড়ে গেলো। আমি অঙ্গনস্থিত কর-পাত্রের জলে মুখ-হাত ধুয়ে ফেললাম। তারপর আচার্য-পত্নীর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম।

এখানের জুতো অন্য রকমের। নীচের দিকটা অনেক রকম হয়—তাতে সারা পা আচ্ছাদন করার জন্যে আচ্ছাদনী লাগানো যায়। আচার্য-পত্নীর পায়েও সেই রকম জুতো ছিলো। আমিও ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পথে এইরকম একজোড়া জুতো কিনেছিলাম। আমি দরজার কাছে জুতো রেখে দালানের ভিতরে গেলাম। সেখানে মেঝের ওপর কারুকার্য করা কম্বল [কালীন] বিছানো ছিলো। দেওয়ালে দু-তিনখানি ছবি—তার মধ্যে আচার্য-পত্নীর অঙ্কিত রোহিতের মতো একটা ঘোড়ার ছবিও ছিলো। দালান আর ভোজনশালার সাজসজ্জা এমনি সাদাসিধে রকমের। দালান থেকে কিছুটা দূরে রান্নাঘর। তার ধূম্রনেত্র [চিমনী] দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—দেখে মনে হলো মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে রান্না হচ্ছে।

আমি কম্বলের ওপর বসে পড়লাম। আচার্য-পত্নী একখানা সাদা চাদর আমার সামনে পেতে দিলেন। তারপর রান্নাঘর থেকে আমার জন্যে কিছু খাবার আনতে চলে গেলেন। এমন সময় রোহিণী মাটির পিটারী নিয়ে হাজির হলো। পাঁচ মাস পরেও আঙুর টাটকা তাজা থাকে এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। পিটারী গোল চ্যাপ্টা দু'পাটে তৈরী। দু'পাটের জোড় মাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। রোহিণী বললো যে, কাপিশাতে এইভাবে তাজা আঙুরকে পিটারীর মধ্যে রক্ষা করার খুব রেওয়াজ আছে। যখন ধারের দিকে কাঁচা মাটি ভেঙে কাঁচা মাটির উপরিভাগ সরিয়ে দিলো রোহিণী, তখন দেখলাম, পিটারীর ভেতর লম্বা লম্বা আঙুরগুলো তাজাই বটে! আচার্য-পত্নী দু'টুকরো ঈষদুষ্ণ মাংস, গুঁড়ো করা সৈন্ধব লবণ, ছুরি আর কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে এলেন। রোহিণী আর আমি খেতে শুরু করলাম।

—এইবার বলো সিংহ, তোমার জন্মভূমি কোথায়—আচার্য-পত্নী মাতৃ-বৎ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি তাঁর কথার উত্তরে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় দিলাম। তখন তিনি বললেন—আমি মহালী লিচ্ছবিকে জানতাম। তখন আমি রোহিণীর চেয়েও

ছোট ছিলাম। মহালী আমার পিতা ভূরিশ্রবার শিষ্য ছিলেন। তিনি আমাকে কতো সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন।

—সিংহ ভাই! তুমিও নিশ্চয়ই অনেক গল্প জানো। তুমিও আমাকে ভালো ভালো বড়ো বড়ো গল্প শোনাবে, কেমন! —কথার মাঝখানে রোহিণী বলে উঠলো।

—হ্যাঁ রে রোহিণী, তুই কি আমাকে কথা বলতে দিবি না? হ্যাঁ সিংহ, যা বলছিলাম —সে সময় মুষ্টিকদের মধ্যে মহালী ছিলেন সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে যদি কেউ অল্প-স্বল্প যুঝতে পারতো, তো সে এক তোমার আচার্য। কিন্তু তুমি কিভাবে এতোটা পথ অতিক্রম করলে বৎস?

—রাস্তায় সার্থদের সঙ্গে এসেছি মা। বৈশালীর এক ব্যবসায়ীর সার্থ সাকেত-এ আসছিলো। তার কাছে যখন আমি সাকেত পর্যন্ত কোনো কাজ চাইলাম, তখন সে আমাকে নৌকায় মাল ওঠানো-নামানো আর রাত্রে অস্ত্র নিয়ে পাহারার কাজের বিনিময়ে বিনা খরচে সাকেত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আর ২৫ কার্ষাপণ দিতে রাজী হলো।

— তাহলে বৎস, তুমি মজুরী করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছো। খুব কষ্টই হয়েছে বলো!

—সাকেত পর্যন্ত বিশেষ কষ্ট হয়নি। কারণ সে শুধু ছিলো নৌকায় করে ভ্রমণ। মহী থেকে গঙ্গা ছেড়ে স্থলপথে সরযূতে পৌঁছেছিলাম। আমাদের সার্থবাহে পঞ্চাশখানা নৌকা আর হাজারেরও বেশী লোক ছিলো। মাত্র এক জায়গায় —সরযূ আসার মধ্যপথে ডাকাতরা আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী, তার ওপর আমাদের ধনুর্ধারীরাও সুনিপুণ। কাজেই ডাকাতরা দু-চার বার বাণ ছুঁড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আমাদের অশ্বারোহীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিলো, কিন্তু সেই গভীর জঙ্গলে তাদের খোঁজ পাওয়া সহজ কথা নয়। তবে সাকেতের পরে কষ্ট বেশী হয়েছিলো। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্তর সার্থ তক্ষশীলায় আসছিলো। এই সার্থে এক হাজার গাড়ী, আড়াই হাজার বলদ, দেড় হাজার লোক ছিলো। রাস্তায় বড়ো বড়ো জঙ্গল, বড়ো বড়ো নদী পার হতে হয়েছে। পথ তৈরী করা, এতোগুলো পশুর ঘাস-দানা, এতগুলো মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, সার্থদলের রক্ষার জন্যে সদা সশস্ত্র পাহারা দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। আমার একখানা গাড়ীতে প্রহরীর কাজ মিললো। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া ১০০ কার্ষাপণ বেতন খুব কমই বলতে হবে। কিন্তু আমি কাজ পেয়েছিলাম সবার শেষে, সুতরাং আমার অল্প বেতন স্বীকারের জন্যে অন্য কোনো কর্মকরের কিছু অসুবিধা হয়নি।

—বৈশালী থেকে এখানে আসতে কতো মাস লাগে, বৎস?

—আট মাস, মা !

—খেতে খেতেই কথা বলো বৎস ! কাঁচ মাংস গরম গরমই ভালো লাগে। ছুরিটা আমাকে দাও তো, আমি কেটে কেটে টুকরো করে দিচ্ছি। আর এই মধুগোলকও খাও। শুধু আঙুরই খাচ্ছো কেন, এ তো দুর্লভ কিছু নয়।

—কিন্তু মা, আমাদের পূর্ব দেশে মধুগোলক (লাড্ডু) খুব সাধারণ খাদ্য। ওখানে আমরা আঙুরকেই দুর্লভ মনে করি। শুকনো দ্রাক্ষা অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাজা আঙুর ওখানে স্বপ্নের মতো।

—আচ্ছা বৎস ! শকট [বলদে টানা গাড়ী]-এর সার্থর কথা কিছু বলো। এতো দেরী হয় কেন ?

—শকট তো এমনিই রোজ দু'যোজনের বেশী যেতে পারে না। কোথাও খাদ্য আর ঘাসের অভাব, সেখানে খুব দ্রুত চলতে হয়। আবার কোথাও ঘাস আর খাদ্য সুলভ— সেখানে সার্থ চার-পাঁচ দিন বিশ্রাম করে, পশুদের একটু বলবান হবার সুযোগ দেয়। তার ওপর যাত্রাপথে অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থের মতো বহু নগরী আর ব্যবসার জায়গা আছে —সেখানে কেনাবেচা করতে হয়। আমাদের শকটে কৌষেয় আর কার্পাস বস্ত্রই বেশী ছিলো। এছাড়া চন্দন, সুগন্ধী, দন্ত, স্বর্ণ, মাণিক প্রভৃতি বস্তুও ছিলো। গঙ্গা, যমুনা আর অন্যান্য নদীর ঘাটে ঘাটে শ্রেষ্ঠী সুদত্তর [অনাথপিণ্ডক] অসংখ্য পণ্যাগার রয়েছে। সেইসব পণ্যাগারে আমাদের কেনা জিনিসগুলি রেখে, প্রয়োজনীয় আর ক্রয়ের উপযোগী জিনিসগুলি সেখান থেকে নিতে হয়েছে।

—তবে তো সুদত্ত খুব বড়ো সার্থবাহ বলতে হবে !

সারা পূর্ব দেশে তো বটেই। তাঁর মতো শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ বর্তমানে সেখানে কেউ নেই। এমন কি সারা জম্বুদ্বীপে তাঁর তুলনা মিলবে কি-না সন্দেহ ! এই তক্ষশীলাতেও তাঁর পণ্যাগার আছে মা !

—এতো দূরে ! এই তক্ষশীলায়···

—এ তো কী ! পশ্চিম আর পূর্ব সমুদ্রে ভরুকচ্ছ [ভরোচ] আর তাম্রলিপ্তের মতো মহাতীর্থে তাঁর পণ্যাগার এবং বিরাট জলপোত আছে। নদী যেমন সমুদ্রে এসে পড়ে, তেমনি চার-সমুদ্রের লক্ষ্মী যেন শ্রাবস্তীর সুদত্তর ঘরে স্রোতের বেগে বয়ে আসছে।

—তাই তো দেখছি ! তারপর তোমাদের সার্থের কথা বলো পুত্র।

—শ্রেষ্ঠী সুদত্তর সার্থ এতো দৃঢ় আর সংগঠিত যে দূর থেকে তার ধ্বজা দেখেই দস্যুরা পথ ছেড়ে পালায়। কেবল পঞ্চালের জঙ্গলে বিরাট একটা চোরের দল আমাদের কিছুটা অসুবিধা করেছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো পাঁচশো যোদ্ধা এবং তারা অনেকেই অশ্বারোহী। তারা ঘণ্টাখানেক যুঝতে পেরেছিলো। ওইখানেই যা আচার্য মহালীর কাছে শেখা খড়্গ-যুক্তি

দেখাবার খানিকটা সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি একাই আট জন ডাকাতের রক্তে আমার খড়্গকে স্নান করিয়েছিলাম !

--কিন্তু তোমার কোনো আঘাত লাগেনি তো পুত্র ?

--সামান্য আঘাত মা। বাহুতে --কনুইয়ের ওপর। --বলে আমি কম্বল-কঞ্চুক সরিয়ে লম্বা দাগটা দেখালাম।

রোহিণী আমাকে আঙুর সাফ করে দিচ্ছিলো। সে ত্রস্তব্যস্তে সেইখানে আঙুল দিয়ে বললো --সিংহ ভাই, তাহলে তো অনেক রক্ত পড়েছে !

না রোহিণী। তরবারির আঘাতে ততোটা রক্তপাত হয় না। কেন-না, শিরা কেটে গেলেও দু'দিক চেপে বেঁধে দিলে খুব তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। বরং শল্য বা তীরের আঘাত বেশী মারাত্মক হয়। কারণ তার ক্ষতটা এমন হয় যে রক্তপাত বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

--কিন্তু ভাই, সেই জঙ্গলে তো তোমাকে ওষুধপত্র দেবার লোক ছিলো না ?

-এইটুকু ক্ষতের জন্যে আবার ওষুধপত্র। তবুও সুদত্তর সার্থে শল্য চিকিৎসক, বিষ-চিকিৎসক প্রভৃতি সব সময়ই থাকে। কেবল ঐ এক জায়-গায়ই মা, যা কিছু সংঘর্ষ হয়েছিলো। নইলে এখান পর্যন্ত সারা যাত্রাপথই কুশলে কেটেছে। আমাদের সার্থ কাল তক্ষশীলায় পৌঁছেছে। আচার্য মহালী আমাকে বলে দিয়েছিলেন -তাই আমি সোজা আচার্যের কুলে এসে পৌঁছেছি।

-- এ তোমারই ঘর বলে মনে করো পুত্র।

তিন

তক্ষশীলা

তক্ষশীলাও আমাদের বৈশালীর মতো বিশাল এক নগরী। তবে আমাদের বৈশালীর কাছে কোথাও পাহাড়-পর্বত নেই ; আর তক্ষশীলার কাছাকাছি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পাহাড় আছে। তক্ষশীলার কাছে একটি নদীও আছে। নদীটা ছোট, কিন্তু তাতে বারো মাসই জল থাকে। মগধের সুমাগধার মতো এখানেও উত্তরের পাহাড়ী জলস্রোতকে বেঁধে এক বিরাট জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই জলাশয়ের অনেকগুলি শাখা নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর সেই শাখাগুলির তীরে সরল বৃক্ষশ্রেণীর শোভা কী অপূর্ব! যখন হেমন্তের পাতা-ঝরা দিনে একটুখানি সবুজ শ্যামলিমার জন্যে দৃষ্টি আকুল হয়ে ওঠে, সেই সময় এই চিরহরিৎ বৃক্ষ-গুলির সৌন্দর্য পুরবাসীদের নয়ন-মন তৃপ্ত করে। তক্ষশীলার মধ্যেকার এই সরল-বৃক্ষশ্রেণীশোভিত খালগুলি সত্যিই বড়ো বিচিত্র। এই খালগুলি থেকে আবার বাগান আর ক্ষেতে সেচের কাজও চলে। তাছাড়া নগরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ফলের বাগিচাগুলি তক্ষশীলার এক মনোরম সম্পদ। এই বাগিচাগুলিতে দ্রাক্ষা, আখরোট, আপেল, রাঙা আলু, উদুম্বর প্রভৃতি নানারকম ফলের গাছ আছে। গ্রীষ্মকালে এইসব শীতল ছায়াসমন্বিত গাছের নীচে বসে পাশেই প্রবাহিত খালের নীল জলরাশি দেখে দেখে আশা যেন মেটে না। আমার আচার্যেরও অনেক ফলোদ্যান আছে—সেখানে ফল শুকনো করা আর রাখার ঘরও তৈরী করা হয়েছে। বর্ষার আরম্ভ থেকে শরৎকালের শেষ অবধি বাগিচার সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়। কোথাও দ্রাক্ষা-কুঞ্জ—লতার স্থানে এখানে কেটে-ছেঁটে ছোট বৃক্ষের মতো দ্রাক্ষা রাখার রেওয়াজ আছে। প্রথমে ফিকে সবুজ মরকতের মতো, তারপর পুষ্পরাগের গুচ্ছের মতো এর ফলগুচ্ছ বড়োই মনোহর দেখায়। পদ্মরাগের মতো লাল উদুম্বর ফলের শোভাও অতুলনীয়। আর পত্রবহুল শীতল ছায়াসমন্বিত বিশাল আখরোটের গাছগুলি আমাদের রিঠা গাছেরই মতো। কারুকার্যের জন্যে আখরোটের কাঠের বিশেষ চাহিদা আছে। ফলের মরশুমে প্রতিটি বাগিচার দ্বার প্রত্যেক পান্থের জন্যেই খোলা। যত পারো ফল তোলো আর খাও—তবে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াটা কেউ পছন্দ করে না।

উদ্যান ছাড়াও বহুদূর পর্যন্ত তক্ষশীলার নাগরিকদের কর্মান্ত [ক্ষেত] রয়েছে। শীতকালে এখানে শ্মশানের শূন্যতা বিরাজ করে। ক্ষেত তখন খালি পড়ে থাকে —কেবল কর্মান্ত-ঘরে কিছু গরু-ষাঁড় আর কর্মকরকে দেখা যায়। কিন্তু বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে জীবনের সাড়া পড়ে যায়। সদ্যগলিত শিশিরভেজা মাটিতে শত শত হল [লাঙ্গল] চালনা শুরু হয়। হলবাহী [লাঙ্গল চালনাকারী]-দের মধুর সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে 'ট্র-ট্র' শব্দে সারা প্রান্তর মুখরিত হয়ে ওঠে। আমরা যতো বিদ্যার্থী ছিলাম, সকলেই আচার্যের সঙ্গে এই চাষ-বাসের সময় কর্মান্তে চলে যেতাম। লাঙ্গল জুড়তে, ঘাস আলাদা করতে, বীজ বপনের কাজে আমরা সাহায্য করতাম। বৈশালীতে ক্ষেতের কাজে আমার যথেষ্ট সুনাম হয়েছিলো। সেই সুনাম আমি এখানেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম। আমাদের বৈশালীর হলচালনার সময়কার গানগুলি আমার ভালোই জানা ছিলো। কিন্তু তক্ষশীলার গানের ভাষা ও সুর সে গান থেকে কতো পৃথক! তাই অপর সকলের বিদ্রুপের ভয়ে সেই গান আমি গাইতে পারতাম না। তবে আমার সঙ্গী অপর হলবাহীদের সঙ্গীতের সুর অনুকরণ করে আমিও গুনগুন করতাম বৈকি। পরের বছরই অবশ্য তক্ষশীলার বহু সঙ্গীত আমি আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম।

দুপুরে লাঙ্গল রেখে নব-কিশলয়ে ভরা গাছগুলির ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতাম। তারপর স্থানে স্থানে পুষ্করিণীর আকারপ্রাপ্ত খালগুলিতে স্নান করতে যেতাম। এটা স্নানের সময় নয় —কিন্তু এই সময়ই আচার্যদেব আমাদের শরীরের দোষ-গুণ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করতেন। যখন সকল নর-নারী নিজের নিজের পরিধেয় সমস্ত কাপড়-চোপড় ছেড়ে উচ্চ তটভূমি থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলক্রীড়া করতো, সেই সময় আচার্য বলতেন –'রোহিণী, তোমার পার্শ্বদেশে মেদ জমছে।' —'সুমেধ! তোমার জঙ্ঘা পেশীশূন্য মনে হচ্ছে।' —'অনুরুদ্ধ! নিতম্ব এতো মাংসল হচ্ছে কেন?' —'সিংহ, সবচেয়ে সুডোল শরীর তোমার। কোথাও মেদের নাম গন্ধ নেই। কামচোরের [অলস ব্যক্তির] শাস্তিই হলো মেদবৃদ্ধি।' —'সরস্বতী তো মহিষের মতো হয়ে উঠলো দেখছি! ওর পেটটা দেখো। —ঠিক গর্ভবতীর মতোই মনে হয়। —'সরস্বতী, তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়ে, খানিকটা বেড়াবে। এখানে কর্মান্তে তো ঘোড়ার অভাব নেই।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা জলে সাঁতার দিতাম, লাফঝাঁপ করতাম আর একে অপরের গায়ে জল দিয়ে সেই গ্রীষ্মের দুপুর অতিবাহিত করতাম। তারপর দধি, মধু আর ছাতু দিয়ে তৈরী ঘোল পান করতাম। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে আহারের পরিমাণটা কমই হতো; কিন্তু সন্ধ্যায় হতো ভোজের বিপুল আয়োজন। সে সময় কাজকর্মও বিশেষ থাকতো না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে

কর্মান্ত-ঘরের বাইরে,লেপা-মোছা ভূমিতে আমরা বসে যেতাম। প্রথমে নির্ধূম অগ্নিতে ঝলসানো সুস্বাদু গো-মাংসের টুকরো আর সুরা আসতো। আমরা পাশাপাশি বসে মাংসের টুকরাগুলি একে একে মুখে পুরতাম আর কাষ্ঠের চষকে সুরা পান করতাম—সঙ্গীকেও পান করাতাম। তারপর যখন চক্ষু ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠতো, তখন শুরু হতো গান আর শেষ পর্যন্ত লাস্য। আচার্য-পত্নীর বয়স এখন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু তাঁর নৃত্য-কৌশল দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমার মতো দু-দু'জন সবল তরুণ যখন ঘেমে হাঁপিয়ে উঠি, তখনো তাঁর হস্ত-পদ-গাত্র বিক্ষেপে এতোটুকু তালভঙ্গ হয় না কিংবা সামান্য ক্লান্তির লক্ষণও দেখা যায় না।

ফসল বোনা সমাপ্তির দিনে স্বয়ং আচার্য বহুলাশ্ব নিজের নৃত্যনিপুণতা প্রদর্শন করলেন। শরীরের প্রত্যেকটি পেশীর ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কতোখানি, সেইদিনই তা দেখলাম। আচার্য নাচকে ব্যায়ামের রাজা বলতেন। তিনি বলতেন—'এটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনের ব্যায়াম। অবোধ শিশু তার শিশুশয্যায় শুয়ে শুয়েই হস্ত-পদ চালনা করতে থাকে। আর এইভাবেই তার মেদ গলে পেশীতে রূপান্তরিত হয়। স্তান হবার পর শুধু নাচই সারা জীবন দেহকে সুস্থ-সবল রাখতে পারে। কোদাল-কুড়ুল চালালে কতকগুলো পেশী পুষ্ট হয়। ভ্রমণ, দৌড়ানো ইত্যাদিতে পদদ্বয় দৃঢ় আর সুডৌল হয়। মল্লযুদ্ধ এবং মুষ্টিযুদ্ধেও শরীরের অনেকগুলি অবয়বের দৃঢ়তা দেখা যায়। কিন্তু কেউ যদি রীতি-নীতি অনুযায়ী নিয়মিত নৃত্য করে, তাহলে শরীরের প্রতিটি পেশী পুষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো শ্রম-সাধ্য কাজ করলে সারা দেহ ঘর্মাক্ত হয়, আর যে অঙ্গের চালনা বেশী হয় তার মেদ হ্রাস পায় বটে - কিন্তু এইরকম শ্রম করতে মনে উৎসাহ জাগে না। তাই মনের ওপরও বেশ খানিকটা জোর-জবরদস্তি করতে হয়। নাচ কিন্তু এমন একটা ব্যায়াম, যাতে মন কখনও বিরূপ হয় না। এতে যেমন সারা শরীর পুষ্ট হয়, তেমনি মনের জড়তাও দূর হয়ে যায়। সারা দিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যায় কয়েক পাত্র সুরার সঙ্গে নৃত্য পরের দিনের নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। নাচ মানুষের পক্ষে পরম উপকারী। সরস্বতী যে মহিষের মতো হচ্ছে, তার একটা কারণ হলো নাচে ওর অনাসক্তি।

ফসল বোনা সমাপ্তির উৎসব আমাদের বৈশালীতেও হয়; কিন্তু এই উপলক্ষে এখানে অনেক বেশী উৎসাহ দেখা যায়। সেদিন বৎসতর [বাছুর] গাভী, মেষ এবং শূকর-মাংসকে নানাপ্রকারে রন্ধন করা হয়। ঘিয়ে-ভাজা মধু-মিষ্ট অপূপ [পুরী], সুগন্ধী চাউলে তৈরী নির্জল ক্ষীর [পায়েস], আট ঘণ্টা অগ্নিপক্ক হাড়গোড় [গোড়ী], মাংসের সুস্বাদু ঝোল এবং অনেক রকমের তরকারী তৈরী করা হয়। সেদিন গ্রামপ্রান্তের বড়ো কর্মান্ত

ঘরে আচার্যের সমস্ত কর্মান্তের সব কর্মকর আর সহায়করা আসে। সকলেই সেদিন নববস্ত্র পরিধান করে। সূর্যাস্তের আগে থেকেই শুরু হয় পান আর গান। আচার্যের মদ্যকোষ [ভাণ্ডার] থেকে খুব পুরোনো সুরার ভাণ্ড আর প্রচুর কাপিশেয়ী সুরার কুতুপ আনা হয়। সে সময় আচার্য আর সমস্ত কর্মকর পরিবারগুলির একত্র ভোজ হয়ে থাকে। সারা রাত নাচ-গানে কেটে যায়।

কর্মান্ত [ক্ষেত-খামার] এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া তক্ষশীলার নাগরিকদের জীবিকার একটা প্রধান উপায় —বাণিজ্য। স্থলপথে প্রাচীর [পূর্ব ভারত] জিনিসপত্র পার্শব [পারস্য], ব্যাবিলন আর যবন দেশে নিয়ে যাওয়া তক্ষশীলার স্থল-সার্থের প্রধান কাজ। তক্ষশীলা যে শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, কৌশাম্বী আর উজ্জয়িনীর চেয়েও সমৃদ্ধিশালী, তার এই বাণিজ্যই হলো প্রধান কারণ। শ্রাবস্তী আর কৌশাম্বীতেও তো রাজা, রাজকুমার, অমাত্য, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ আছে, কিন্তু তক্ষশীলায় এমন একটা জিনিস পাওয়া যায় যা সেইসব রাজধানীতে নেই। এখানে ক্ষুধিত নগ্ন ভিখারী দেখা যাবে না। তক্ষশীলার নাগরিকরা একে মস্ত বড়ো কলঙ্ক বলে মনে করে। প্রত্যেকটি সমর্থ মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেওয়া এখানে সবাই কর্তব্য বলে মনে করে। ক্রীতদাস তক্ষশীলায় নেই—অবশ্য কর্মকর [ভৃত্য] নর-নারী আছে ; কিন্তু প্রভুরা তাদের নিজের মতোই মানুষ বলে মনে করেন এবং সম-ব্যবহার করেন। কর্মকরদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয়, তাদের ভোজনের ব্যবস্থাও ভালো - - আমোদ-প্রমোদে তারা প্রভুদের সহভাগী। এইসব কর্মকরদের মধ্যে আবার যারা তক্ষশীলার নাগরিক —হয়তো কোনো বিপদে পড়ে ভৃত্যের কাজ করছে, তাদের কর্মকর বলা চলে না। সে পরিবারেরই একজন হয়ে খাওয়া-পরা-থাকার ব্যাপারে সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। তক্ষশীলা প্রজাতন্ত্রে বহিরাগত কর্মকর সম্বন্ধে আচার্য বলতেন —রুধির-সম্বন্ধের ওপর আমাদের 'গণ' স্থাপিত। সেইজন্যেই বহিরাগতদের নাগরিকত্ব প্রদান করা আমাদের সাধ্যের অতীত। কিন্তু মানুষ আর আর্য হলে যাতে তারা নিজেদের প্রবাসী বলে মনে না করে, সেইরকম ব্যবহারই আমরা করে থাকি।

চার

উপ-অধ্যাপক

তক্ষশীলায় চার বছর কাটলো। এ-পর্যন্ত কি কি শিক্ষালাভ করেছি, তা আগেই বলেছি। এখন আর প্রথম দিনগুলোর মতো তক্ষশীলা আমার কাছে অপরিচিত, বিচিত্র আর অজানা এক নগরী নয়। বরং আমার মাতৃভূমি বৈশালীর পরই তক্ষশীলার ওপর যে অনুরাগ গোড়ার দিকেই জন্মেছিলো, এখন তা দৃঢ় হতে হতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আমি এখন বেশ-ভূষাতেও তক্ষশীলাবাসী বনে গেছি। শীতকালে তেমনি সুত্থন [পায়জামা], চর্ম-কঞ্চুক পরিধান করি —তাদেরই মতো আপনার লম্বা কেশরাশি জড়িয়ে বেঁধে নরম চামড়ায় তৈরী কানটুপি [আজকালকার মাংকি ক্যাপ-এর মতো] দিয়ে ঢেকে রাখি। সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আচার্যের ছাত্রদের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে মেধাবী এবং তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমি এখন আচার্যের নিম্নবর্গের শিক্ষার্থীদের অধ্যাপক। মাঝে মাঝে বৈশালীতে মায়ের আর সোমার কথা অবশ্যই মনে পড়ে। কিন্তু তক্ষশীলাতেও আচার্য, মা [আচার্য-পত্নী] আর রোহিণীর স্নেহ-প্রীতিতে এমন বাঁধা পড়ে গেছি যে, তাঁদের ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবলেও মনে কেমন একটা বিষাদের সৃষ্টি হয়। বৈশালীর খবর এতোদিনে মাত্র একবার পেয়েছি। মা একজন সার্থকে অনুনয়-বিনয় করে সুদত্তর লোকের সঙ্গে একখানি তালপত্রের লিপি পাঠিয়েছিলেন। সুদত্তর সার্থের সঙ্গে তা এখানে পৌঁছেছিলো। আমিও প্রতি বছরই এখান থেকে যে সার্থ ফিরেছে, তাদের হাতে মাকে পত্র দিই। কিন্তু তার খুব কমই মা পেয়ে থাকেন। যদি সাকেত বা শ্রাবস্তীতে হতো, তা হলেও হয়তো বা এর থেকে অল্প আয়াসে চিঠি পাঠানো যেতো। তবে প্রাচীর [পূর্ব ভারতের] খবর সুদত্তর সার্থের কাছে প্রতি বছরই পেয়ে থাকি।

ক্ষেতের সোনালী কনক [গম] কাটবার সময় হলে আচার্য আমাকে একটি কর্মান্তের কাটা-ঝাড়ার ভার অর্পণ করলেন। সেটি আচার্যের সবচেয়ে বড়ো কর্মান্ত এবং তার ক্ষেতগুলো কর্মান্ত-ঘর থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্মকর ছাড়া বহু বিদ্যার্থী এবং রোহিণীও সেখানে উপস্থিত হলো। সন্ধ্যার সময় আমরা কর্মান্ত-ঘরে চলে আসতাম। ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই

হালকা প্রাতরাশ করে চর্মের আধারে খাবার নিয়ে পিঠের ওপর ফেলতাম, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতে চলে যেতাম। যে ক্ষেতের ফসল কাটা হয়ে গেছে, সেখানে হরিৎবর্ণ তৃণ খাবার জন্যে ঘোড়াকে চরতে ছেড়ে দিতাম। এবার কাস্তে নিয়ে ফসল কাটতে লেগে যেতাম। ফসল কাটার সময় স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা বিভক্ত হয়ে গান গাইতো এবং দোহারকী করতো। আমরা পুরুষরা স্ত্রীকণ্ঠের অনুকরণ করতাম; কিন্তু সে স্বাভাবিক মধুরতা পাবো কোথায়? তবে এতে কাজ করতে গিয়ে শ্রম করছি মনে হতো না।

খাওয়ার ভার রোহিণীর ওপর। সে দুপুরে ঘোড়ার দুধের মেরয় [কাঁচা সুরা]-ভরা একটা কুপ্পী পিঠে নিয়ে, একটা শকটিকা [ছোট গাড়ী] ভরে খাদ্য আর জল নিয়ে আমাদের কাছে আসতো। একটা গাছ-তলায় আমরা এসে বসতাম এবং সেখানেই হাসি-তামাসা করতে করতে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করতাম। রোহিণী সূপকারকে [রন্ধনকারী] ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের কাজে সাহায্য করবার জন্যে সেখানেই থেকে যেতো। দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্র। তাই আমরা বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতাম। কখনো সবুজ কাঁচা গম পুড়িয়ে খেতাম, কখনো পত্রবহুল সবুজ কলাই বা গমের গুচ্ছ সমেত ডাঁটা নিয়ে তরুণী সখীর সুন্দর কেশগুচ্ছ সাজাতাম। কখনো কেউ বা চমৎকার গল্প বলতো, আবার কেউ শুয়ে পড়তো।

সূর্য যখন পশ্চিম দিকে একটু ঢলে পড়তো, আমরা আবার সকলে কাস্তে নিয়ে ফসল কাটতে শুরু করতাম। রোহিণী কাস্তে-চালনাতেও খুব দক্ষ ছিলো, তার ওপর তার গলার স্বর ছিলো হিমাচলের কোকিলের চেয়েও মধুর। তার সেই মধুক্ষরা সঙ্গীতের সুরে প্রচণ্ড রৌদ্রকেও মনে হতো শীতল ছায়ার মতো। সূর্যাস্তের পর আমরা কখনো কখনো ক্ষেত্র-নৃত্য করতাম। ফলবান সবুজ লতার ভূষণ পরতো তরুণ-তরুণীরা। মাঝখানে কিছু না-কাটা কনক (গম) রেখে, বাঁ হাতে গমের গুচ্ছ আর ডান হাতে কাস্তে নিয়ে আমরা প্রথমে একটা গান গাইতাম। তারপর তরুণ-তরুণী দু'দলে ভাগ হয়ে সেই সামনে রাখা গমের চারপাশে নাচতে শুরু করতো। গলা শুকিয়ে গেলে রোহিণীর আনা মেরয় [কাঁচা সুরা] দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিতাম। তাতে চোখও ঈষৎ লাল হয়ে উঠতো।

এদিকে সূর্য অস্তাচলে যেতো, ওদিকে আমরা কর্মান্ত-ঘরে পৌঁছে যেতাম। শীতের শেষ নয়, এখন গ্রীষ্মের সমাপ্তিকাল। তাই ঘাস-পাতার প্রাচুর্য হেতু পশুগুলোও হৃষ্টপুষ্ট আর পীবর। আমাদের সান্ধ্যভোজনের প্রধান অঙ্গই হলো মাংস—তাই কখনো ছোট বাছুর, কখনো পাঁঠা, কখনো শূকর, আবার কখনো বা ভেড়া মারা হতো।

কর্মান্ত-ঘরে ফিরেই আমরা প্রথমে খালে স্নান করে দেহের ধুলো-বালি সাফ করে ফেলতাম। তারপর ধৌত অন্তর্বাসক [ধুতি] আর উত্তরীয় [চাদর] পরতাম। গ্রীষ্মকালে তক্ষশীলাবাসীরাও বৈশালীবাসীদের মতোই বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা উত্তরীয় আর অন্তর্বাসক ছাড়াও ছোট কঞ্চুক [বক্ষাবরণ] ব্যবহার করে। আমাদের এখানকার চেয়ে ওখানকার মেয়েরা কম অলঙ্কার ব্যবহার করে। এক, দুই বা তিন-নরী মালা, আর কর্ণ-ভূষণ হলো ওদের অলঙ্কার। ওরা ধাতুর অলঙ্কারের চেয়ে লতা-পত্র-পুষ্পের—এই অলঙ্কারই পছন্দ করে বেশী। আসলে গান্ধার [তক্ষশীলা] আর মদ্র [শিয়ালকোট] দেশের মেয়েরা স্বভাবতই এতো সুন্দরী যে, তারা ভূষণের শোভা বৃদ্ধি করে। ভূষণ তাদের শোভা বাড়ায় না। গ্রীষ্মকালে চামড়ার মোজা ওরা আর পরে না বটে, কিন্তু জুতার প্রচলন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এখানে প্রাচীর চেয়ে বেশী।

প্রথমে আমরা ক্ষেতে ডাঁটা সমেত শস্যগুচ্ছ কেটে ক্ষেতের মধ্যে একদিন ফেলে রাখতাম। তারপর সেগুলিকে আঁটি বেঁধে কর্মান্ত-ঘরের কাছে খলিহানে [নিড়ানোর স্থান] নিয়ে যেতাম। সারা ক্ষেতের ফসল কাটা শেষ হলে খলিহানই হতো কর্মক্ষেত্র আর ক্রীড়াক্ষেত্র। সেখানে আমরা বলদের সাহায্যে শস্য মাড়াই করতাম, আবার সন্ধ্যায় কনকরাশি [গমের স্তূপ] উঠে গেলে সেখানেই আমরা পান আর নৃত্য করতাম। নিজের শ্রমে মাটির এই অপূর্ব রূপান্তর দেখে মানুষের কতোই না আনন্দ হয়! ফসল বোনার সময় থেকে কাটার সময়ই আমাদের বেশী আনন্দ হতো! তাই সামান্য গুন্‌গুন্‌ সুরে সকলের কণ্ঠেই মৃদু সুর যখন সহজেই নৃত্যের ছন্দে পরিণত হতো, তখন আশ্চর্য হবার বোধ হয় কিছুই ছিলো না।

ক্ষেতে ফসল কাটার সময় বর্ষণের ভয় কম নয়। যদিও বর্ষণ এখানে খুব কমই হয়, তবু তা ক্ষেত-খলিহানে পড়ে থাকা ধান্যের তো প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। এইজন্যেই ফসল কাটার সময় যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে হয়। তারপর খলিহান্‌ থেকেও যখন শস্য আর তুষ তুলে নেওয়া হয়, তখন আবার একবার সহভোজ হয়। সেই সহভোজে কর্মান্তের সমস্ত নর নারীই যোগ দেয়। এ বছর আমার কর্মান্তেই সবার আগে নিড়ানোর কাজ শেষ হয়েছে, তাই আচার্য আমাকে আর আমার সহকর্মীদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

এ কথা আগেই বলেছি যে, চতুর্থ বর্ষে পেঁছাতে না পেঁছাতেই আমি আধা-বিদ্যার্থী আর আধা-অধ্যাপক হয়েছি। আচার্যের শিষ্যের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। কিন্তু সেই পাঁচশো বিদ্যার্থী সকলেই উচ্চশিক্ষালাভের জন্যে এসেছে এবং তাদের মধ্যে বহু-সংখ্যকই হলো তক্ষশীলার বাইরে দূর

দূরান্ত থেকে আগত। আজকাল প্রাচীর শিক্ষার্থী খুব কম। যা আছে, তাদের মধ্যে মগধের শুল্ক-অন্তেবাসী [অর্থের বিনিময়ে বিদ্যার্থী] বেশী। আচার্য এটাকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করতেন না। তিনি বলতেন — বৎস সিংহ! এতে মনে হয়, প্রাচীতে একমাত্র মগধই যুদ্ধবিদ্যার গুরুত্ব বোঝে। বৈশালী, কুশীনারা, কপিলবস্তু, পাবা, অনুপিয়া, দেবদহ — কোনো গণতন্ত্রেরই একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোনো বিদ্যার্থী না থাকায় এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তারা যুদ্ধবিদ্যাকে সিন্ধু [নদ]-র মতো মনে করে না। মনে করে স্রোতহীন বদ্ধ পুষ্করিণীর মতো। আমি তক্ষশীলার মিথ্যা প্রশংসা করবার জন্যে বলছি না — এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এখন যারা তক্ষশীলার জ্ঞানস্রোত থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখবে, তারা পিছিয়ে পড়বে। মহালী যুদ্ধবিদ্যায় একজন পণ্ডিত। নীচ বন্ধুল মল্লের রণবিদ্যায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারের পুঁজি পঁচিশ বছর আগের। বৈশালী আর শ্রাবস্তীতে বসে তাঁরা কেমন করে জানবেন যে, পার্শবরা বল-সঞ্চালনের [সৈন্য-চালনার] কি নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে কিংবা ব্যূহ-ভেদের নতুন কি কায়দা বার করেছে? তীর ক্ষেপণের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তারা নতুন করে কি করলো? ইট-পাথরের দুর্গ ভাঙার জন্যেই বা তারা কি যন্ত্র তৈরী করেছে? এ কথা শুধু তক্ষশীলাতেই জানা যাবে। আমরা শুধু যবন আর পার্শবদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধই রাখি না, তাদের আভ্যন্তরীণ রহস্যভেদেও আমরা সিদ্ধহস্ত। আমাদের যুদ্ধবিদ্যা সিন্ধুর স্রোতের মতো — এ স্রোত কখনো রুদ্ধ হয় না, নিত্য নব জ্ঞানবারিতে পরিপূর্ণ হয়। দুঃখের কথা, প্রাচীতে একমাত্র মগধেরই এ কথা স্মরণে আছে। আর মগধ সে জ্ঞান খুব তৎপরতার সঙ্গে অর্জনও করছে। আমার তো মনে হয় না যে মগধের যেসব শিক্ষার্থী এখানে এসে বেতন দিয়ে শিক্ষালাভ করছে, তারা সে অর্থ নিজেদের ঘর থেকে দিচ্ছে।

— না আচার্য, তাদের সব খরচই রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়। মগধরাজ বিম্বিসার উপযুক্ত তরুণদের বেছে বেছে তক্ষশীলায় পাঠাচ্ছেন।

— আমারও সেই সন্দেহই হয় বৎস। আমার বয়েস চৌষট্টি পার হয়ে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মগধ প্রাচীর স্বাতন্ত্র্যের [স্বাধীনতা] শত্রু হয়ে উঠছে। সে একদিন ওখানকার গণগুলিকে গ্রাস করবে, ছোট-বড়ো রাজ্যগুলিও উদরসাৎ করবে। মগধের রাজা প্রাচীতে পার্শবের মতো রাজাধিরাজ হবে। আজ না হয় দশ বছর পরে, কি পঞ্চাশ বছর পরেও এটা হবেই হবে — অবশ্য ওদের জ্ঞানলাভের ইচ্ছাটা যদি আজকের মতোই থাকে।

— তাহলে এ তো আমাদের পক্ষে খুবই বিপদেরই কথা।

— তাতে কোনো সন্দেহ নেই বৎস।

—কিন্তু আচার্য আমরা লিচ্ছবিরা একলাই মগধের পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচ জন লিচ্ছবি-কুমার এ বছর এখানে আসছে। আমরা লিচ্ছবিদের জ্ঞানপিপাসা ক্ষান্ত হতে দেবো না। বৈশালী থেকে তক্ষশীলায় আগমন-নির্গমন কখনো বন্ধ হবে না।

—বেশ, বৎস বেশ! আমিও তাই চাই। মগধকে মাথা নত করাতে লিচ্ছবিরাই যথেষ্ট, এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমিই তো বলেছো যে মগধ অঙ্গকে হজম করেছে। এর অর্থ হলো —অঙ্গের ধন-জন-শক্তি সব মগধের অধীনে চলে গেছে। কোশলেরও বার্ধক্য এসে গেছে বলে মনে হচ্ছে। নইলে কাশী আর কোশলের মতো অসীম ধন-জন-সমৃদ্ধিভরা রাজ্য পেয়ে, শাক্য প্রভৃতি গণগুলির পরবশ্যতার সুযোগ নিয়ে সে বৈশালীর স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারতো। কিন্তু মগধের বার্ধক্যের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিম্বিসার চতুর শাসক বলেই মনে হয়। যদি তার পুত্রও পিতারই মতো হয়, তবে বৈশালীর সর্বদা সজাগ থাকারই প্রয়োজন হবে।

—বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে আমি জানি আচার্য। সে খুব চতুর যুবক। তার মা আমাদের বিদেহ দেশেরই মেয়ে। তাকে আমি দেখেছি। সে আচার্য মহালীর বিদ্যালয়ে এসেছিলো। অজাতশত্রুর তক্ষশীলায় আসার ইচ্ছা খুব প্রবল। কিন্তু পিতামাতার মত হয়নি। তক্ষশীলার প্রাক্তন ছাত্র জীবকের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

—জীবক? এখানের প্রাক্তন ছাত্র?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো বৈদ্য আচার্য। আজকাল প্রাচীতে তার খুব খ্যাতি। শুধু মগধ বা কোশলে নয়, উজ্জয়িনীতেও তার ডাক পড়ে। হ্যাঁ, সে শুধু বৈদ্য, যোদ্ধা নয়।

—কিন্তু বৈদ্য আর যোদ্ধা উভয়ে মিলেই যুদ্ধ জয় করে। বিজ্ঞ চিকিৎসক শুধু হাজার হাজার আহতের প্রাণরক্ষাই করে না, কূট যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করে। একটা গোটা সেনাবাহিনীর প্রাণনাশ করাও তার পক্ষে সম্ভব।

—জীবক এ বিষয়ে খুব নিপুণ আচার্য! অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্যে সে কিছুকাল আগে সেখানে গিয়েছিলো। কোনো কারণে রাজা জীবকের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই জীবককে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হলো। পথে কিন্তু রাজার একজন দূত তাকে ধরে ফেললো। সে সময় জীবক জল পানের জন্যে আমলকি খাচ্ছিলো। রাজার দূতকে সে গোটা দুই আমলকি খেতে দিলো। দূত মনে করলো, নিজের খাবার আমলকি থেকে যখন দিচ্ছে, তখন খেতে আর দোষ কি! কিন্তু সেই আমলকি খেয়ে সে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো।

—তবে তো পুত্র তুমি বুঝতেই পারছো, জীবক যুদ্ধে কতোটা সাহায্য করতে পারে। আমার বিশ্বাস, মগধের শক্তি আজ প্রবল হলেও সে লিচ্ছবিদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যখন সে অন্যান্য রাজ্যগুলিকে অধীন করতে সমর্থ হবে, আর তার জন্যে পাশেই তো অথর্ব কোশল রয়েছে, তখন বিপদ বাড়বে। আর তার সঙ্গে রয়েছে তক্ষশীলায় শিক্ষিত ওদের ভাবী সেনাপতি।

—কিন্তু আচার্য, আপনি তো তাদের সব কৌশল শেখান না।

—সে কথা ঠিক। তবুও তো ওরা অনেক কিছু শিখতে পারে। আর কৌশল? তা তো একটু চতুর হলে অনেকেই তক্ষশীলার হাওয়া থেকেই পেতে পারে। মগধ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে হলো প্রাচীর পার্শব। পশ্চিম গান্ধারের পুরুষদের তুমি হয়তো দেখেছো। আমাদের পূর্ব গান্ধার [তক্ষশীলা] আর পশ্চিম গান্ধারের ব্যবধান শুধু মহাসিন্ধুর। পূর্ব গান্ধারবাসীরা আমাদের চেয়ে কম বীর কিংবা অল্প বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু কুরু, দরায়ুর অসংখ্য সৈন্যদলের সামনে তাদের হার মানতেই হলো। আজ যদি তক্ষশীলা একা হতো, তাহলে এখানেও দরায়ুর ক্ষত্রপের [প্রতিনিধি শাসনকর্তা] শাসন কায়েম হতো। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এইটুকু যে, উত্তরাপথের [পঞ্জাব] সমস্ত গণ দরায়ুর বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। তবুও এই একতা আমি যথেষ্ট বলে মনে করি না। আমাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থেকে এই একতা সৃষ্টি হয়েছে। মদ্র, মদ্রের নিজের জন্যে যেমন করে যুঝবে, তক্ষশীলার জন্যে সেটা সম্ভব নয়। আবার মদ্রের শাকল [শিয়ালকোট]-এর প্রতি যতোটা প্রীতি, ততোটা তো তক্ষশীলার ওপর থাকতে পারে না। এদিকে পার্শব দরায়ুর অধীন জনপদগুলো রথে যোতা ঘোড়ার মতো অগ্রসর হবার জন্যে শুধু সংকেতের অপেক্ষা করছে।

—এই আশঙ্কা মাঝে মাঝে আমাকেও বিচলিত করে আচার্য।

—কিন্ত পুত্র, এ থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই আপাতত আমি দেখছি না। উপায় যা আছে, তা আমরা স্বীকার করতে পারি না। উত্তরাপথের [পঞ্জাব] সমস্ত গণ এক সঙ্গে মিলিত করে এক সঙ্ঘ, এক শাসনাধীন করা যদি সম্ভব হয়ও —তবু তাতে আমাদের গণস্বাতন্ত্র্য, গণ-মর্যাদা, রুধির-বন্ধুত্ব সবই ছাড়তে হবে। এ কাজ করতে আমাদের কোনো শিশুও রাজী হবে না। সহানুভূতি, একই ধরনের বিপদ ইত্যাদি কারণে আমাদের গণগুলির মধ্যে যে একতা এখন রয়েছে, তা যতোক্ষণ থাকবে, ততোক্ষণ আমরা পার্শবদের মহাসিন্ধুর এপারে আসতে দেবো না।

পাঁচ

রোহিণী

এখন আমার বয়স চব্বিশ, আর রোহিণীর ষোলো। রোহিণীর আর আমার মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক কখন যে তরুণ-তরুণীর প্রেমে পরিণত হয়েছে, সে কথা আমরা নিজেরাই জানি না। তবে বছরখানেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে। সে সময় আমার খুব কঠিন অসুখ হয়েছিলো। জ্বর সপ্তাহ-খানেক একই রকম ছিলো। বৈদ্যের ওষুধেও কোনো ফল হচ্ছে না দেখে আচার্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে বারবার আমার ঘরে আসতে হতো। তাই আচার্যের শয়নকক্ষের পাশে একটি ঘর আমার জন্যে খালি করে আমাকে সেই ঘরে রাখা হয়েছিলো। আমি ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে-ছিলাম। কেবল জল আর ওষুধ খেয়ে বেঁচেছিলাম। আচার্য আর আচার্য পত্নী যে দিনের মধ্যে কতোবার করে আমাকে দেখতে আসতেন, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু রোহিণী আমার রোগশয্যার পাশে সবসময় হাজির থাকতো। সে একখানি মোড়ার ওপর বসে আমাকে পাখা দিয়ে বাতাস করতো, ওষুধ খাওয়াতো, শুশ্রূষা করতো। আমি যখনই তাকে তার ঘরে গিয়ে একটু ঘুমোতে বলতাম, তখনই সে উত্তর দিতো -- 'এই তো ঘুম থেকে উঠে আসছি।' আমার মস্তিষ্কের তখন এমন আচ্ছন্ন অবস্থা যে, তার এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক বলেই মেনে নিতাম। কিন্তু বেশ দেখতে পেতাম, রোহিণীর লাল ওষ্ঠাধর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। একদিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। চেতনা ফিরে এলে যখন চোখের পাতা দুটি অল্প অল্প খুললাম — দেখলাম রোহিণীর দু'চোখ অশ্রুপ্লাবিত। তখন আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, তবু বহু কষ্টে ডাকলাম --- 'রোহিণী।' সে মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করলো। আমি আবার বললাম -- 'তুমি কাঁদছো রোহিণী। আমি দেখে ফেলেছি।'

সে চোখ মুছে আমার দিকে চাইলো। তার আঁখিপল্লব তখনো ভিজে। নীল চক্ষুতারকা দুটির ওপর জলের আবরণ পড়েছে। আমি হাত বাড়াতে গেলাম — রোহিণী সরে এসে মাথা নীচু করলো।

কতোদিন যে রোহিণী তার চুলের কোনো যত্নই করেনি, তা বলা কঠিন। তবু সেই রুক্ষ কেশরাশি কৌষেয়তন্তুর মতোই কোমল। আমি সেই কোমল

কেশগুচ্ছে অঙ্গুলিচালনা করতে করতে বললাম—রোহিণী। আমি ভালো আছি, তুমি চিন্তা করো না।

—হ্যাঁ, সিংহ ভাই। তুমি ভালোই আছো। —সে নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করে উত্তর দিলো।

—তবে তুমি কাঁদছো কেন?

রোহিণী কোনো জবাব না দিয়ে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সেই হাত দু'খানির স্পর্শ বড়ো শীতল, বড়ো মধুর মনে হলো।

পরদিন থেকে আমার জ্বর ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। অবশেষে সুস্থ হয়ে পথ্য করলাম। আমার এই আরোগ্যে রোহিণীই খুশী হলো সবচেয়ে বেশী।

আরো এক বছর গত হলো। এখন আমার শরীর আগের মতোই বলিষ্ঠ। তখন গ্রীষ্মকাল—আঙুর পাকবার সময়। সবুজ পত্রবহুল এক দ্রাক্ষালতায় আমি রোহিণীর কেশরাজি সাজিয়ে দিলাম। তারপর সবুজ-হলদে দ্রাক্ষার একটি ছোট গুচ্ছ তাতে ঝুলিয়ে দিলাম। তার দুই কানে এক-একটি কাপি-শেয়ী দ্রাক্ষা দুলছে। গলায় দ্রাক্ষারই তিন-নরী [প্যাঁচ] হার।

আমি বললাম—রোহিণী! তোমার অরুণ-বর্ণ মুখখানিতে, তোমার সোনালী চুলের গুচ্ছে, তোমার অস্ফুট বক্ষে এই দ্রাক্ষার অলংকার কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

—তুমি তো কেবল আমার এমনি প্রশংসাই করো। রোহিণী এই কথা বলতেই তার দৃঢ় হাতখানি আমার কর্কশ হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে খালের মৃদুগামী জলধারার কাছে নিয়ে গেলাম। সে আমার সঙ্গে যেতে কোনো দ্বিধা করলো না। কেবল তার গাল দুটিতে ঈষৎ লালের আভা ফুটে উঠলো। খালের ধারে বসে জলের দিকে চেয়ে বললাম—দেখো রোহিণী! তুমি কতো সুন্দরী!

রোহিণী মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে আমার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বললো—আর তুমি? দেখো তো, তোমার চোখ দুটি কী সুন্দর! তোমার সৌন্দর্যের কাছে আমার সৌন্দর্য কতো তুচ্ছ!

—না, এ কথা ভুল রোহিণী। তুমি মোহিনী।

—ঠাট্টা রাখো তো!

—ঠাট্টা! এসো, আমরা আমাদের দু'জনের মুখ জলে পাশাপাশি প্রতি-বিম্বিত করি। কিন্তু মনে থাকে যেন, সুবিচার করবে।

আমার বাম গণ্ডে নিজের দক্ষিণ গণ্ড স্পর্শ করাতে সে কোনো আপত্তি করলো না। এমনিভাবে আমরা পরস্পরের মুখ পাশাপাশি রেখে তার ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত করলাম। রোহিণীর অর্ধ-নিমীলিত চোখের নীল

তারা দুটি বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিলো। লাল অধরে হাসির রেখা তার সুন্দর মুখখানির শোভা শতগুণে বর্ধিত করেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সত্যি করে বলো তো রোহিণী, তুমি কি বনদেবী, না দেবাঙ্গনা ?

দেখলাম, রোহিণী নিজেকে নয়, আমার প্রতিবিম্বই মুগ্ধচিত্তে দেখছিলো। আমার কথায় সে তখনি জলের দিক থেকে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে বললো—না, সিংহের মুখখানি আরো সুন্দর।—তারপর তার ওষ্ঠ দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ করলো। তার উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ আমি অনুভব করলাম। আমি দু'হাতে তার সুবিন্যস্ত কেশরাজি বাঁচিয়ে তাকে অমনি করেই ধরে রাখলাম—সরে যাবার সুযোগ আর দিলাম না। এমনিভাবে কতোক্ষণ কাটলো কে জানে। তারপর আমার মনে পড়লো, আমাদের এখনো কুড়ি টুক্‌রী আঙুর তুলতে হবে।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম—রোহিণী, এবার আমাদের আজকের কাজ শেষ করতে হবে।

আমরা আমাদের টুক্‌রীতে আঙুরের গুচ্ছগুলি কেটে কেটে রাখলাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা উদ্যান-ঘরের ছাদের ওপর উত্তর-দক্ষিণে খাড়া দেওয়ালে জানালার মতো অসংখ্য ছিদ্রে শুকোবার জন্যে সেই গুচ্ছগুলি টাঙিয়ে দিলাম। রোহিণী গুন্‌গুন্ করে কি একটা সুর ভাঁজছিলো। আমি তাকে গাইতে বললাম। সে আপত্তি করলো না।……আমি বললাম—দ্রাক্ষা ফসলের এই সময়টি যদি কখনো শেষ না হতো, তা হলে কী ভালোই না হতো রোহিণী!

সে উত্তর দিলো—আর সবসময়ই যদি প্রত্যুষকাল হতো! কখনো মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা বা রাত্রি না হতো!

—আর তুমি চিরকাল ষোড়শী পিঙ্গলা থাকতে!

—সেই সঙ্গে তোমার শিক্ষাও কখনও সমাপ্ত না হতো!—এই কথা বলতে বলতে রোহিণীর মুখ কিছুটা ম্লান হয়ে গেলো।

—শিক্ষা সমাপ্ত না হতো কেন বলছো রোহিণী?

রোহিণী কম্পিত স্বরে বললো—কি জানি, তুমি যদি বৈশালীতে ফিরে যাও।

—তোমাকে না নিয়ে? তা হতেই পারে না রোহিণী।—বলেই বিচ্ছেদের আশংকায় তাকে দৃঢ়ভাবে আমার বুকে চেপে ধরলাম।

রোহিণীর সেই একটি কথা—'কি জানি, তুমি যদি বৈশালীতে ফিরে যাও', রাত্রে শয়নকালে বারবার আমার কানে ধ্বনিত হতে লাগলো। রোহিণীর আশংকা নিরর্থক নয়। বৈশালীর জন্যেই তো আমি তক্ষশীলায় এসেছি।

আমাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি বৈশালীর গৌরব রক্ষা করবার জন্যে এমন কি আছে, যা উৎসর্গ করতে পারি না ? আমি আমার নিজের মনকেই প্রশ্ন করলাম —যদি তোমার বৈশালী আর রোহিণীর মধ্যে একটাকে বেছে নেবার প্রয়োজন হয়, তবে তুমি কি করবে ? সে সময় যে উত্তর আমার মনে এলো, তাতে হৃদয়ে সহস্র সূচী বিদ্ধ হবার মতো যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। এমন যদি হয়ই, তবে বৈশালীকেই বরণ করতে হবে। তবে কি রোহিণীর প্রতি আমার এ প্রেম মিথ্যা ? না —বৈশালীর প্রতি আমার এ প্রেম সব প্রেমের সীমার ঊর্ধ্বে। —এই কথা বলে নিজের মনকেই প্রবোধ দিয়ে আবার বললাম —আমি রোহিণীকে বৈশালীতে নিয়ে গিয়ে আমার এই দুই অনুরাগই বজায় রাখতে পারি। কিন্তু এও তো ঠিক কথা নয়। আমার কাছে যেমন বৈশালী, রোহিণীর কাছে তার তক্ষশীলা —তার পিতামাতার তক্ষশীলা ঠিক তেমনি প্রিয়। তাছাড়া আচার্য তাঁর একমাত্র সন্তান রোহিণীর বিচ্ছেদ-বেদনা কেমন করে সহ্য করবেন ?

সে রাত্রের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। মনে হচ্ছিলো, আমাকে যেন প্রজ্জলিত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জানি না, কখন নিদ্রা এসে আমাকে অগ্নি-জ্বালা থেকে উদ্ধার করে তার শীতল অঙ্কে আশ্রয় দিয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর উঠে ভালো করে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেললাম —রোহিণীর কাছে যাবার আগে রাত্রের সমস্ত চিন্তারাশিকে যেন ধুয়ে-মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রোহিণী যখন বললো, 'রাত্রে বোধ হয় কিছু দুঃস্বপ্ন দেখেছো' — তখনই আমার সেই চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারলাম।

আমার বুকের ভিতর কাঁপতে লাগলো। সারা দেহের বর্ণ যেন মুহূর্তে পালটে গেলো। সেই বিবর্ণতা যাতে রোহিণীর চোখে না পড়ে সেজন্যে তার চোখের দিকে চেয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো —হ্যাঁ! কিন্তু প্রিয়ে রোহিণী! স্বপ্ন তো প্রাণে ব্যথা দিতেই আসে।

—কি, কি স্বপ্ন দেখেছো ?

—সবটুকু মনে নেই।

—যেটুকু মনে আছে, তাই বলো প্রিয়।

— একটা বিকটাকার রাক্ষস তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি আমার কোষ থেকে খড়্গ বার করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা, খড়্গ বেরোলো না। তখন কোষ সমেত খড়্গ ফেলে দিয়ে সেই রাক্ষসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর তার ভুজদ্বয় থেকে তোমাকে উদ্ধার করে যখন মাটিতে নামিয়ে রাখছি, তখন সে আমাকে প্রহার করতে লাগলো। আমি প্রহার গ্রাহ্য করলাম না বটে ; কিন্তু দেখলাম চেতনা হারিয়ে তোমার দেহ শিথিল হয়ে আসছে।

—না প্রিয়, এ সময় আমি স্বেচ্ছন্দ হতে পারি না।—এই কথা বলে রোহিণী আমার বাহুতে জড়ানো তার বাহুর বল কতোটা, তা দেখালো।

—না রোহিণী, আমি স্বপ্নের কথা বলছি। স্বপ্নের কথা উল্টোই হয়ে থাকে।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি স্বপ্নের কথা বলছো না। জাগ্রত অবস্থার কথাই বলছো।

—হ্যাঁ, প্রিয়ে রোহিণী! আমার হৃদয় আতঙ্ক-পীড়িত। অনিষ্টের কল্পনাও বড়ো ভীতিপ্রদ।

—তারপর? রাক্ষসটাকে তুমি কি করলে প্রিয়?

—আমি আত্মরক্ষা করতে করতে তার চিবুকে এক ঘুষি মারলাম। সেই আঘাতে সে মাটির ওপর পড়ে গেলো, আর আমি তার বুকের ওপর চেপে বসলাম।

—সেদিন যেমন তক্ষশীলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিক দণ্ডকে তুমি পরাজিত করেছিলে, ঠিক তেমনি করে না সিংহ? ওঃ, সে দৃশ্য দেখে আমার কী আনন্দই না হয়েছিলো! গর্বে আমার মাথা হিমালয়ের মতো উচ্চ বোধ হয়েছিলো। আমার সখীরাও আমাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজে পায়নি, তারা শুধু হাসিমুখে আমার এই পরোক্ষ বিজয়কে উপভোগ করেছে।

—আর তুমি, রোহিণী?

—আমিও। আনন্দে আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো।

—আমি সেই রাক্ষসকে শেষ অবধি পরাস্ত করেছি। কিন্তু উঠে দেখি তুমি সেখানে নেই। তখন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা! এমন সময় ঘুম ভেঙে গেলো।

—স্বপ্ন সত্যি হয় বলে তুমি বিশ্বাস করো প্রিয়তম?

—না, আমি বিশ্বাস করি না, রোহিণী।

—বাবাও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মা বিশ্বাস করেন—স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিপরীত ফল হয়, ভালো দেখলে খারাপ, আবার খারাপ দেখলে ভালো।

—যদি বিশ্বাস করতেই হয়, তবে মায়ের মতোই বিশ্বাস করবো রোহিণী।

—আর……

ছয়

পার্শ্বদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি

যবন-বিজয়ে সফল না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ব শাসকের [শাহ্] পূর্ব দিকে রাজ্যসীমা বিস্তারের উৎসাহ ছিলো না। শাহ্ আর্তক্ষত্র শুধু একটা গোল-মাল সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। তক্ষশীলার একটা বিশেষ সুযোগ ছিলো —এখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গতিবিধির সব খবরই খুব সহজে পৌঁছে যেতো। তক্ষশীলার সার্থ আর বণিকরা পার্শ্ব রাজধানী পর্শুপুর [পর্সোপোলী] অবধি যাতায়াত করতো। তক্ষশীলার বৈদ্য এবং যুদ্ধবিদ্যা অধ্যাপকদের পার্শ্ব দরবারে চাহিদাও ছিলো খুব। সুতরাং পূর্ব গান্ধারের বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রস্তুতিই গোপন রাখা সম্ভব নয়।

যখন পার্শ্বদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির খবর এসে পৌঁছালো তখন তক্ষশীলায় ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে, বর্ষাও শুরু হয়ে গেছে। আমার তক্ষশীলায় আগমনের এটা অষ্টম বর্ষ। তখন প্রতিদিন গণ-সংস্থার বৈঠক বসতো, আচার্যকেও বড়োই চিন্তিত দেখতাম। একদিন আচার্যকে আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন - বৎস! পূর্ব গান্ধারের ওপর সংকটের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। শাহ্ গান্ধারের ক্ষত্রপকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে আদেশ দিয়েছেন।

--যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি! তক্ষশীলার ওপর আক্রমণ!

---হ্যাঁ, আমরা এ অবস্থা স্বীকার করে নিয়েছি। এখন প্রতিটি নাগরিকের একমাত্র কর্তব্য হলো সৈনিকবৃত্তি। সুখের বিষয় যে উত্তরাপথের [পঞ্জাবের] সমস্ত গণ আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছে। এই বৃদ্ধাবস্থায় তো আর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতে পারি না --কিন্তু সেনানায়কদের শিক্ষাদীক্ষার ভার আমার ওপরই অর্পণ করা হয়েছে।

—আচার্য! আমার বিশ্বাস, তক্ষশীলার এই সংগ্রামকে বৈশালী নিজের সংগ্রামে পরিণত করতে পারে।

—নিশ্চয়। আমি তো কতোবার বলেছি, বৈশালী প্রাচীর তক্ষশীলা। এরা দুই ভগ্নী।

—তবে আপনার শিষ্য সিংহকেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন।

—আমার তো মনে হয়, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি যুদ্ধ উদ্ধারিকার [কমিটী] সম্মতি প্রার্থনা করবো।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, উদ্ধারিকা শুধু আমাকেই নয়, বৈশালী থেকে আগত আরো পাঁচ জন তরুণকেও নাগরিক সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার অধিকার দিলো। নাগরিক ছাড়া হাজার হাজার আগন্তুক এবং কর্মকর তক্ষশীলার জন্যে যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলো ; তাদেরও সে অনুমতি মিললো।

তক্ষশীলার প্রত্যেকটি নাগরিকের পক্ষেই যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু পার্শবদের মতো এক বিরাট শক্তির সঙ্গে এবার যুদ্ধ করতে হবে, তাই চারিদিকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা, ব্যূহ-রচনা, কৃত্রিম আক্রমণের মহড়া চলতে লাগলো। তক্ষশীলার সকল নাগরিকেরই নিজের নিজের সৈন্ধব ঘোড়া আর অস্ত্র-শস্ত্র ছিলো। কারো কোনো কিছুর অভাব থাকলে গণ-এর পক্ষ থেকে তা পূরণ করা হতে লাগলো। সেনানায়করা আপন আপন বাহিনীকে নিপুণ করে গড়ে তুলতে লাগলেন। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বহুলাশ্বের ওপরে তাঁদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার ছিলো। আচার্য তাঁর নিজের কবচ [বর্ম], সবচেয়ে ভালো ঘোড়াটি আমাকে দিয়েছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে আমার কাছে ছিলো একটি শার্ঙ্গ ধনুক, একটি তূণ, একটি দেড় হাত লম্বা সোজা খড়্গ, একটি শল্য, একটি ছোরা আর একটি ভারী গদা।

প্রতিদিনই আমরা শত্রুর গতিবিধির সংবাদ পাচ্ছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে বেশী সহায়ক ছিলেন পশ্চিম গান্ধারের ভ্রাতারা। জোর করে অবশ্য তাঁদের শাহের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হচ্ছিলো ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিলো যে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালন করবেন —এবং তা তাঁরা শেষ পর্যন্ত করেওছিলেন।

বর্ষাকাল শেষ হলেই আক্রমণ শুরু হবে, আমরা এ সংবাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু বর্ষণ এদিকে খুব কমই হয় ; সুতরাং কোথাও শত্রু অকস্মাৎ আক্রমণ করতে না পারে এজন্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কিয়দংশ সীমান্ত ঘাঁটিগুলিতে পাঠানো হলো। আচার্য আমার ওপর পুষ্কলাবতী থেকে আসার পথে ঘাঁটি রক্ষার ভার দিলেন। সেখানে রক্ষী সৈনিকরা উপস্থিত ছিলো। নির্দেশ পেলেই আমাকে যাত্রা করতে হবে। এই সময় তক্ষশীলা নগরীর প্রস্তরের প্রাকার [পাঁচিল] আরো দৃঢ় করা হলো এবং নগর-দ্বারেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। সামান্য কিছুক্ষণ যদি আপনি সে সময় নগর-দ্বারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেন, তাহলেই দেখতে পেতেন যে কতো অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে নগরে প্রবেশ করছে, আবার কতো অশ্বারোহী ঠিক অমনি করেই বেরিয়ে যাচ্ছে। এরা সকলেই আদেশবাহী অশ্বারোহী।

একদিন আচার্য আমাকে বললেন —এবারের যুদ্ধ খুব সহজ হবে না। পার্শ্ব শাহ্ তক্ষশীলাকে ধ্বংস করার জন্যে শুধু শিবি, সৌবীর, পখ্‌ত ভলানস-ই নয়, বক্ষুর [আমু নদী] উত্তর আর পর্শুপুরীর [পর্সোপোলী] পূর্ব দিকের বিপুল জনবল প্রস্তুত রেখেছেন। আমরাও একলা নই —মল্ল, মদ্র···সব গণগুলিই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এবং মহাসিন্ধুর তীরে নিজেদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলিতে তাদের বেশ কিছু সৈন্য এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে। যুদ্ধে আক্রমণকারীই প্রথমে বেশী সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। কারণ মহাসিন্ধু আমাদের সংযোগ রক্ষার মস্ত বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবে আমাদেরও একটা মস্ত বড়ো সুবিধা আছে। শত্রুসেনা যেখানে খুশী সেখানেই নদী পার হতে পারবে না। তাদের যেখান দিয়ে নদী পার হতে হবে, সেখানেই আমাদের সুরক্ষিত গুপ্ত ঘাঁটি আছে। সুতরাং তারা তাদের সংখ্যাধিক্যের পুরো সুযোগটা নিতে পারবে না।

সর্বপ্রথম যেদিন আমি কবচ ধারণ [বর্ম পরিধান] করে, শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে, খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গ, তূণ ধারণ করলাম —সেদিন রোহিণী আমার কক্ষেই ছিলো। সে আমার এই সজ্জা দেখে আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলো।

আমি বললাম -- প্রিয়ে! এই কঠিন লৌহের স্পর্শে তোমার কষ্ট হবে।

—আমার কষ্ট হবে? না, সিংহ। আমরা তক্ষশীলার তরুণীরাও নিজেদের প্রস্তুত করছি। তক্ষশীলার বালকদের যেমন প্রথমে খড়্গের গাত্র থেকে মধু লেহন করতে দেওয়া হয়, তক্ষশীলার বালিকাদেরও ঠিক তেমনি করেই অস্ত্রসেবী করে গড়ে তোলা হয়।

আমি শিরস্ত্রাণ সরিয়ে রোহিণীর কাঁধের ওপর হাত দু'খানি রেখে বললাম —প্রিয়ে রোহিণী! এ ব্যাপারে বৈশালীর চেয়ে তক্ষশীলার নারী অনেক ঊর্ধ্বে।

—লিচ্ছবি-নারীরা কি গান্ধারের নারীদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে না?

—যেতে পারা-না-পারার কথা নয়। কত বৈশালী নারী পূর্বে সেনা-সঞ্চালন, দুর্গ-গোপন প্রভৃতিতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এখন সব লিচ্ছবি-নারীই নিজেদের এ কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলে না।

—কেন প্রিয়?

—এর হয়তো অনেক কারণ আছে। কিন্তু বৈশালীতে দাস-দাসী আর অনার্যের বাহুল্যই এর প্রধান কারণ বলে আমার মনে হয়। তক্ষশীলার সাদাসিধে জীবনযাত্রা আমাকে প্রথম দিনই প্রভাবিত করেছে। আমার আচার্যের মতো কর্মান্ত, পশু আর বাণিজ্যের মালিক বৈশালীতে এমন করে

দাস-দাসীদের সঙ্গে একত্রে খায় না বা একসঙ্গে নৃত্যও করে না। সেখান থেকে জীবনের স্বাভাবিক স্বাদ, কাঠিন্য —সব বিদায় নিয়েছে। অবশ্য সৈনিক-জীবনের প্রয়োজনে নাগরিকদের কঠিন জীবন-যাপনে বাধ্য হতে হয়।

—প্রিয় সিংহ! আমি এখানেও কখনো কখনো অনার্যদের আমাদের গৃহে আসতে দেখেছি। একবার ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে আমাদের সার্থ যখন ফিরে এলো, তখন চার জন কৃষ্ণকায় লোক তাদের সঙ্গে এসেছিলো। পিতা তাদের নিজের পাশে বসিয়ে কাপিশেয়ী সুরা আর কোমল বাছুরের মাংস দিয়ে তৃপ্ত করেছিলেন। এটা তোমার এখানে আসবার এক বছর আগের কথা। আমি জিজ্ঞাসা করায় বাবা বললেন, এই গান্ধার, মদ্র···সবই একদিন এদের ছিলো। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন অশ্বারোহণে পশ্চিম থেকে এখানে এলেন, তখন এই বিস্তৃত ভূভাগ ওদেরই অধিকারে ছিলো। আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয় এবং তাতে আমাদের অশ্বারোহী পূর্ব-পুরুষরাই জয়লাভ করেন। ওদের দেশও আমাদের দখলে আসে। কিন্তু প্রিয়, আমি দাস-দাসী কখনো দেখিনি। তারা দেখতে কেমন?

—তুমি দেখেছো রোহিণী। সেদিন সুদত্তর সার্থের প্রধানের সঙ্গে একজন কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে এসেছিলো।

—হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। তার চুল আর গায়ের রঙ একই রকমের কালো। তার চোখ দুটো লাল লাল —আগুনের মতো। নাকটা তার খুব চওড়া, থুতনি বেশ বড়ো। লোকটা বেঁটে, বেশ স্বাস্থ্যবান বলেই মনে হচ্ছিলো। দাস কি এই রকমই হয়?

—না, বিশেষ কোনো রঙ কিংবা রূপ [আকৃতি] হলেই কেউ দাস হয় না। অবশ্য বেশীর ভাগ দাসই কৃষ্ণকায়। কিন্তু দাস বলে তাদেরই, যাদের তুমি যখন খুশী নিজের ঘোড়া কি বলদের মতো বেচতে-কিনতে পারো।

—বেচতে-কিনতে পারা যায়?

—হ্যাঁ প্রিয়ে রোহিণী! এই তক্ষশীলাতেও যখন এক-দেড় হাজার বছর আগে প্রথম আর্যরা এসেছিলেন, তখন তাঁরাও পরাজিতদের দাস প্রথা অনুসারে দাস-দাসী করেছিলেন। তাঁদেরও প্রচুর দাস-দাসী ছিলো। কিন্তু পরে তাদের প্রভাব বাড়তে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন।

—ভয় কিসের?

—প্রথম ভয় রুধির সংমিশ্রণের। যদি সংমিশ্রণ হতো, তাহলে তোমার এই স্বর্ণ-বর্ণ কেশ আজ অন্য রঙের হতে দেখা যেতো রোহিণী! দ্বিতীয় ভয় সৈনিক-জীবনের কঠোরতা ত্যাগ করে শান্তশিষ্ট আরামপ্রিয় নাগরিক হয়ে যাবার। আবার সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিলো —প্রতিবেশীদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ চলার সময় সবদিক থেকে গৃহে এইসব দাসদের প্রভাবের ভয়।

—তাহলে এ প্রভাব লিচ্ছবির নারীদের ওপর পড়লো কি করে ?

—কর্মান্ত, পশুচারণ প্রভৃতির জন্যে ওখানে ছিলো প্রচুর দাস, আর রন্ধন, কোটা-বাছা ইত্যাদির জন্যে ছিলো দাসীর দল। যদি তক্ষশীলাতে এই ব্যবস্থা হতো, তবে তুমি আজকের রোহিণীর পরিবর্তে কি হতে বলো তো ?

—তুমিই বলো প্রিয় !

—তোমার হাত পদ্মের মতো লাল আর কোমল হতো।

—কোমলও হতো ? তাহলে তো খড়্গ-চালনা বা কোদাল নিয়ে কাজ করতে পারতাম না। ধনুকের ছিলা টানতে গেলে আঙুলে ফোস্কা পড়ে যেতো।

—আর তোমার গাল আরো রক্তিম হতো ; কিন্তু রোদের স্পর্শ সহ্য করা কঠিন হতো।

—তাহলে তো আমাকে ঘরের ভেতর বন্দিনী থাকতো হতো !

—একটুখানি হাঁটা-চলাতেই তুমি হাঁপিয়ে উঠতে।

তার ফলে আমাকে জলাশয়ে সাঁতার দেওয়া, জলক্রীড়া এসব থেকেও বঞ্চিত হতে হতো।

—আর সব কাজেই দাসীদের ওপর নির্ভর করতে হতো।

—তাহলে আমার এ হাত দুটোর প্রয়োজন রইলো কোথায় ? আমি তো কখনো এ অবস্থা পছন্দ করতাম না।

কিন্তু যদি তোমার পিতামহী-প্রপিতামহী থেকে সকলেই এইভাবে চলতেন, তাহলে তোমাকেও এটা পছন্দ করতে হতো।

—কিন্তু প্রিয় সিংহ ! আমি তো এ কথা ভাবতেও পারছি না। বাবার কথা তো শুনেছো —"অলস লোকের দণ্ড হলো মেদ।" দাসীর পরিচর্যায় যারা থাকে, তারা তো এক-একটি মোষ তৈরী হবার কথা। লিচ্ছবির সব নারীরাই কি এমনি হয় ?

—না প্রিয়ে। সোমাকে দেখতে তোমারই মতো। লিচ্ছবির সকলেই এমন ভাগ্যবান নয় যে দাস দিয়ে তাদের সব কাজ করাবে। এ হলো শুধু ধনী লিচ্ছবিদের কথা। তবে তাদের দেখে দেখে সকলেরই এইরকম জীবন যাপনের লোভ হয়। পুরুষদের তাতে বাধা হলো সৈনিক-জীবন পালনের শিক্ষা। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই ব্যাধি খুব ছড়িয়ে পড়ছে।

—তবে কি বৈশালীতে গেলে আমাকেও এমনি হতে হবে প্রিয় ?

আমি তার সুন্দর গণ্ডে আমার ললাট স্পর্শ করে বললাম —না রোহিণী ! তুমি ওখানকার স্ত্রীলোকদের গান্ধারবাসিনীদের জীবনযাত্রা শিক্ষা দিয়ো। আমার মা তোমার মতোই কাজ করেন। তিনি তোমাকে খুব পছন্দ করবেন।

—আর সোমা ?

—সোমার এখনো বিয়ে হয়নি। সে সুন্দরী। যদি সে কোনো ধনী লিচ্ছবি-কুমারকে ভালোবাসে, তাহলে হয়তো সেও অমনি হয়ে যাবে।

—না, আমি আমার ননদকে এমন হতে দেবো না।

আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ থাক। এখন বলো তো, এই বর্ম আমার দেহে ঠিক হয়েছে তো ?

—দাঁড়াও, আগে পিছন দিকটা দেখি।—এই কথা বলে সে পিঠের দিকটা দেখতে লাগলো, তারপর সোৎসাহে বলে উঠলো—মনে হচ্ছে, যেন এই বর্ম তোমার জন্যেই তৈরী হয়েছে। তোমার বক্ষ এত বিশাল, আগে তো কোনোদিন খেয়ালই করিনি।

—কারণ তুমি রোজই আমার বক্ষদেশ দেখছো, আর রোজই তো তা চার আঙুল করে বাড়ছে না।

রোহিণীর চক্ষুতারকা আনন্দে যেন উচ্ছল। সে বললো—না, রোজ নয়—প্রতি মুহূর্তে। এটা আমার দাদুর বর্ম ছিলো। তাঁর মতো বিস্তৃত বুকের ছাতি সে সময় আর কারো ছিলো না।

—তোমার দাদুর ? আমি যেন স্বপ্নাবেশের মধ্যেই বললাম।

—হ্যাঁ, আর এটা সব সময় বিজয় এনে দিয়েছে। তুমিও এটা পরে রণক্ষেত্র থেকে বিজয়ী হয়েই ফিরবে সিংহ।

—রোহিণী, তোমার হাসিমুখ দেখলে আমার কী যে আনন্দ হয় !

—আমার হাসিমুখ হবে না কেন ? গান্ধারী নারীদের সবচেয়ে আনন্দের সময় হলো তখন, যখন তাদের প্রিয়তম রক্তাক্ত কর্দমভরা রণক্ষেত্র থেকে রক্তাক্ত দেহে ফিরে আসে। তুমি তো জানো না, আমি আমার সখীদের কাছে কতো গর্বের সঙ্গে তোমার হাতের ঐ খড়্গচিহ্নের কথা বলি। খড়্গচিহ্নের মতো কোনো অলংকারই নেই, ওর চেয়ে বড়ো গৌরবও আর কিছু নেই।

আমি করত্রাণ খুলে ফেলে রোহিণীর কোমল কেশযুক্ত মাথায় হাত দিয়ে বললাম—প্রিয়ে! তক্ষশীলায় আমার শেখবার মতো এখনো অনেক কিছুই আছে, এ কথা বেশ বুঝতে পারছি। তোমার মতো বীরাঙ্গনা নিজের তরুণ প্রেমিকের অন্তরে কতোখানি শক্তি সঞ্চার করে, তা বোধ হয় জানো না।

—হ্যাঁ, মৃত্যুকে আমরা গান্ধারবাসীরা ভয়ের বস্তু বলে মনে করি না। মৃত্যুকে ভয় কিসের ? মরার আগেই মৃত্যুভয় নিছক মূর্খতা। আর মৃত্যু হবার পর তাকে ভয় করবার জন্যে কেউ বেঁচে থাকে না। জীবন-রসের স্বাদ পাবার জন্যেই আমরা প্রতিটি মুহূর্তকে ব্যয় করতে চাই। জীবন থাকবে না—এ কথা চিন্তা করবার সময় আমাদের কোথায় ?

—কিন্তু মৃত্যু প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ ঘটায়।

—তাতে কি ? যে ভীরু, তাকে আমরা প্রিয় বলে মনে করবো ? না প্রিয়তম। যে বীর, যে নির্ভয়, আমরা শুধু তাকেই প্রিয় বলে মনে করি। আর তার অর্থই হলো, সে প্রেমের মূল্য দিতেও আমরা প্রস্তুত।

যখন রোহিণী এই কথাগুলো বলছিলো, তখন তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে। তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনছিলাম না, শ্রবণ দিয়ে পান করছিলাম। ভাবছিলাম, বৈশালীতেও এমনি স্ত্রী, এমনি মাতা, এমনি ভগ্নী চাই। সেখানে যে এমন নারী নেই তা নয়, কিন্তু সকলে তো এমন নয়।

আমি আবার বললাম রোহিণী! তুমি আমার কতো প্রিয়। সত্যি বলতে কি, প্রেমে কেবল জীবনেরই স্থান আছে, মৃত্যুর নয়।

—প্রেম চিরদিন জীবিত থাকে সিংহ। শুধু যতোদিন দু'জনের মধ্যে একজন বেঁচে থাকে ততোদিনই নয় —তারপরও সেই 'প্রকাশমান লোকে' —যেখানে আমাদের পিতৃপুরুষরা আছেন, সেই 'পিতৃলোকে'ও প্রেম জীবিত থাকে।

এমন সময় মায়ের গলা শুনতে পেয়ে রোহিণী সেদিকে দৌড়ে গেলো। আচার্যের ঘরে তাঁর আহ্বান শুনে আমি সেখানে গেলাম। আচার্য আমার বর্ম দেখে বললেন —সিংহ, এই বর্মে তোমায় খুব সুন্দর মানিয়েছে।

আমি মাথা নীচু করে আচার্যের কথায় সায় দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমার সে সময় রোহিণীর 'পিতৃলোক' কথাটা মনে এলো। তখন আমি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলাম —আচার্য! মৃত্যুর পর বীর পিতৃপুরুষের প্রকাশমান লোকে গমন করে, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

—আমার বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করো না পুত্র। আমি এটাকে একটা মধুর কল্পনা বলেই মনে করি। প্রাচীর রাজারা নিজেদের প্রজাবর্গকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখার জন্যে যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, আর যাকে কপট ঋষি প্রবাহণ প্রাচীতে প্রচলন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তার চেয়ে তো এ কল্পনা অনেক ভালো। ওরা এই পৃথিবীতে নিজেদের অধিকার আর ভোগের ঔচিত্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। এই দাস-দাসী প্রথা ওদের সৃষ্টি নয় —মানুষের কর্মফল, এই কথাই বোঝাতে চাইছে ওরা।

—তাহলে তো আচার্য, যারা জীবনের ধর্ম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে না, যাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্যটাই শুধু কল্পনামাত্র, তাদেরই এই কল্পনার প্রয়োজন।

—নিশ্চয়, পুত্র। দাস-প্রথাভরা সমাজে অলস লোকগুলোর শূন্য মস্তিষ্ক জীবন-রস গ্রহণের যোগ্য থাকে না। শ্রম, ব্যায়াম, নৃত্য ইত্যাদি আমাদের

ক্ষুধা সঞ্চার করে, যার ফলে আমরা আহার্য বস্তুর রসাস্বাদন করতে পারি, তাকে হজম করে নৃত্য, ব্যায়াম আর শ্রমের উপযুক্ত দেহ গড়ে তুলতে পারি। যদি আমরা রসাস্বাদের জন্যে আবশ্যকীয় শ্রম থেকে বিরত হই, তাহলে নিশ্চয় খুব বেশীদিন রসাস্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত থাকবো না। দাসের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল মানুষ নিজেকে জীবন-রস উপভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই তারা কখনো জীবন-রসের নিন্দা করে, কখনো দাসত্ব প্রথার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্যে পূর্বজন্মের কথা বলে। জীবনের রহস্য হয়তো অনেকখানিই অবিদিত। তবু জীবনকে বাদ দিয়ে জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা শুধু প্রতারণাই বলা চলে।

—আর এই তো জীবনের বড়ো সত্য আচার্য যে আমি তক্ষশীলার জন্যে জীবনটাকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।

—ঠিক বলেছো পুত্র! জীবনের সত্যতা অস্বীকার করলে আমরা আর মানুষ থাকবো না, কীটে পরিণত হবো। এমন পুরুষ তার গণ, বন্ধু, এমন কি নিজেরও মিত্র হতে পারে না। সে শুধু মিত্র হতে পারে আর্তক্ষত্রের মতো লুণ্ঠনকারী খুনীর, যে পরের ঘর, পরের সম্পদ দখল করতে চায়।

'তক্ষশীলার চিরযৌবন··

সাত

যুদ্ধক্ষেত্রে

তিন বার সংকেত-ধ্বনি শোনা গেলো। আমরা সকলে ধনুকে তীর লাগিয়ে সিন্ধুতীরে চারিদিকে ঘন অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ—আমরা সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একে অপরের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু আমাদের কান ছিলো নদীর দিকে। কিছুক্ষণ পরে জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো। সিন্ধুতীরে প্রস্তরময় ভূমির ওপর জলধারা এখানে তেমন বিস্তৃত নয়। আমাদের আশংকা ছিলো—পার্শব সেনা অন্ধকার রাত্রে এইখান দিয়েই নদী পার হবার চেষ্টা করবে। ওপারের জঙ্গলে লুক্কায়িত গুপ্তচরেরা আমাদের সজাগ করবার জন্যেই সংকেত-ধ্বনি করছিলো। ক্রমে ক্রমে সেই ছপ্ ছপ্ শব্দ আরো কাছে শোনা যেতে লাগলো। অন্ধকারে সেই সঞ্চরমাণ শব্দ শুনেই আমরা আন্দাজে তীর নিক্ষেপ করলাম এবং তীর ছোঁড়ায় যে কিছু ফল হয়েছে তাও বুঝতে পারলাম। কারণ এরপর দাঁড়ের শব্দ শুনে বোঝা গেলো, ওরা ফিরে যাচ্ছে। ভাবলাম, অন্তত আজ রাত্রে শত্রু আর এদিকে আসার চেষ্টা করবে না। ঠিক সেই সময় আর একবার সংকেত-ধ্বনি শোনা গেলো—অর্থাৎ বিপদ এখনো দূর হয়নি, শত্রু আরো প্রস্তুত হয়ে এপারে আসতে চাইছে।

ওদের নৌবাহিনী যে ছোট নয়, এ কথা আমরা জানি। শুধু মহাসিন্ধুর অপর পারেই নয়, কুভা [কাবুল] নদীর তীরেও অসংখ্য নৌকা প্রস্তুত হচ্ছে—এ খবর আমরা পেয়েছিলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, শত্রু সর্বস্ব পণ করে এপারে আসবার চেষ্টা করবে। আমরা এপারে সেরা সেরা তীরন্দাজদের জমায়েত করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুর এপারে পৌঁছে যাবার আশংকা ছিলো বলে খড়্গধারী সৈন্যদলও প্রস্তুত ছিলো। আর সেই সঙ্গে তটভূমিতে শুকনো কাঠ আর পাতা স্তূপাকার করে এখানে-ওখানে সাজিয়ে রাখাও হয়েছিলো।

যখন পঞ্চাশখানার মতো নৌকা এপারের দিকে প্রবল বেগে আসছিলো, তখন আমাদের ধনুর্ধর সৈন্যরা বাণ বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু তাতে নৌকাগুলির অগ্রগতি বন্ধ হলো না। তাদের অধিকাংশই এপারে পৌঁছে

গেলো। আমাদের কয়েকজন সৈন্য তটভূমির একদিকের শুকনো পাতা-গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। শত্রু এপারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই আগুন এমন প্রবল হয়ে উঠলো যে, তার লেলিহান শিখার আলোকে আমরা নৌকা থেকে অবতরণকালে শত্রুদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এখন তট-ভূমির ওপর অপেক্ষমাণ তীরন্দাজরা খুব ভালো করেই তাদের নিশানা ঠিক করে তীর ছুঁড়তে সক্ষম হলো। কিন্তু তবুও পার্শ্ব সৈনিকদের পিছু হটানো গেলো না। কারণ তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বর্মধারী। তাই যে মুহূর্তে তারা তটভূমি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, অমনি আমি আমাদের সৈন্যদের তাদের সম্মুখীন হবার আদেশ দিলাম। অগ্নির রক্তিম আভায় তরবারির ঝলকানি আর তুমুল জয়-নির্ঘোষ মুহূর্তের মধ্যে তটভূমির নিম্নাভিমুখী হলো। সেই স্বল্পকালের মধ্যে আর কিছু দেখতে বা শুনতে পেলাম না।

আমাদের যোদ্ধাদের একটা সুবিধা ছিলো। তারা ছিলো ওপরের দিকে, আর পার্শ্ব সৈনিকদের প্রায় খাড়া তটভূমি বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে হবে। পায়ের নীচে পাথর সরে সরে গিয়ে ওদের অসুবিধা আরো বাড়িয়ে তুললো। আমি একদিক থেকে অপরদিকে অবিরত ছুটোছুটি করে আমাদের সৈন্যদের উৎসাহিত করছিলাম আর দেখছিলাম যে, শত্রুসৈন্য দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। এই সময় এক বলিষ্ঠ বর্মধারীর ওপর আমার দৃষ্টি পড়লো। সে নীচে নেমে যাবার চেষ্টা করছে।

আমি যে কখন নীচে নেমে এসেছি জানি না। শুধু মনে আছে, আমার গদার প্রচণ্ড আঘাতে লোকটি মুহূর্তমধ্যে ধরাশায়ী হলো। কিন্তু তখনি আমার চারিদিক থেকে পার্শ্ব সৈন্যরা আমাকে প্রহার করতে শুরু করলো। বহু আয়াসে আমি আমার বাম হস্তকে দক্ষিণ হস্তের মতোই চালনা করতে শিখেছিলাম। আমার বাঁ হাতে তখনো বর্শা রয়েছে। পার্শ্ব সেনাপতির দেহ বর্মে আচ্ছাদিত থাকায় আমি তাঁকে গদার দ্বারাই ভূপাতিত করেছিলাম—হ্যাঁ, এই লোকটিই সারা সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, সে কথা পরে জানতে পেরেছিলাম।

আমি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নিজের গদা আর কিছুটা ব্যবধানে অবস্থিত সৈন্যদের দিকে বর্শা-চালনা করছিলাম। যেদিকে আমি আক্রমণ করি, সেদিকের সৈন্যরাই পড়তে থাকে—কিন্তু পেছন দিকে বর্মের ওপর শত্রুসৈন্যের আঘাতের পর আঘাত এসে পড়ছে। পেছন দিকে ফিরে দেখার বা সেই আঘাতের সংখ্যা গণনা করার অবসর নেই তখন। একের পর এক শত্রু-সৈন্যকে পড়তে দেখে আমার উৎসাহ তখন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে, আমার পক্ষের সৈন্যদের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ আমার আরো কাছে এগিয়ে আসছে। এমন সময়

একটা বর্শা এসে আমার স্কন্ধে বিদ্ধ হলো। সে আঘাত সামলাবার চেষ্টা করতে-করতে দেখলাম, এক বিশালদেহী পার্শ্ব সৈন্য তার বিশাল গদা আমার মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলো। আমিও তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানলাম বটে, কিন্তু তারপরই আমার চোখের সামনে নেমে এলো ঘন অন্ধকার।

আবার যখন চোখ খুললাম, তখন মধ্যাহ্নকাল। দেখলাম, একটি বিশাল বৃক্ষের পত্ররাজি বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ওপরের পাতাগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাশ ফিরতে গেলাম, কিন্তু সারা দেহের অণু পরমাণুতে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইলাম —ঠিক তখনি একটি পরিচিত মুখ আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়তে দেখলাম। আমার মাথা তখনো পরিষ্কার হয়নি। ভাবলাম, বীরেরা যেখানে চিরকিশোর অবস্থায় বাস করে আমি সেই পিতৃলোকে পৌঁছে গেছি। আর অমনি শুনতে পেলাম —'প্রিয়, কেমন আছো?'

সেই সংকটকালেও রোহিণীর কণ্ঠস্বর চিনতে আমার দেরী হলো না। আসলে রোহিণীর শিরস্ত্রাণ, নাসিকাত্রাণে আচ্ছাদিত মুখের জন্যেই আমার ভুল হয়েছিলো। আমি সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলে উঠলাম —রোহিণী, তুমি কোথায়?

— তুমি যেখানে, প্রিয় সিংহ।

—পিতৃলোকে কি আমাদের এই মিলন হচ্ছে?

— না সিংহ, ইহলোকে। বেশী কথা বলো না। আজ তৃতীয় দিনে তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি নিজেই সব বলছি। তুমি মহাসিন্ধুর তীরে ওপর দিকে ছিলে —সেখানে তুমি পার্শ্ব সেনাদের পরাজিত করেছো, আর তাদের সেনাপতিকে বন্দী করেছো।

—বন্দী?

—হ্যাঁ, বন্দী। তোমারই গদার আঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো, আর তারপর আমি তাকে বন্দী করেছি।

—রোহিণী, তুমি কখন সেখানে এসেছিলে?

—সব বলছি। - বলে রোহিণী তার হাতখানি আমার কপালে রাখলো। —প্রিয় সিংহ, তোমার শরীরে আর খুব বেশী রক্ত অবশিষ্ট নেই। তোমার অরুণবর্ণ মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। বৈদ্য নিষেধ করেছে —তুমি বেশী কথা বলো না কিংবা বেশী চিন্তাও করো না। আমি তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করছি। মনে আছে কি, আমি তোমাকে চিরগাঢ় আলিঙ্গন করেছিলাম আর তোমার আঁখি ও অধরে চুম্বন করেছিলাম? তুমি বলেছিলে —প্রিয়ে, আমার ক্ষুধার্ত কামনা পরিতৃপ্ত করো। আমি চিরতৃপ্তি প্রদান করেছিলাম।

তারপর আবার নিজের হাতেই তোমাকে বর্ম পরিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার মাথায় শিরস্ত্রাণ বেঁধে দিয়েছিলাম। তোমার দেহ বর্মাচ্ছাদিত করার পর একবার সেই লৌহের ওপরই আলিঙ্গন করেছিলাম। তারপর তোমার বাঁ পাশে খড়্গকোষ আর ডান পাশে ভারী গদা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি বাবা-মা'র আশীর্বাদ নিয়ে রণক্ষেত্রে যাত্রা করলে। সেইদিনই আমি সরস্বতীর কর্মান্তে যাবার জন্যে বাবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু সে আজ্ঞা তো সরস্বতীর জন্যে চাইনি —চেয়েছিলাম সামনের এই সরস্বতী মহাসিন্ধুর তীরে আসবার জন্যে। তুমি আবার কথা বলার চেষ্টা করছো প্রিয়তম? আমি জানি, তুমি আমাকে প্রশংসা করতে চাইছো। কিন্তু এখন কোনো কথা নয় —আগে তোমার কৌতূহল নিবারণ হোক।

কথার মাঝে স্বল্প বিরতির অবকাশে আমি আমার দেহের বর্তমান অবস্থা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম। তাই নীরবে লৌহ-আচ্ছাদনের ফাঁকে ফাঁকে রোহিণীর অরুণবর্ণ মুখখানির যতোটুকু দেখা যাচ্ছিলো, সেইটুকুই দেখতে লাগলাম। সে আবার বলতে শুরু করলো —আমি এই বর্ম জোগাড় করে নিলাম, অস্ত্র তো সংগ্রহ করাই ছিলো। রোহিতের বা[illegible]া, ক্ষুদ্ররোহিতের ওপর চড়ে সেই রাত্রেই আমি মহাসিন্ধুর তটে এসে পৌঁছালাম। পাহাড়ের অন্তরালে তোমাদের ঘোড়াগুলোর মধ্যে আমার ঘোড়াকেও আমি ছেড়ে দিলাম। সেই সময় সংগ্রামের ধ্বনি শুনতে পেলাম —সেই হৈচৈ-য়ের মধ্যেও তোমার সুগম্ভীর স্বর চিনতে আমার দেরী হলো না। আমি দৌড়ে গেলাম, কিন্তু তখন তোমার স্বর আর শুনতে পেলাম না। তটের উপরিভাগে দাঁড়িয়ে তখন প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে আমি সৈন্যদের যুদ্ধ দেখতে লাগলাম। নীচে জলে ভাসমান নৌকাগুলোও আমার চোখে পড়লো। সেই সময় দুই সেনানায়ককে পরস্পর আঘাত করতে দেখলাম। আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই তোমাকে পার্শবী সৈন্যরা ঘিরে ফেললো। নিজের অস্ত্র-শস্ত্র সামলে নিয়ে যুযুধান সৈন্যদল ভেদ করে নীচের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমি যখন গিয়ে পৌঁছালাম, তখন তুমি অচৈতন্য পার্শব সেনাপতির পাশে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লে। আমি তোমাকে আঘাত করতে উদ্যত পার্শবী সৈন্যের ওপর দ্রুত অস্ত্র-চালনা শুরু করলাম —এদিকে আমাদের সৈন্যরাও তখনি সেখানে এসে পড়লো।

পার্শবরা শুধু এখানে নয়, অন্য সব জায়গাতেই পরাস্ত হয়েছে। কেবল এক জায়গায় তারা সিন্ধু পার হয়ে কিছুটা ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু মদ্র-বীরেরা সেখানে তাদের প্রচুর সংখ্যায় হত আর আহত করে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, পার্শব শাসকের এই অভিযান খুব বিস্তৃত রকমের ছিলো, আর তা

পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছে। তাদের খুব কম সৈনিকই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে। তাদের প্রধান সেনাপতি মজুদ্দাত তোমারই গদাঘাতে আহত হয়ে আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আমাদের সৈন্যরা মহাসিন্ধু পার হয়ে এখন পুষ্কলাবতীতে [চারসদ্দা] শত্রুর অবশিষ্ট সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। কুভা [কাবুল] আর সুবাস্তুর [স্বাত] তীরবর্তী বন্ধুরা এ যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করছেন। প্রধান সেনাপতি প্রিয়মেধ আজ সকালে এসে তোমাকে দেখে গেছেন। তিনি বলছিলেন --তক্ষশীলা চিরদিন বৈশালীর কাছে ঋণী রইলো। তক্ষশীলাতেও পত্র পাঠানো হয়েছে। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে কপিল একটা প্রচণ্ড আঘাতে আহত হয়েছে।

'তক্ষশীলা বৈশালীর কাছে চিরদিন ঋণী থাকবে'---এই কথাটি বহুক্ষণ ধরে আমার কানে গুঞ্জিত হতে লাগলো। আমি ষাট যোজন দূরে থেকেও বৈশালীর জন্যে কিছু করতে পেরেছি, এই গর্ব আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অনুভব করতে লাগলাম। মনে হলো, আমার আঘাতের সবচেয়ে বড়ো ওষুধই হচ্ছে এই। তারপর আমার ওপর ঝুঁকে পড়া মুখখানির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, ভয়ে ভয়ে বললাম -- রোহিণী, বেশী কথা আমি বলবো না। কিন্তু যদি কোনো দরকার না থাকে, তবে তোমার শিরস্ত্রাণটা এবার খুলে ফেলো।

রোহিণী শিরস্ত্রাণ খুলে রাখলো। তার মুখখানি দেখেই বুঝতে পারলাম, আমার অবস্থা দেখে সে খুশী হয়েছে। ভাবছিলাম রোহিণীর কোমল শরীরে কি দুর্বার সাহস। এমন নারী থাকলে কোনো জনপদকেই কেউ পরাধীন করতে পারে না।

রোহিণী এক চষক [পাত্র] কাপিশেয়ী সুরা আমার ওষ্ঠে ধরলো। তার হাতে এই সুরা আরো মধুর লাগলো। রোহিণীর চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কতো চিন্তার তরঙ্গ যে মনে ভেসে উঠতে লাগলো, তার ঠিক নেই। ধীরে ধীরে চোখের পাতাও ভারী হয়ে এলো। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার দেহে, বিশেষ করে কোমরের নীচে অনেকগুলো গভীর ক্ষত। সেই ক্ষতগুলি ওষুধ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। একটু নড়াচড়া করলেই অসহ্য যন্ত্রণা হতো। এই অবস্থায় তক্ষশীলায় নিয়ে যাওয়া বড়ো বিপজ্জনক, তাই কাছেই সীমাপালের বাসভবনে আমাকে রাখা হলো। সেখানে কতোদিন থাকতে হয়েছিলো, কতো কষ্ট পেয়েছিলাম কিছুই আর স্মরণ নেই। শুধু রোহিণীর সদাহাস্যভরা মুখখানি আর তার হাত থেকে আমার মুখে ঢালা রক্তিম সুরার কথাই স্মরণ আছে। মানুষের স্বভাবই এই। সে আগুনের মধ্যেও শীতল স্থান খুঁজে নেয়, কটুত্বের মধ্যেও স্বাদুতা সৃষ্টি করে। আমি মৃত্যুমুখ থেকে সদ্য ফিরে এসেছি, সারা শরীর ক্ষতে ভরা

—তবে ক্রমেই আরোগ্যলাভ করছিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো, আমি এমনি করেই রোগশয্যায় পড়ে থাকি আর রোহিণী এমনি করেই আমার পাশে বসে থাক।

এক সপ্তাহের মধ্যেই আচার্য আমাকে দেখতে এলেন এবং তিন সপ্তাহ পরে শিবিকারোহণে আমি তক্ষশীলা যাত্রা করলাম। রোহিণী আর কাপ্য অশ্বারোহণে সঙ্গে সঙ্গে চললো।

গৃহদ্বারে মা [আচার্য-পত্নী] সাদর সম্ভাষণ জানালেন। যখন তিনি আমার ললাট চুম্বন করছিলেন, তখন দেখলাম তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল। তিনি শুধু বললেন —বীর পুত্র। স্বাগত।

আট

উত্তর কুরুতে যুদ্ধ

আমার ক্ষত সম্পূর্ণ সারতে তিন মাস কেটে গেলো। কপিল নামে তক্ষশীলার অপর এক তরুণ নিজের জীবন বিপন্ন করে রোহিণীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলো। তার সঙ্গে এখন আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বৈশালীর অপর পাঁচ জন তরুণ বন্ধু শুধু অক্ষত দেহেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেনি, নিজেদের সেনানায়কের প্রশংসা অর্জনও করেছে—এ কথা শুনে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। রোহিণীর কথা বাদ দিলে রোগশয্যায় শয্যাশায়ী থাকার সময় এই ক'মাস আর যারা আমার কাছে নিরন্তর আসতো, তাদের মধ্যে কপিলই প্রধান। কপিলের সঙ্গে কথা বলে খুবই আনন্দ পেতাম। তার অভিজ্ঞতা শুধু কানে শোনার ওপর নির্ভরশীল নয়—সে বহুদর্শীও বটে। কপিশা [কোহ-দামন, আফগানিস্তান], উত্তর কুরু [বক্ষু নদীর উপরিস্থিত প্রদেশ], পশ্চিম মদ্র [পশ্চিমী ইরাণ], ববেরু [ব্যাবিলন] ইত্যাদি দেশে সে গিয়েছে এবং সার্থের সঙ্গে অনেক সংকটপূর্ণ পথ পার হয়েছে।

একদিন আমি কপিলকে জিজ্ঞাসা করলাম—এইসব দেশের মধ্যে তোমার কোনটাকে সমৃদ্ধ আর সুশাসিত বলে মনে হয় ?

—তক্ষশীলার কথা বাদ দিয়ে তাহলে বিচার করতে হবে বন্ধু। কারণ তক্ষশীলার মতো এমন সুশাসন আর কোথাও আমি দেখিনি। আমাদের গণ-এর মধ্যে চোর কিংবা কাপুরুষ একটিও দেখা যায় না ; আর ঐসব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুই-ই দেখতে পাবে। তবে উত্তর কুরুর নর-নারীরা এখনো বীর, এখনো খুব উদার। পার্শবরা তাদের পরাধীন করার অনেক চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কুরুর পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের মতো মানুষের জীবন থাকতে পরাধীনতা অসম্ভব ব্যাপার।

—আর সম্পত্তি, সমৃদ্ধি ?

যদি সম্পত্তি বা সমৃদ্ধি বলতে 'জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন সব জিনিসের সহজলভ্য হওয়া' বোঝায়, তবে উত্তর কুরু অতি সম্পন্ন, অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। ওখানে লোকে পশুপালন আর মৃগয়ার ওপরই বেশী নির্ভর করে। চাষ-বাসের প্রচলন খুব কম। উত্তর কুরুর পর্বতে অকৃষ্টপচ্য [স্বয়ং

উৎপন্ন] গম আর দ্রাক্ষালতা জন্মায়। কাপিশেয়ী দ্রাক্ষার মতো সে দ্রাক্ষা অতো বড়ো বা অতোটা মিষ্টি না হলেও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। চামড়ার পোষাকই লোকে পরে—গাই, ভেড়া আর ঘোড়ার মাংস খায়।

—সাধারণ খাদ্য হিসেবে ঘোড়ার মাংস?

-হ্যাঁ, গাইয়ের চেয়ে বেশী। ওরা ঘোড়ার মাংস যেমন বেশী খায়, ঘোড়া পালনও করে তেমনি। আমাদের এখানে যে ঘোড়ার মাংস খাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘোড়ার মহার্ঘতাই তার কারণ। বসন্তারম্ভের দিনে তো তুমি ওই মাংস নিশ্চয়ই চেখেছো?

—হ্যাঁ, চেখেছি বৈকি! কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমাদের প্রাচীতে তো একমাত্র যজ্ঞের ঘোড়ার মাংসই খাওয়া হয়। আর সেই যজ্ঞের খরচ এতো বেশী যে কোনো কোনো রাজাই শুধু তা করে থাকেন। আমরা গণ-এর লোকেরা পারি না।

—উত্তর কুরুর আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বন্ধু। ওখানে 'আমি' বা 'আমার' কিছু নেই।

—লোভ নেই?

—না, লোভ নেই, যেহেতু লোভের কোনো কারণই নেই। যেখানে রাজতন্ত্র, সেখানে রাজার আজ্ঞায় সমস্ত জনপদকে চলতে হয়। পার্শব শাসানুশাসের [রাজাধিরাজ] আদেশ যবন-সমুদ্র থেকে মহাসিন্ধুর তট পর্যন্ত অলঙ্ঘনীয়। আমরা গণতন্ত্রীরা কোনো একজন লোককে নিজেদের প্রভু বলে স্বীকার করতে রাজী নই এ কথা অবশ্য ঠিক, কিন্তু এখানেও কারো বেশী কর্মান্ত [ক্ষেত] আছে, কারো কম; কারো অসংখ্য পশু, কারো খুব অল্পই আছে। আমরা বাণিজ্য করেও নিজেদের সম্পত্তি বাড়াতে পারি। কিন্তু উত্তর কুরুতে এই অসম অবস্থা কল্পনাতীত।

—কল্পনাতীত? কেন, ওখানে কি একজন গৃহস্থ অন্য কোনো গৃহস্থের চেয়ে বেশী ধন রাখতে পারে না?

—কারো আলাদা আলাদা কোনো ধনসম্পদ নেই। উত্তর কুরুর লোকদের সব কিছু সম্মিলিত সম্পত্তি। তাদের প্রধান সম্পদ হলো পালিত বা মৃগয়ার পশু। তাতে সকলেরই শ্রম আর ভোগের অধিকার সমান।

—এর অর্থ কি এই যে, অলস আর পরিশ্রমী দু'জনেরই ভোগের অধিকার সমান? তা যদি হয়, তবে তো সমাজে আলস্যের কুপ্রভাব দেখা যাবে।

—না মিত্র। তাদের মনোবৃত্তিটাই এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, সামর্থ্য থাকতে কেউ কাজে এতোটুকু অবহেলা করে না। আমাদের এখানে খাওয়ার পর হাত ধোয়ার নিয়ম আছে। আমার মনে হয়, তোমাদের ওখানেও তাই।

—তা তো আছেই, বরং এখানের চেয়ে কিছু বেশী। কারণ সেখানে চামড়ার কঞ্চুক পরার মতো শীত কখনো পড়ে না।

—তাহলে বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো খাওয়ার পরে হাত ধোয়ার কাজে কেউ ফাঁকি দেয় না। কিন্তু এ প্রথা সব দেশে নেই। কম্বোজে [কাফিরস্তান] লোক হাত ধোয়ার দরকার মনে করে না। সেখানে খাবার পর কঞ্চুকে হাত মুছে ফেলে।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে, শৈশব থেকেই যদি এইরকম মনোভাব গড়ে তোলা যায়, তবে কোনো কাজেই কারো ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি থাকবে না।

—হ্যাঁ, যদি ক্ষমতা অনুসারে কারো কাছে কাজের আশা করা যায়, আর অলস লোককে সকলে ঘৃণা করে।

—তা তো বটেই। বিশেষ করে উত্তর কুরুর লোকদের যখন তুমি স্বচক্ষে দেখে এসেছো, তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কিন্তু তবুও তাদের অদ্ভুত লোক বলে আমার মনে হচ্ছে।

—শুধু অদ্ভুত! প্রথমে নিজের চোখকেই আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। উত্তর কুরুর সীমার মধ্যে পৌঁছানোই তো একটা মুশকিলের কথা।

—কেন?

—তারা বাইরের লোককে নিজেদের দেশে আসতে দেয় না। মনে করে, বহিরাগতরা তাদের দেশের মাটি, তাদের দেশের বাতাস কলুষিত করে দেবে। উত্তর কুরুতে প্রবেশের পথ খুব দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল। সেই পথে তারা দিবারাত্র পাহারা দেয়। লুকিয়ে কেউ প্রবেশ করলে মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি।

—তবে তুমি কি করে প্রবেশ করলে?

—নেহাৎ সৌভাগ্য বলতে পারো। পার্শবরা যখন পশ্চিম গান্ধার-গণ জয় করে তাকে পরাধীন করলো, তখন থেকেই সারা গান্ধারের প্রতিটি লোকের হৃদয়েই পার্শবদের প্রতি ঘৃণার আগুন অনির্বাণ জ্বলছে। আমি ব্যবসায়ীদের সার্থের সঙ্গে বক্ষু নদীর তটে গিয়েছিলাম। সেই সময় শুনলাম, বাহ্লিকের ক্ষত্রপ [শাসনকর্তা] উত্তর কুরু আক্রমণ করতে চায়। আমি উত্তর কুরু সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, তা একেবারেই বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যা শুনেছিলাম—সেটা প্রশংসারই কথা। উত্তর কুরুতে না-কি দেবতারা বাস করেন। পৃথিবীতে এখন এইটাই একমাত্র স্থান, যেখানে দেবতারা স্বমূর্তিতে বিরাজ করেন। তাঁরা উড়তে পারেন। তাঁদের দেশের পাঁচ যোজন পর্যন্ত এমন যাদু আছে যে, সেখানে গেলেই মানুষ গাছ হয়ে যায়। তুমি তো বুঝতেই পারছো মিত্র, এইসব কথায় বিশ্বাস করবার মতো ছেলে আমি নই।

কিন্তু আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কিছু আসে-যায় না। নীচ পার্শবরা একের পর এক স্বাধীন জন-কে [দেশ বা জনপদ] পরাধীন করে চলেছে, এটা তো দেখেছিলাম। মনে করলাম, উত্তর কুরুকে সাহায্য করে গান্ধারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। আমি দুটি তূণ ভরে তীক্ষ্ণ তীর আর বেশ কিছু ফলও আলাদা বেঁধে নিলাম। এ কথা জানতাম যে, বক্ষু নদীর [আমু] তটভূমি মুঞ্জগাছের জঙ্গলে ভরা। খড়্গ, শল্য প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে, একটা শুকনো বাছুর কাঁধে ঝুলিয়ে আমি কম্বোজের একটা ভালো ঘোড়ায় চেপে বসলাম এবং বক্ষুতট থেকে উপরিভাগে রওনা হলাম।

—একা ?

—হ্যাঁ, একাই। আর খড়্গ ছাড়া আমার সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রই লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—অজ্ঞাত স্থানে এভাবে যাত্রা খুব সাহসের কথা।

—নির্বুদ্ধিতাও বটে। আমিও এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু মানুষ জীবনে এমন কতো নির্বুদ্ধিতার কাজই করে বসে। তুমিও তো সেদিন শত্রুসেনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মজ্‌দ্‌দাতকে আক্রমণ করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করোনি।

—হ্যাঁ, আমি এ কথা স্বীকার করি। আমি জানি, সেনানায়ককে সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কিন্তু সে সময় আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

—তাহলেই বোঝো। আর সেই সঙ্গে ভাবো যে, আমি সেনা-সঞ্চালকও [সেনাপতি] ছিলাম না। আমি ছিলাম বড়জোর সার্থের ছ' জন মুখ্য ব্যক্তির একজন মাত্র—যারা সকলে একসঙ্গে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে। অজ্ঞাত জায়গা নিশ্চয়ই—কিন্তু এটুকু জানতাম যে, বক্ষুর উপরিভাগে মুঞ্জবান পাহাড়ের কাছে ঘুমন্তু জাতির পশুপালকরা থাকে। তারা উত্তর কুরুর দেবতাদের দর্শন পায়। আমি কতোবার বাহ্লিক দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে কাদলী হরিণের নরম আর চক্‌চকে চামড়া দেখেছি। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, সেই চামড়া মুঞ্জবান পর্বতের কাছ থেকে আসে। সেখানে বাস করে এই ঘুমন্তু জাতি। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, সেই জাতির একজন লোকের দেখা পেলাম। সেও ঐ দেবতাদের কথা বলতে লাগলো। কিন্তু যখন বাছুরের কোমল মাংস খেতে আর উদুম্বর-বর্ণ কাপিশেয়ী সুরা পান করতে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালাম, তার কিছুক্ষণ পরেই আমরা দু'জনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। তারপর সেই লোকটি জানালো —এই চর্ম আসে উত্তর কুরু থেকে। ওরা তাদের লোহা দেয়, বিনিময়ে তারাও কাদলী হরিণের চামড়া দেয়। লোহা ছাড়া তারা আর কোনো জিনিসই নেয় না।

—তাহলে তখনি তোমার বিশ্বাস হয়েছিলো যে, উত্তর কুরুতে দেবতা নয়, মানুষই বাস করে ?

—নিশ্চয়, সিংহ। দেবতাদের আবার মানুষের সাহায্যের দরকার কি ? আমি সেই মৌঞ্জদেশীয় ঘুমন্তুদের বাসস্থানের দিক দিয়েই চলতে লাগলাম। ক্ষত্রপের সৈন্য অন্য পথ ধরে আসছিলো। কিন্তু আমি বরাবর তাদের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। সংক্ষেপেই কথাটা সারি—পার্শব সৈন্যরা পাহাড়ে পৌঁছে গেলো। সেদিন মৌঞ্জদের এক গোষ্ঠে [গোচারণ ভূমি] আমি বিশ্রাম করছিলাম। কিন্তু পার্শব সৈন্য সেই গোষ্ঠের স্ত্রীলোকদের বলাৎকার করতে উদ্যত হয়েছিলো। পার্শব শাহানশাহের এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের উন্মত্ততার মধ্যে যারা পরদেশে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সেইসব সৈন্যদের কখনও কোনো আদেশ দিয়ে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি সেদিন তক্ষশীলার তরবারির শক্তি দেখিয়ে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করেছিলাম। মৌঞ্জবতরা আমার ওপর খুব খুশী হলো এবং বিশ্বাসও স্থাপন করলো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি পশুগুলিকে নদীর ওপারে নিয়ে গেলাম এবং রাতারাতি অনেক যোজন দূরে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। এবার আমি তাদের বললাম যে, পার্শবদের আমি কতো ঘৃণা করি। তাদের বিরুদ্ধে আমি উত্তর কুরুকে সাহায্য করতে চাই। আমার এ কথায় তারা তো প্রথমে আবার সেই দেবতাদের গাল-গল্প বলতে শুরু করলো। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলো যে সত্যি কথার কিছুটা অন্তত আমি জানি, তখন তারা আমার হিতৈষী হিসেবেই বললো—উত্তর কুরুর লোকরা তোমাকে দেখলেই মেরে ফেলবে। আমি মৃত্যুকে উপহাস করে বললাম—মৃত্যু জিনিসটা মন্দ নয়। কিন্তু অন্তত পাঁচ জন পার্শবকে না মেরে মরবো না। তখন তারা আমাকে বক্ষুর বাম তটে যেখানে লোহার সঙ্গে কাদলী মৃগচর্ম বিনিময় করতো, সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজী হলো।

—তাহলে বয়স্য, তুমি দেবতাদের দেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে ?

—সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসও আমার হৃদয় থেকে মুছে যেতে লাগলো। কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়েই যাওয়া যায়। তারপর ভেড়ার ওপর আমার জিনিসপত্র চাপিয়ে হেঁটেই যেতে হলো। যেখানে ভেড়ার যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে মানুষের যাওয়াও অসম্ভব। মৌঞ্জবতরাও আমাদেরই মতো গৌরবর্ণ আর বলিষ্ঠ—তবে স্নানাদির বড়ো একটা চল নেই ওদের মধ্যে। আমরা এক সপ্তাহ ধরে বক্ষুর উপরিভাগে কোনো এক শাখা-নদী পার হলাম। এখানে বক্ষুর প্রসার খুব বেশী নয়, কিন্তু স্রোত খুব প্রবল। দু'দিক থেকে দুটো পাহাড়ী টিলা এসে মিলেছে বলে মনে হয় —তার মধ্যে ডান দিকেরটা বেশী উঁচু। পথ-প্রদর্শক বললো—ব্যস,

এই পর্যন্তই আমি চিনি। কুরুর লোকরা এই টিলার ওপর কাঠ রেখে এপারে এসে লৌহ বিনিময় করে নিয়ে যায়। এই টিলার ওপারে গিয়ে পড়লে ওদের হাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

—আমি দেখেছিলাম, পার্শবরা বক্ষুর দক্ষিণ তটে এখনো বহুদূরে আছে। এবার আমার প্রাথমিক কর্তব্য স্থির করতে হবে। বিদায় নেবার সময় মৌঞ্জবত পথ-প্রদর্শক আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, যেন আমি আগুন না জ্বালাই—নাহলে ধোঁয়া দেখেই দেবতারা তাদের কোপাগ্নিতে আমাকে দগ্ধ করবে। শুকনো মাংস আমার কাছে প্রচুর ছিলো, জঙ্গলের মধ্যে পক্ক দ্রাক্ষাগুচ্ছও ঝুলছে—সুতরাং আমার অনাহারে মরার কোনো ভয় ছিলো না।

—পরদিন আমি কিছুটা পিছু হটে একটা টিলার আড়ালে বসে ওপারের দিকে চেয়েছিলাম। এমন সময় কিছু নড়তে-চড়তে দেখা গেলো, লক্ষ্য করতেই বোঝা গেলো—হ্যাঁ, মানুষই তো, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই আছে। তাদের দেহে সবুজ রঙের চামড়ার পোষাক, যা পার্বত্য সবুজ রঙের গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়। তাদের মাথায় কানটুপি আর দেহে চামড়ার চাদর এমনভাবে বাঁধা যে, ডান হাত একেবারে খোলা [ঠিক পৈতার মতো]। তাদের বাঁ কাঁধে তেমনি সবুজ তূণ আর হাতে ধনুক ছিলো। পায়ে জুতোও আছে। বেশ বুঝতে পারলাম—এরাই উত্তর কুরুর দেব-দেবী। এদের পক্ষ হয়েই আমি পার্শবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। আমি তাদের সজাগ কানগুলি লক্ষ্য করছিলাম, আর দেখছিলাম যে, তারা নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে কেমন করে গন্ধ শুঁকছে। সত্যি বলছি ভাই সিংহ, তখন আমার বড্ড ভয় করছিলো। আমার মানুষী-গন্ধ কি ওদের নাকে লাগছে না-কি? আমি আরো নিশ্চল হয়ে টিলার ধারে পড়ে রইলাম এবং ঠিক পিঁপড়ের সারের মতো তাদের নীচের দিকে যেতে দেখলাম।

—এবার আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, ওদের প্রথম ঘাঁটি আরো নীচের দিকে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে আমি নিজের হাতিয়ার আর মাংসের টুকরো নিয়ে নীচের দিকে চললাম—চললাম না বলে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম বললেই বোধ হয় ঠিক হবে। কতোক্ষণ পরে যে এক যোজন নীচে সেই জায়গায় পৌঁছালাম, জানি না। এখানে বক্ষুর ধারা সগর্জনে ছুটে চলেছে, আর তার তীরেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক সুউচ্চ পাহাড়। এরই পেছনে দেবরা আগুন জ্বালিয়ে মাংস ঝলসে নিচ্ছে। তার সুগন্ধ আমারও নাসারন্ধ্রে পৌঁছে জিহ্বা সজল করে তুলছিলো। মৌঞ্জবতদের গ্রাম ছেড়ে আসার পর এই প্রথম আগুন দেখতে পেলাম।

—আমি শুকনো মাংস খানিকটা খেয়ে নিয়ে সঙ্গের চর্মনির্মিত থলি

থেকে জল পান করলাম। তারপর একপাশে একটু আড়াল মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে ভোরের প্রতীক্ষায় শুয়ে রইলাম।

—ভোরের আগে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই আবার সারা দিনের মতো নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ঝোলা থেকে খানিকটা মাংস নিয়ে খাওয়াটা সারলাম। তারপর পাহাড়ের পেছনে যেখানে কাল দেবদের আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম, সেইদিকে চেয়ে রইলাম। প্রভাতের আলো ফুটে উঠতেই দেখতে পেলাম, কতকগুলি সবুজ বসন পরা মূর্তি সেই উঁচু পাহাড়ের মধ্যদেশ থেকে টিক-টিকির মতো হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে গেলো। তারা তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তাও কিছু কিছু বলছিলো, কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে সে কথা এতোটা দূরে আমার কানে আসছিলো না। দিবালোক স্পষ্টতর হলে দেব-দেবীদের মূর্তিও স্পষ্টই দেখতে পেলাম। তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হলো —তারা রীতিমতো ভীতিগ্রস্ত।

—দুপুরবেলা পার্শব সৈন্যবাহিনীকে দূর থেকেই দেখতে পেলাম। পথ এমন সংকীর্ণ যে, সেখান দিয়ে একাধিক লোক পাশাপাশি যেতে পারে না। তাদের সেই পার্বত্য পথের কাছে পেঁছাতে দেখে আমার হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, তাদের মধ্যে একজন পায়ের জুতো খুলে ফেলে খড়্গ কোষবন্ধ করে ঢালু পথে ত্বরণ শুরু করলো। দেবগণ তার পদশব্দ শুনেই নিজেদের খড়্গ আর ধনু নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম, পাহাড়ের যে সংকীর্ণ অংশে বিপক্ষের সেনারা রয়েছে, সেখানটা এমন তেরছা যে সামনের শিলাখণ্ড পার না হওয়া পর্যন্ত দেবতারা তাদের দেখতে পাবে না। কাজেই বিপদের পরিমাণটা আমি যতোটা অনুভব করতে পারছিলাম, দেবতারা ততোটা পারছিলো না। পার্বত্য পথের খানিকটা এমন ছিলো যে, খুব ধীর গতিতে সে জায়গাটা পার হতে হয়। নাহলে বাকী পথটুকু দৌড়েই পার হওয়া যায়। বাধাদানকারী দেব-দেবীর সংখ্যা দু'শোর বেশী নয় —এদিকে দু'হাজারেরও বেশী পার্শব সৈন্য আমার সামনে। ভাবলাম —যদি এখানে বিনা বাধায় পার্শবরা পার হতে পারে, তাহলে কেবল নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জোরেই দেবতাদের জয় করতে পারবে।

—ঘন গুল্মের মধ্যে বসে আমি আমার ধনুক তুলে নিলাম এবং যেখানে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়, সেই সংকীর্ণ ঢালু জায়গাটির ওপর লক্ষ্য রাখলাম। যেই কোনো পার্শব ওখানে পেঁছায়, অমনি আমার অব্যর্থ লক্ষ্য তীরে বিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে বক্ষুর জলস্রোতে স্থানলাভ করে। পার্শবদের কেউ সেই কোণের কাছে পেঁছালেই আমি তীর ছুঁড়ছিলাম। আর সেই জায়গায় পর্বতের নিম্নভাগ এমন ছিলো যে, নীচে পড়ার সময় কেবল আমি আর দেবরা ব্যতীত আর কারো পক্ষে সেই পতনশীল সৈন্যকে দেখা সম্ভব ছিলো

না। কয়েক ঘণ্টা ধরে একের পর এক পার্শ্ব সৈন্য আপতিত হতে লাগলো, কিন্তু তবু তাদের কোনো সন্দেহই হলো না। এদিকে দেবতারাও এভাবে পার্শ্ব সৈন্যের পতনের রহস্য ভেদ করতে না পেরে খুবই বিস্মিত হলো। শেষে যিনি সর্বপ্রথম এ রহস্য সমাধান করলেন, তিনিও একজন দেব। আমার আত্মগোপনের স্থান সেই গুল্মের দিকে চেয়ে থাকা তাঁর চোখ দুটিতে ক্রোধ নয়, স্নেহ ঝরে পড়ছে দেখে আমার মনটাও প্রসন্ন হয়ে উঠলো। দেবতারা অন্তত আমাকে তাদের সহায়ক বলে মনে করেছে, এ কথা ভেবে খুশীই হলাম।

—বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পার্শ্বরা নীচে থেকেই জানতে পারলো যে, প্রায় পঞ্চাশ জন পার্শ্ব বীরের মৃতদেহ বক্ষুর স্রোতে নীচের দিকে ভেসে চলেছে। কিন্তু তখনো তারা এটা আমারই তীরের অব্যর্থ লক্ষ্যের ফল বলে জানতে পারেনি। বরং মনে করেছে, এটা দেবতাদেরই কাজ। তাই এবার সেনানায়ক সৈন্যদের ধীরে ধীরে সেই ঢালু জায়গাটা একে একে পার হওয়ার পরিবর্তে দৌড়ে পার হবার আদেশ দিলেন। এর ফল হলো দুটি—প্রথমত, অর্ধেক লোক পা পিছলে বক্ষুর মধ্যে পড়তে লাগলো। দ্বিতীয়ত, যারা ছুটে সেই জায়গাটা পার হতে লাগলো তাদের সকলকে আমি আর তীরবিদ্ধ করতে পারলাম না। তবে তাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে দেব-দেবীরা সেখানে প্রস্তুত আছে। এখন আমি বাছা বাছা সৈনিকদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। অবশিষ্টদের সঙ্গে দেবতারা যুদ্ধ করতে লাগলো। সন্ধ্যা সমাগম হতে-হতেই বেশ বুঝতে পারলাম, এতোগুলি সৈন্যের মৃত্যুর পরও পার্শ্বদের সংখ্যা দেবতাদের চেয়ে এখনো অনেক বেশী। আর এই ঘাঁটি থেকে লড়াই করা যাবে না।

—অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমি নিজের জায়গা ছেড়ে ওপরের দিকের পথ ধরলাম। দেবতারাও স্থান ত্যাগ করলো। পার্শ্বরা যদিও ঘাঁটিটা অধিকার করেছিলো, কিন্তু অন্ধকারে তাদের সাহায্যের জন্যে আরো সৈন্য আমদানী করা সম্ভব ছিলো না। তাই তারা আর দেবগণের পশ্চাদ্ধাবন করলো না।

—আমি আবার সেই দুই টিলার মধ্যবর্তী বক্ষুর সঙ্কীর্ণ ধারার কাছে পৌঁছালাম। এমন সময় হঠাৎ একটা টিলার আড়াল থেকে একজন লোককে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ভয় পেলাম। ভাবলাম, এবার দেব-দণ্ড আমার ওপর পড়বে। কিন্তু সেই লোকটি আমার কাঁধে হাত রেখে বললো—মানব! ভয় পেয়ো না। দেবগণ তোমাকে মিত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

—আমি একে আমার পরম ভাগ্য বলেই মনে করি। নীচ পার্শ্ব দেবলোকের বিরুদ্ধে অভিযান করছে দেখে দেবগণের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই

এখানে যাত্রা করেছিলাম। তবু আমার এখনো পর্যন্ত সন্দেহ ছিলো —আমি হয়তো দেবতাদের কোনো উপকারে আসার পরিবর্তে তাদের হাতেই মারা যাবো।

—হ্যাঁ, আমরা দেবতারা কাউকে আমাদের ভূমিতে আসতে দিই না। মানুষরা এসে আমাদের দেবভূমিতে নিজেদের সমস্ত কলুষ ছড়িয়ে দেবে, এইজন্যে আমরা কোনো জীবিত মানুষকে দেবভূমিতে পা রাখতে দিই না। কিন্তু তুমি নিজের আচরণে নিজেকে দেবতাদের মিত্র বলে প্রমাণ করেছো। তাই আমি তোমাকে দেবভূমিতে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

—জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকটি নিজেকে দেবতাদের সেনাপতি বলে পরিচয় দিলেন। নাম তাঁর মঘবান্ [ইন্দ্র]। মঘবানকে আমি বললাম —পার্শব সৈন্যের সংখ্যা অনেক। তাদের খুব অল্পই এখনো পর্যন্ত এখানে পৌঁছেছে। ইন্দ্র গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন —আমাদের প্রথম ঘাঁটি খুব শক্তিশালী নয়। এর পরের ঘাঁটিগুলো একের পর আর ক্রমশই বেশী শক্তিশালী। আমরা তো পার্শবদের শুধু যুদ্ধে হারাতে চাই না, আমরা চাই যেন তাদের একজন সৈন্যও জীবন নিয়ে ফিরতে না পারে। শুধু পার্শব কেন, মানবদের কারো সম্বন্ধেই আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। দেবভূমি ছেড়ে যাওয়া কারো পক্ষেই ক্ষমার্হ নয়। তাই আমরা চাই, তুমি এ বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শন করো।

—ইন্দ্রের ভাষা আমার কাছে এক অপূর্ব মিষ্টতায় ভরা বলে মনে হলো। তক্ষশীলার ভাষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও এ ভাষায় শব্দের সংখ্যা অল্প। শব্দের উচ্চারণেও পার্থক্য আছে। মনে হচ্ছিলো, উচ্চারণে যেন সঙ্গীতের সুর মিশ্রিত আছে। দেবভাষা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। হয়তো তার কারণ এই যে, আমি অনেক রকম আর্য-ভাষাই জানি। আমি ইন্দ্রকে বললাম, যদি তখন তাঁর অন্য কাজ না থাকে, তবে শত্রুর সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারি। ইন্দ্র এই কাজকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বললেন। দেখলাম, বেশভূষায় খুব সাদাসিধে হলেও ইন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি খুব তীক্ষ্ণ। তিনি বললেন —আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে আমরা সেই জায়গাতেই ঘাঁটি করেছি যেখানে বন্ধুর পার্বত্য পথ খুব সঙ্কীর্ণ, এবং মাত্র একজন করে লোক চলতে পারে। কিছু দূর অন্তর এমনি পথের ওপর থেকে পাথর গড়ানোর জায়গাও করে রেখেছি।

—অস্ত্র-শস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় খড়্গ, ধনুক, শল্য আর গদার কথা জানতে পারলাম। যদিও নীচে থেকে আনা লোহা দিয়ে দেবশিল্পীরা এইসব অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করেছে, কিন্তু সেগুলো বেশ ভালোই হয়েছে। সেই রাত্রেই আমরা সিদ্ধান্ত করলাম —কাকে কোথায় কিভাবে পার্শব সৈন্যের সঙ্গে যুঝতে হবে।

—সিংহ, যুদ্ধে কেমন করে পার্শব সেনা সংহার হলো সে কথা জানার চেয়ে তুমি বোধ হয় দেবভূমির সম্বন্ধেই বেশী করে জানতে চাও ?

—আমার কাছে সে কথাও কম আকর্ষণীয় নয় কপিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি নিজের বীরত্ব নিজে বর্ণনা করতে চাইছো না। বেশ, তোমার যা ইচ্ছা, তাই বলো।

—আসলে কথাটা কি জানো সিংহ, এই যুদ্ধে পার্শব সৈন্যকে ধ্বংস করা হলো কেমন করে, তা সহজেই বুঝতে পারছো। তার মধ্যে যদি বিশেষ কিছু জানবার কথা থাকে তো সে হলো যুদ্ধে দেবীদের অংশগ্রহণ। তারা সংখ্যায় দেবদের সমান-সমানই ছিলো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। উত্তর কুরুর লোকরা নিজেদের দেব বলে অভিহিত করে বটে, তবে তার পশ্চাতে কোনো অলৌকিক শক্তির কথা আদৌ মনে আনে না। ক'বছর তাদের মধ্যে থেকে আমিও দেখেছি, যদিও স্বাতন্ত্র্য তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় আর সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে বারবার যুদ্ধে রক্তস্নান করতে হয়েছে—কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, তারা স্বভাবে অতি কোমল, ব্যবহারে সম্পূর্ণ রূপে খাঁটি! শোক, চিন্তা, ভয় তাদের মনে বালির ওপর রেখার মতো বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

—দেব-দেবী বলে তাদের মনে কি কোনো গর্ব আছে - যেমন আমরা এই শব্দের সঙ্গে জড়িত আছে বলে ভাবি ?

—না সিংহ। এটাকে তারা কেবল জাতিবাচক শব্দ বলেই মনে করে।

—বটে। তারপর যুদ্ধশেষে তাদের মনোভাব আর দেবভূমির অবস্থা কি হলো ?

—যুদ্ধে দেবগণ তাদের প্রত্যেকটি শত্রুকে ধ্বংস করেছিলো। আমি আমার সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু যেদিন দ্বিপ্রহরে এই নর-সংহার শেষ হলো, সেইদিনই বক্ষুর শীতল জলে নিজেদের দেহ আর চর্মের পরিধেয় ধুয়ে ফেললো। তাদের গাত্রবর্ণের কথা কি বলবো—তার উপমা কেবল আমাদের রোহিণী কিছুটা হতে পারে। তাদের কেশ আরো পিঙ্গল, চক্ষু আরো নীল, আকারে স্ত্রী-পুরুষ আমাদের চেয়ে আরো দীর্ঘ। দেবতারা ক্ষৌরকার্য কাকে বলে জানে না। আমি এইটুকু বুঝেছিলাম যে, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা খুব অল্প দিন লৌহ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। হাড়ের অস্ত্র-শস্ত্র তারা এখনো ব্যবহার করে।

—আর পরিধেয় ?

—পোষাক-পরিচ্ছদের কথা তো আগেই বলেছি। তারা কেবল চামড়ার পোষাকই পরে থাকে। তাও কঞ্চুক নয়—চাদরের মতো। গ্রীষ্মকালে দেব-দেবীরা নিজেদের দেহে কোনোরকম পোষাক-পরিচ্ছদ রাখে না। সে সময়

দেবতাদের চুল-দাড়ি আর দেবীদের সীমন্ত, প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে নির্গত জ্বালা-রশ্মির মতো মনে হয়। আর সৌন্দর্য? সে শুধু দেবকন্যারই বিশেষত্ব, মানুষের মধ্যে তার উপমা পাওয়া যায় না। সেখানে সকলেই রোহিণী —এইটুকু বলে আমি হয়তো সেই সৌন্দর্যের কিছুটা বর্ণনা করতে পারি।

—যুদ্ধজয়ের দিন সন্ধ্যা হবার আগে থেকে দলে দলে দেবকুমার আর দেবকন্যারা মধু, ক্ষীর আর মৃগ-মাংস নিয়ে পর্বতপৃষ্ঠে এক বিস্তৃত ময়দানে একত্র হতে লাগলো। একপাশে কাঠের আগুনে মাংস ঝলসানো হতে লাগলো। দেবগণ আগুনকে বড়ো যত্ন করে প্রজ্বলিত রাখে—নিভে গেলে দু'খানা কাঠকে পরস্পর ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালে। এক জায়গায় নরম চামড়া বিছিয়ে তার ওপর সবুজ সাম [সিদ্ধি] পাথর দিয়ে বাটা হচ্ছিলো। চারিদিকে দ্রাক্ষার জঙ্গল থাকলেও দেব-দেবীরা সুরা তৈরী করতে জানে না। আর যদি পাওয়া যায়ও, তাহলেও বোধ হয় দেব-দেবীরা সুরা পছন্দ করবে না। একদিকে তরুণ-তরুণীরা গান শুরু করে দিলো। কিন্তু অল্প আহার আর সোমপানের পর সে রাত্রে দেবগণের যে নৃত্য দেখেছিলাম, তা চিরস্মরণীয়। আমরা গান্ধারবাসীরা খুব নৃত্য-গীতপ্রিয় বলে মনে করা হয় —কিন্তু আমাদের স্থান দেবগণের পরে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ইন্দ্রের কৃপায় সেই নৃত্যমণ্ডলীর সকলেই আমার পরিচয় পেয়েছিলো। সুতরাং দেবকন্যারা আমাকে মাঝে রেখে মণ্ডলাকারে নাচছিলো। মাঝে মাঝে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলাম, তখন দেবকন্যারা মধু ও ক্ষীর-মিশ্রিত সোম-চষক নিয়ে আমাকে পান করাবার জন্যে সাগ্রহে এগিয়ে আসছিলো।

—আমি তো দেখলাম —সেই এক রাতের পর নৃত্য-গীত তাদের মন থেকে যুদ্ধের সমস্ত প্রভাব ধুয়ে-মুছে দিলো। পরদিন আর মনেই হচ্ছিলো না যে, তারা সদ্য-সমাপ্ত এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো —সে যুদ্ধে হাজার হাজার দেব-দেবী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার অন্য কারণও আছে।

—কি? হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা?

—না সিংহ, দেবতাদের নিষ্ঠুর হবার কোনো সুযোগই নেই। তারা জীবনভর কেবল জীবনটাকেই নিজের বলে মনে করে। সোম পান করে অমর হবার কথা একেবারে বাজে। অবশ্য সোমটা ওদের প্রিয় পানীয় বটে। আসলে দেবগণের অমর-আনন্দময় জীবনের রহস্য হলো —তারা ব্যক্তির অধিকারে নির্মম [মায়াশূন্য] এবং নিষ্পরিগ্রহ। এ কথার ইঙ্গিত আমি আগেই দিয়েছি। দেবগণের পৃথক পৃথক পরিবার নেই।

—তবে কি সমস্ত পরিবারগুলো একত্রে থাকে?

—না, তাদের মধ্যে পরিবারই নেই। অথবা বলতে পারো, সারা দেব-লোক একটি পরিবার।

—আর বিবাহাদি ?

—এ বিষয়ে তাদের প্রথা শুনে মানবরা নাসিকা কুঞ্চিত করবে। কিন্তু দেবভূমিকে যে নিজের চোখে দেখবে, তার কিছুই মন্দ বলে মনে হবে না। সেখানে প্রত্যেক দেবীই উন্মুক্ত [স্বাধীনা] দেবী, কারো ভার্যা নয়। তারা পদ্মসরে বিচরণশীলা ভ্রমরী ; যে-কোনো পদ্মকোষে রাতের মতো আশ্রয় নেবার স্বাধীনতা তাদের আছে। দেবতারাও অমনি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তাদের এই স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতা দেবলোক অতিক্রম করতে পারে না। কোনো দেবেরই নিজের পুত্র নেই, অর্থাৎ 'আমার' বলার মতো পুত্র নেই। কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবের অঙ্কশায়িনী দেবাঙ্গনাদের গর্ভজাত দেবশিশু কার পুত্র কিভাবে স্থির হবে? কিন্তু তা বলে দেবশিশুকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হতে হয় না। বরং তা বহুগুণ বেশীই তারা পেয়ে থাকে। আমিই তো আড়াই বছর দেবভূমিতে ছিলাম। একাধিক দেবকন্যার প্রেম-ভাজন হবার অবকাশও আমার হয়েছিলো। যতোদূর মনে হয় ওই সময় প্রসূত শিশুদের মধ্যে আমার ঔরসজাত সন্তানও থাকতে পারে। কিন্তু তা জানবার তো কোনো উপায়ই নেই। দেবশিশুকে দেখলে কোনো দেবতাই তাকে কোলে করে চুম্বন না করে চলে যায় না—এও তো দেখেছি। সে সময় মানুষের মতোই তার শরীর পুলকিত হয়, তেমনি পুত্রস্নেহই অনুভব করে সে। প্রথম প্রথম এই ব্যাপারে আমার কিছুটা বিস্ময় জাগতো—পরে খুব স্বাভাবিকই মনে হতে লাগলো।

—সেই যূথ-বিবাহ পশুর মতো মনে হতো না ?

—এখানে বসে চিন্তা করলে পশুর মতোই মনে হবে বটে। কিন্তু ভাই ওখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে দিব্যদৃশ্য বলে বোধ হবে। প্রত্যেকটি তরুণ অপর তরুণের পিতৃজ ভাই, সব তরুণী পরস্পরের ভগ্নী, প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি বয়স্ক লোকের পুত্র বা কন্যা, প্রত্যেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই দাদু-দিদিমা, আর সমস্ত সমবয়স্ক তরুণ-তরুণী অকাম হলে ভাই-বোন, কামনা হলে প্রেমিক-প্রেমিকা। তবে প্রেম সেখানে একতরফা হয় না। মিথ্যা এবং বলাৎকার দেবলোকে ক্ষমাহীন অপরাধ।

—প্রেমে তো বলাৎকার নেই, আর সেখানে প্রলোভনের কোনো স্থান নেই। বস্তুত সেখানে প্রলোভনের কোনো সামগ্রীই নেই, কারণ মৃগয়া, পশুপালন আর মধু সঞ্চয় করে যা কিছু পাওয়া যায়, তা তো সকলেরই সম্মিলিত সম্পত্তি। দেব-জীবনের মাধুর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু যদি সমগ্র দেবলোক, তাদের দেব-সমাজের স্বরূপ নিজের মনে চিত্রিত করে

দেখবার চেষ্টা করি, তাহলেই তার দিব্যতা কিছুটা অনুমান করতে পারা যায়।

—তবে সৌম্য কপিল! তুমি দেবভূমি ছেড়ে এলে কেন?

—মনে করো, সেই দিব্যভূমির বিভূতি মানব-সমাজের সামনে তুলে ধরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। কিংবা মনে করো, দেবলোকের অস্তিত্ব মানুষের কাছে পাওয়া লোহার ওপর নির্ভরশীল বলে তার ভিত্তি আমার কাছে খুব দুর্বল মনে হয়েছিলো। যদিও সেই দুর্বল ভিত খুব শীগ্‌গির এমন কি আমার জীবৎকালের মধ্যে ধসে যাবে বলে মনে হয়নি, তবু মানুষের পৌরুষের পরিবর্তে কেবল নদী আর পাহাড়ের সহায়তার ভরসায় টিকে থাকা সেই জীবন, পরে আর তেমন আকর্ষক মনে হতো না। এ কথাও বলতে পারো, আত্মীয়-বন্ধুর বিরহ-ব্যথা আমাকে আকুল করে তুলেছিলো। কিংবা হয়তো এইসবই একসঙ্গে মিলে আমার মন উচাটন করে তুলেছিলো। কিন্তু আমি গোপনে চলে আসিনি।

—তারা তোমাকে সেখানে রাখার জন্যে জোর করেনি?

—প্রীতি দিয়ে যতোটুকু পারা যায়, ততোটুকু জোর অবশ্যই করেছিলো। কিন্তু জবরদস্তি করা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিশেষ করে যারা তাদের বন্ধু, তাদের ওপর। দেবকন্যারা যখনই জানতে পারলো যে তাদের মানব মিত্র নিজের দেশে ফিরে যেতে চায়, তখন তারা যে কিভাবে তাদের প্রেমজাল বিস্তার করতে লাগলো, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না বন্ধু! তারা আমাকে পুষ্পোদ্যানে নিয়ে গিয়ে, নিজেদের কেশপাশ বনকুসুমে সজ্জিত করে, আমাকে ঘিরে বসতো। তারা কেউ আমাকে পুষ্পের কর্ণভূষণ পরিয়ে দিতো, কেউ আমার কেশগুচ্ছ নিয়ে বিনুনী বাঁধতো, কেউ আমার কাঁধে মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করতো—প্রিয়! যার জন্যে তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছো, সে মানবী কেমন? আমি তাদের কথার জবাব দিতে পারতাম না। কেমন করে বলবো যে—আমার একটি পৃথক দেবাঙ্গনা, পৃথক পুত্র, একটা আলাদা ঘর, একটা আলাদা পরিবার চাই? আমি তো তাদের সম্মিলিত দেব-পরিবার ঈর্ষার বস্তু বলেই মনে করতাম। এখনো তাই মনে করি। অবশ্য আমাদের দেশে তা প্রচলন করার চেষ্টা নিষ্ফলই হবে। তাদের সৌম্য সুন্দর মূর্তি, মধুর ব্যবহার আমাকে বেশ কিছুকাল আমার সংকল্প স্থগিত রাখতে বাধ্য করেছিলো। আর পুরুষদেরও, বিশেষ করে আমার মিত্র ইন্দ্রেরও একান্ত ইচ্ছা—আমি যেন দেবভূমি না ছেড়ে যাই।

—অবশেষে যখন ওখান থেকে চলে আসাই স্থির করে ফেললাম, তখন ইন্দ্র এবং দেব-পিতরু ও দেব-মাতাগণের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরে দেবভূমির রক্ষার প্রসঙ্গ আলোচনা করলাম। —দেবভূমিতে [উত্তর কুরু] কারো কোনো

অক্ষর-পরিচয়ই নেই, কাজেই তাদের জন্যে কিছু লিখে রাখার কোনো অর্থই হয় না। তবু দেব-বন্ধুদের আমি যে কথা বলেছি, ভবিষ্যতের দেব-সেনানীদের জন্যে আমি ভূর্জপত্রে তা কিছু কিছু লিখে রেখে এসেছি —সেটা সেখানেরই এক গুহায় এখনো রয়েছে। প্রথমত আমি তাদের বলেছি যে, দরায়ুশ তাদের ওপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলো, লোহাই তা প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। অথচ লোহাকে নিজস্ব জিনিস বলে দেবতারা স্বীকার করতে রাজী নয়। লোহার পরিবর্তে হাড়, পাথর বা কাঠের অস্ত্র দিয়ে তারা পার্শব সৈন্যকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারতো না। আর তাদের ওপর এই শেষ আক্রমণ নয়। কাদলী মৃগের জন্মভূমির দিকে লোকে বারবার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। সেইজন্যেই মানবলোকের তৈরী প্রত্যেকটি অস্ত্র-শস্ত্রকে জানতে হবে, নিজস্ব বলে ব্যবহারও করতে হবে। বাইরের জগতের সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখলে অবশ্য দেবভূমির দেবধর্ম [সামাজিক ব্যবস্থা] অপরিশুদ্ধ হবার আশংকা আছে। তার কোনো প্রতিকারের উপায় আমি স্থির করতে পারিনি, তাই ভূর্জপত্রে আমি যা লিখে এসেছি তা এদিক দিয়ে অসম্পূর্ণ বলতে পারো।

—তবুও তো তুমি সাধ্যমতো তাদের মঙ্গল-চিন্তা করেছো।

—হ্যাঁ, সারা অন্তর দিয়ে। আজ যদিও তা স্বপ্নলোক বলে মনে হচ্ছে, তবুও তিন বছর আগে এই দুটি চোখেই সে দৃশ্য দেখেছিলাম। তখন সেটাকে বাস্তব বলেই মনে হয়েছিলো। সেখানে আনন্দ আছে, কিন্তু কামুকতা নেই। মনে করো না যে ওখানে স্ত্রী-পুরুষ কেবল একে অপরকে চোখে দেখেই সন্তুষ্ট হয়। ওখানে পরিষ্বঙ্গও হয়, স্ত্রী-পুরুষ সমাগমও হয়ে থাকে। কিন্তু 'আমি' আর 'আমার' বোধযুক্ত মানুষের মধ্যে যা দেখা যায়, সেইসব নীচ চিন্তার স্থান নেই। সেই ঈর্ষাশূন্য সমাজে কোনো সীমারেখা না রেখেই মর্যাদার মান বাঁধা আছে, যা প্রত্যেকটি কার্যকলাপে, মনোভাবে তাদের অধোগামী হতে দেয় না। এ কথা তো তখনো অনুভব করেছি, তবুও কেন জানি না দেবভূমি পরিত্যাগের সংকল্প মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

—পার্শবদের ওপর প্রতিশোধের চিন্তা তো এর মধ্যে কাজ করেনি কপিল ?

—হয়তো তুমি ঠিকই ধরেছো সিংহ। পার্শব নাম যেন আমার কানে শূলের মতো, হৃদয়ে বৃশ্চিকের দংশনের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয় —পার্শবরা আমাদের স্বাধীন গান্ধারের অর্ধাংশকে পরাধীন করেছে, এ কথা ভুলে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত। দেবভূমিতেও কখনো কখনো পার্শব নাম আমার মুখ দিয়ে সহসা উচ্চারিত হতো। যখন আমি দেবভূমি ছেড়ে আসছিলাম, তখন

আবালবৃদ্ধ সব দেব-দেবাঙ্গনাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন তাদের কোনো পরম আত্মীয় বিদায় নিচ্ছে। আমার মৃত্যু হলেও তারা এতো দুঃখ করতো না বলেই আমার বিশ্বাস —কারণ তাদের জীবনই তাদের কাছে প্রেমের ভিত্তি। আজও আমার মনে এই সন্তোষটুকু আছে যে, দেব-পিতরগণ তাদের সন্তানদের কপিলের সঙ্গে তক্ষশীলার নাম শোনাবে। কপিলের নাম হয়তো তারা শীগ্‌গিরই ভুলে যাবে, কিন্তু তক্ষ-শীলার নাম নিশ্চয় তাদের স্মৃতিপটে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

—সৌম্য কপিল! দেবভূমি নিশ্চয়ই বড়ো মনোহর স্থান।

—আর দেবকন্যারাও, কি বলো কপিল? —রোহিণী পেছন থেকে বলে উঠলো। সেও নীরবে এতোক্ষণ কপিলের কাহিনী শুনছিলো।

নয়

তক্ষশীলার নাগরিক ও বিবাহ

তক্ষশীলা আমাকে সংবর্ধনা জানাবে, আমি তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম। এজন্যে তারা আমার সুস্থ হবার অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু এই অসুস্থ অবস্থাতেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম। আচার্য আর আচার্য-পত্নী তো আগে থেকেই আমাকে নিজের সন্তানের মতো পরিবারের একজন বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন তক্ষশীলার গণপতি [রাষ্ট্রপতি] থেকে কতো সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত আমাকে স্নেহ আর সহানুভূতি দেখাতে আসছিলেন।

পার্শবরা আমাদের জয় স্বীকার করে নিয়েছিলো। তারা এখন তাদের সেনাপতি মজ্‌দ্‌দাদ ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি এবং তক্ষশীলার সঙ্গে একটা সন্ধির চেষ্টা করছিলো। প্রথমে আমাদের মনে হয়েছিলো যে, পশ্চিম গান্ধারকে স্বাধীন করার এই চমৎকার সুযোগ। আমাদের সৈন্যদল সেখানে রাজধানী পুষ্কলাবতী পর্যন্ত পেঁাছে যাওয়ায় এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধাও হয়েছিলো। কিন্তু যখন সেখানকার নাগরিকদের সম্মতি এবং অন্যান্য সব দিক বিচার করা হলো —তখন বোঝা গেলো যে, যতোদিন না পার্শব সৈন্যবল নির্মূল করা যায়, ততোদিন কেবল তক্ষশীলার শক্তিতে পুষ্কলাবতীকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। শেষে স্থির হলো, তক্ষশীলার ক্ষতি করার জন্যে ওরা কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে। এইভাবেই পার্শবদের সঙ্গে সন্ধিও হয়ে গেলো। বলা বাহুল্য, মজ্‌দ্‌দাদ এবং অন্যান্য পার্শবদের আমরা প্রত্যর্পণ করেছিলাম।

যখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারছি, তখন একদিন সন্ধ্যায় আচার্য বললেন —বৎস সিংহ, সংস্থাগারে [প্রজাতন্ত্রভবন] যেতে হবে। সেখানে তক্ষশীলা তোমাকে অভিনন্দন জানাবে।

—তক্ষশীলা এ-পর্যন্ত আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট সমাদর নয় আচার্য ?

—না, তারা একে যথেষ্ট বলে মনে করে না। আর তোমাকে সৈনিকের বেশেই সেখানে যেতে হবে। আমি বর্ম-টর্ম সব মেরামত করিয়ে রেখেছি।

আমি মাথা নত করে আচার্যের আদেশ মেনে নিলাম।

সেই রাত্রে রোহিণীর সঙ্গে পরদিনের প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিলো। তখন

লক্ষ্য করেছিলাম, সে একটা কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করছে। কিন্তু কি সে কথা, তা জানবার জন্যে আমি আগ্রহ দেখাইনি। কারণ আমি জানতাম, এখনি হোক, আর পরেই হোক, রোহিণীর মনের কথা আমার কাছে প্রকাশ পাবেই। রোহিণী আমার বর্ম, খড়্গ প্রভৃতি নিয়ে এসে আমাকে দেখালো। মেরামতের পর সেগুলি ঠিক নতুনের মতো দেখাচ্ছে। পরদিন আমাকে খুব সকাল-সকাল উঠতে হবে, সুতরাং তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলে রোহিণী সে রাত্রে বিদায় নিলো।

পরদিন সকালে রোহিণীকে স্নানাগার থেকে স্নান করে লম্বা কেশপাশ শুক্‌নো কাপড়ে মুছতে মুছতে বেরোতে দেখলাম। যদিও এটা একটা ব্যতিক্রম, তবুও তার কারণ জানার অবকাশ হলো না। তারপর আমি যখন প্রাতরাশ সেরে খাটিয়ার ওপর বসে বর্ম পরবো বলে মনে করছি, তখন রোহিণী আমার ঘরে প্রবেশ করলো। সুন্দর কৌষেয় বস্ত্রের উত্তরীয়, অন্তর্বাসিক [শাড়ী] আর কঞ্চুকীতে [বক্ষাবরণ] সে সজ্জিত ছিলো। তার পিঠে ছড়িয়ে পড়া কেশগুচ্ছ টাটকা পুষ্পরাজিতে বড়ো চমৎকারভাবে সাজানো। সারা দেহে বর্ণ-চূর্ণের অতি হাল্‌কা প্রলেপ। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় তিন-নরী হার, মুক্তামালা আর কানে স্বর্ণকুণ্ডল। চারপাই থেকে উঠে তাড়াতাড়ি রোহিণীর পাশে গিয়ে আমি একদৃষ্টিতে তার মুখখানি দেখছিলাম। রোহিণী তার ললিত অধর আর আনত নয়নে হাস্যের রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলো —আমাকে কি নতুন দেখছো না-কি ?

—রোহিণী তুমি আমার কাছে নিত্য-নতুন। কখনো পুরোনো হবার নয়। তবে আজ যেন কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে।

—বিশেষ ব্যাপার তো নিশ্চয়ই। আজ তক্ষশীলা তোমাকে তার সবচেয়ে বড়ো সম্মান দেবে —সুতরাং আমার কাছে আজ মহোৎসবের দিন হবে না কেন বলো ?

—কিন্তু তোমাকে তো কখনো মুক্তাহার আর স্বর্ণকুণ্ডল পরতে দেখিনি।

—মা আজ এটা পরতে দিলেন।

—কিন্তু আমি কি তোমার কাছে যেতে পারি ?

—তুমি বুঝি আমার কাছে আসার জন্যে প্রত্যেকবার অনুমতি চাও ?

—কিন্তু আজ অনুমতি চাইতে ইচ্ছা করছে। ভয় হচ্ছে, পাছে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে তোমার কোমল কেশরাশি আলুথালু হয়ে যায়, আমার কর্কশ কলুষিত হাতে তোমার উত্তরীয়ে দাগ পড়ে, আমার দেহস্পর্শে তোমার সজ্জা বিস্রস্ত হতে পারে।

—তোমার কাব্য রাখো তো ! রোহিণীর আরক্ত গণ্ড দুটি আরও

আরক্তিম হয়ে উঠলো। সে বললো—আমি সাজগোজ করতে চাইনি। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন। তোমার যে তা পছন্দ হয়নি, এ কথা বেশ বুঝতে পারছি।

—পছন্দ! খুব পছন্দ হয়েছে। তবে শুধু চোখে দেখেই আমার তৃপ্তি হতে পারে না।

—তাহলে তোমার মতলবটা কি?

—মতলব তো তুমি নিজেই বুঝতে পারছো। একটি চুম্বন, একটি গাঢ় আলিঙ্গন।

রোহিণী আমার মাথায় হাত রেখে, আমার ওষ্ঠে তার ওষ্ঠ ধীরে স্পর্শ করলো। তারপর একটু একটু করে পিছু হটে বললো—চুম্বন যতো চাও ততো—কিন্তু আলিঙ্গন এখন নয়। মায়ের নিজের হাতের সাজানো সব অগোছালো হয়ে যাবে। আমাকে মহোৎসবে যেতে হবে তো।

অতএব চুম্বনেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

এবার বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, সব ধারণ করে প্রস্তুত হলাম। আচার্য এবং আচার্য-পত্নীও এই সময় এসে পড়লেন। তাঁরাও উৎসব উপলক্ষে সজ্জিত হয়েছেন, তবে অত্যন্ত সাধারণভাবে। আচার্য আমার এবং আচার্য-পত্নী রোহিণীর হাত ধরলেন। তারপর আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আচার্যের গৃহবাসী যতো বিদ্যার্থী, কর্মকর সবাই আজ উৎসবের বেশে সজ্জিত। যখন আমরা দুজন সংস্থাগারে চললাম, তখন পুরুষরা সকলেই আমাদের পিছু পিছু চললো। সংস্থাগার থেকে খানিকটা দূরেই গণপতি রোহিতাশ্ব সেনাপতি আর কিছু-সংখ্যক সদস্যের সঙ্গে আমাকে সংবর্ধনা জানালেন। তারপর ভেরী, বেণু ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করলো। সুসজ্জিত গান্ধার সৈন্যদলের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আমি সংস্থাগারে পৌঁছালাম। সেখানে গণ-সংস্থার সহস্র সদস্য গাত্রোত্থান করে তক্ষশীলা আর সিংহের জয়ধ্বনির সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলো। তারপর সংস্থা-গারে বিছানো মহার্ঘ কম্বলের [কালীন] ওপর সকলে উপবেশন করলো। গণপতি একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত উঁচু নিজের [সভাপতির] আসনে বসলেন এবং নিজের ডান দিকে আমাকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। আমার দক্ষিণে আচার্যও বসলেন। বর্ম-পরিহিত অবস্থায় আমাকে বীরাসনেই বসতে হলো, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

গণপতি রোহিতাশ্ব উঠে দাঁড়াতেই সংস্থাগার নিস্তব্ধতায় ভরে গেলো। গণপতি বলতে লাগলেন—ভন্তে [পূজ্য] গণ, শুনুন। আয়ুষ্মান্ সিংহের পরাক্রম আপনাদের অবিদিত নেই। তক্ষশীলার শত্রু পার্শবদের পরাজিত কবার কৃতিত্ব সিংহেরই। এই সিংহই কৌশলে শত্রুবাহিনীর সেনাপতিকে

বন্দী করেছিলো। আজ তার যশোগান, তার বীরত্বের গাথা সারা পূর্ব-পশ্চিম গান্ধারে গীত হচ্ছে। এমন একজন হিতকারী বীর সেনাপতিকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমাদের কর্তব্য। আর সেইজন্যেই আজকের এই গণ-সমাগম হয়েছে। নাগরিকদের মনোভাব বুঝে গণ-এর নায়ক-পরিষদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে উপায় স্থির করেছেন, সেনাপতি প্রিয়মেধ তা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছেন। গণ-এর অপর কোনো সদস্য ইচ্ছা করলে এ সম্পর্কে আরো কোনো প্রস্তাব পেশ করতে পারেন।

গণপতি উপবেশন করলে সেনাপতি প্রিয়মেধ উঠে বললেন — পূজ্য গণ, শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ সিংহ আমাদের গণ-এর যে সেবা করেছেন, সেই ঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্যে গান্ধারগণ তাঁকে গান্ধারের নাগরিক বলে স্বীকার করছে। আজ থেকে আয়ুষ্মান্ সিংহ তক্ষশীলার গান্ধার-পুত্রদের সমান অধিকার প্রাপ্ত হলেন। আর সেই সঙ্গে এই গণ আয়ুষ্মান্ সিংহকে তার গণ-সংস্থার আজীবন সদস্য নির্বাচিত করছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে সেনাপতি বসে পড়লেন। আবার গণপতি বললেন —পূজ্য গণ! শুনুন। আমাদের সেনাপতি আয়ুষ্মান্ সিংহকে তক্ষশীলার নাগরিক এবং গণ-সংস্থার সদস্য করার যে প্রস্তাব করলেন, তা আপনারা শুনেছেন। সেনাপতির প্রস্তাবে যাঁদের অসম্মতি আছে তাঁরা সে কথা বলুন।

প্রথম বার জিজ্ঞাসার পর কেউই কোনো সাড়াশব্দ দিলো না। তখন আবার তিনি বললেন —হে পূজ্য গণ! দ্বিতীয় বার বলছি শুনুন। আমাদের সেনাপতি আয়ুষ্মান্ সিংহকে তক্ষশীলার নাগরিক এবং গণ-সংস্থার সদস্য করার প্রস্তাব করেছেন। সেনাপতির প্রস্তাবে যাঁদের সম্মতি আছে তাঁরা নীরব থাকুন, যাঁর অসম্মতি আছে তিনি সে কথা বলুন।

তারপর একবার সকলের দিকে ভালো করে চেয়ে নিয়ে তিনি তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করলেন।

গণ-এর সকলকে তবুও নীরব দেখে গণপতি বললেন —পূজ্য গণ সম্পূর্ণ নীরব আছেন। সুতরাং আমার ধারণা, তাঁরা সকলেই আয়ুষ্মান্ সিংহকে তক্ষশীলার নাগরিক এবং সংস্থার সদস্য করতে স্বীকৃত আছেন।

প্রস্তাব গ্রহণের কথা ঘোষিত হতেই গণ তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলো। গণপতি অতঃপর বললেন —আয়ুষ্মান্ সিংহ! এই সম্মান তুমি নিজের বীরত্বে, নিজের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছো। আজ তুমি ও আমরা অভিন্ন। এই গণ-এর প্রত্যেক নাগরিক এবং গণ-সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের যে অধিকার আছে, এখন তুমি সেই অধিকার প্রাপ্ত হয়েছো। তুমি যদি এই গণ-এর কাছে কিছু বলতে চাও তো বলতে পারো।

আগে থেকে এই সম্মান-প্রাপ্তির কথা জানা থাকলে হয়তো নিজেকে কতকটা প্রস্তুত করে নিতে পারতাম। অতিরিক্ত আনন্দে তখন আমার হৃদয়ে তুফান উঠছে। ভয় হলো, হয়তো গুছিয়ে কিছু বলতে পারবো না। তবুও কিছু তো বলতেই হবে। আমি দণ্ডায়মান হয়ে করজোড়ে বললাম —পূজ্য গণ! আমার কথা শ্রবণ করুন। সাত বছরের কিছু বেশী হলো, আমি তক্ষশীলায় এসেছি। সেই সময় থেকে তক্ষশীলা আমাকে সাদরে তার কোলে স্থান দিয়েছে। আমি এখানে সন্তানের মতো স্নেহ-প্রীতি পেয়েছি। এখানে কোনোদিন কোনো কারণে দুঃখ পাওয়ার কারণ ঘটেনি। তক্ষশীলাকে পেয়ে বৈশালীর বিয়োগ-ব্যথা আমি ভুলে গেছি। যতো দিন গেছে, ততোই আচার্যের —"বৈশালী প্রাচীর তক্ষশীলা" কথাটি মনের মধ্যে গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এবং বৈশালী ও তক্ষশীলা অভিন্ন বলেই মনে হয়েছে। আন্তরিকভাবে আমি নিজেকে তক্ষশীলার সন্তান বলে মনে করি। বৈশালীর জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে যে আনন্দ, তক্ষশীলার জন্যেও ঠিক সেই আনন্দ।

—পূজ্য গণ! আপনাদের মধ্যে অনেক আয়ুষ্মানই জানেন যে, প্রাচীতে কুরু, বৎস, কোশল, মগধ ইত্যাদি অনেক রাজ্য আছে —সেখানে অনার্য রীতিতে শাসনকার্য চলে। সেইসব রাজ্যে দেব-পরিষদের মতো এমন গণ-সংস্থা দেখা যায় না। পার্শ্ব রাজাধিরাজের মতো রাজা ইচ্ছামতো শাসন করেন। শুধু তাদের মধ্যে বৈশালীতে লিচ্ছবি গণ-ই একমাত্র দেশ —যারা স্বাধীন আর্য জাতির মতো রাজাহীন সম্মিলিত শাসন —গণ-শাসন পরিচালনা করে। কোশলে আমার নিজেকে আগন্তুক বলে মনে হয়েছে, কুরুতে মনে হয়েছে বিদেশী —কিন্তু তক্ষশীলায় এসে খুব শীগ্গিরই মনে হয়েছে যে আমি নিজের দেশ বৈশালীতেই পৌঁছে গেছি। সুতরাং পূজ্য গণ বুঝতে পারছেন —আমি যা কিছু করেছি, তা বৈশালীর প্রেরণাতেই করেছি। এর যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু যশ, সবই বৈশালীর প্রাপ্য। আপনারা যে মহান্ সম্মান এবং দুর্লভ অধিকার আমাকে প্রদান করলেন, এর জন্যে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। তক্ষশীলাকে সেবা করার কোনো সুযোগই যেন আমি না হারাই —আমার শুধু এইটুকু প্রার্থনা।

আমি উপবেশন করতেই হর্ষধ্বনি শোনা গেলো। শোভিত নামে একজন প্রধান গণ-সদস্য উঠে বললেন —পূজ্য গণ! আমাদের বীরপুরুষকে আমাদের যতোটুকু সাধ্যায়ত্ত, সেই উচ্চ সম্মান দিয়েছি। কিন্তু এই অবকাশে প্রাচীর তক্ষশীলা বৈশালীকে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এইজন্যে পূজ্য গণ-এর কাছে আমার প্রার্থনা —তাঁরা এখানের এক নাগরিক মণ্ডলকে বৈশালীতে প্রেরণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন এবং এইভাবে দুই গণ-কে চির-বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ করুন।

গণপতি গণ-এর সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন এবং সকলেই তাতে সম্মতি জানালো।

তারপর যখন হর্ষোৎফুল্ল গণ-সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ আলোচনা করছেন, এমনি সময়ে কিছুক্ষণ ধরে আচার্য বহুলাশ্ব গণপতির কানে কানে কি যেন বললেন। তখন গণপতি উঠে দাঁড়িয়ে—পূজ্য গণ! শ্রবণ করুণ—বলতেই সংস্থাগারে আবার নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো।

গণপতি বললেন—আমি আপনাদের একটা আনন্দের সংবাদ দেবো। আমাদের আচার্য বহুলাশ্বের তরুণী কন্যা—যে পার্শবদের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে—সেই রোহিণী আয়ুষ্মান্ সিংহকে নিজের প্রেমপাত্র নির্বাচন করেছে। আচার্য বহুলাশ্বও এই প্রেম অনুমোদন করছেন এবং এ কথা শুনে আমরাও খুব আনন্দিত।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শোনা যেতে লাগলো—রোহিণী আর সিংহের পাণি-গ্রহণ এখানে আমাদের সামনেই সম্পন্ন হোক।

এই সময় রোহিণী অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বক্ষ-কোষ্ঠকে [গ্যালারি] বসেছিলো। হর্ষ ও লজ্জায় তার মুখ রক্তবর্ণ—কিন্তু গণপতির আদেশ তো অমান্য করতে পারে না। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, গণপতির আসনের পেছনের দরজা দিয়ে মায়ের সঙ্গে অবনতমুখী রোহিণী ধীরে ধীরে আসছে। সংস্থাগারের ভেতর উপবিষ্ট দু'হাজার দৃষ্টির সামনে মনে হলো সে বেশ দমে যাচ্ছে। তার পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি তখনো তেমনি পিঠের ওপর এলানো। ধীরে ধীরে চলছে বলে তার কুণ্ডল [কর্ণভূষণ] মৃদু-মন্দ দুলছে। মধ্যে মধ্যে শ্বাসগ্রহণে ভুল হওয়ায় তার স্তনভাগ আরো বেশী উন্নত-অবনত হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে যদিও আমি রোহিণীর ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য দেখে আসছি, কিন্তু সেদিন তাকে আর আমার মানবী বলে মনে হলো না। মনে হলো, সে উত্তর কুরুর অপ্সরা। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের এই মহালাভে নিজেকে ধন্য বলে মনে হতে লাগলো।

রোহিণী গণপতির আসনের সামনে এসে দাঁড়ালো। আচার্য এবং গণপতি উঠে দাঁড়ালে আমিও দণ্ডায়মান হলাম। আচার্য রোহিণীর হাত আমার হাতে তুলে দিলেন। সংস্থাগারে আবার হর্ষধ্বনি উঠলো। চারিদিকে কেবল বৈশালী আর তক্ষশীলার জয়-জয়কার। গণপতি পরদিন নক্ষত্র-দিবস [উৎসবের দিন] বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর গণপতি সকলের আগে, তার পেছনে আমি আর রোহিণী, তারপর আচার্য এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা সংস্থাগার থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে জনতা দেখে মনে হলো, সমগ্র তক্ষশীলার লোক যেন এসে জমায়েত হয়েছে। বাজনার সঙ্গে আমরা

নগর থেকে নিজেদের বাসস্থানে পৌঁছালাম। এখান থেকে সব লোক নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলো।

সেই সন্ধ্যায় তক্ষশীলার তরুণ-তরুণীরা দলে দলে আমাদের আঙ্গিনায় এসে জমতে লাগলো। তারা আমাদের দু'জনকে মাঝখানে রেখে বিবাহ মহোৎসব শুরু করলো। সেই উৎসবে মাংস আর উৎকৃষ্ট সুরা পান ভোজনের সঙ্গে নাচ আর গানই প্রধান অঙ্গ। সেখানে উপস্থিত তরুণীরা প্রত্যেকেই সুন্দরী। মনে হচ্ছিলো—পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য যেন একত্র করা হয়েছে, আর তার মধ্যে আমার রোহিণী ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদ। এই নৃত্যে বর-বধূকেও নাচতে হয়, আর তাতে আমার বা রোহিণীর লজ্জার কোনো কারণই ছিলো না—আমরাও নৃত্যে কারো চেয়ে কম পটু ছিলাম না। রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সখা-সখীদের চোখের পাতা ভারী—এদিকে সুরার ক্রিয়াও শুরু হয়েছে, তখন আমাদের ছুটি মিললো।

রোহিণীর চোখের পাতাও ভারী, আমার চোখের পাতাও বুজে আসছে—এমন সময় আমরা শয়ন-কক্ষে পৌঁছালাম।

দশ

তক্ষশীলা থেকে প্রস্থান

রিপুঞ্জয় এখন দেড় বছরের —দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়ায়। মা-বাবার চেয়ে সে দাদু আর দিদিমাকেই বেশী ভালোবাসে। মায়ের দেখাদেখি সেও দিদিমাকে মা বলে ডাকে। তক্ষশীলা যাত্রার জন্য নির্বাচিত নাগরিক-মণ্ডলী আমার জন্যেই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করছে। আমার মিত্র কপিলই এই নাগরিক-মণ্ডলীর নায়ক নির্বাচিত হয়েছিলো। আজ-কাল করে সে সওয়া দু'বছর অপেক্ষা করেছে। কিন্তু আর দেরী করলে কপিলের পরিবর্তে অন্য কাউকে নায়ক করতে হবে। কারণ কপিল এমন মানুষ যে তাকে বেশীদিন এক জায়গায় আটকে রাখা যায় না। আচার্য, বিশেষ করে মাতাজীর কাছে বিদায় নেবার কথা বলা খুবই শক্ত ব্যাপার। প্রথমে ভাবতে ভাবতেই তো রোহিণীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পেলো। এই অবস্থায় আট যোজন দূরে সংকটপূর্ণ যাত্রা সম্ভব ছিলো না। রিপুঞ্জয় একেবারে ছোট থাকতেও সেই একই অবস্থা। কিন্তু সে এক বছরের হবার পরই আচার্যের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলাম। আচার্য অত্যন্ত দূরদর্শী এবং অপরের মনোভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তিনি প্রথম দিনই বললেন —পুত্র! আমি তোমার সঙ্গে একমত! বৈশালীর আজকের দিনে যা প্রয়োজন, তার জন্যেই তুমি দশ বছর তক্ষশীলায় শিক্ষালাভ করলে। স্নেহ আমার হৃদয়কে তোমায় বিদায় না দেবার কথাই বলছে —কিন্তু রণাঙ্গমুখকারিণী তরুণী ভার্যার মতোই এ স্নেহ সর্বথা পরিত্যাজ্য। তুমি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে এর জন্যে প্রস্তুত করো।

মাকে রাজী করানো খুব সহজ কাজ ছিলো না। একমাত্র কন্যার চলে যাবার পর সাতমহল বাড়ী তাঁর কাছে কি-রকম শূন্য মনে হবে, সে কথা আমি এবং আমার চেয়েও রোহিণী বেশী অনুভব করছিলো। পরদিন মাকে বলবো বলে প্রতি রাত্রেই আমরা পরামর্শ করতাম, কিন্তু তাঁর সামনে গেলেই সব সাহস কোথায় উড়ে যেতো। অবশেষে কপিলকেই আমরা আমাদের দূত করলাম।

কপিল একদিন কথা শুরু করলো এইভাবে —আচার্যাণী! গণ-সংস্থা সৌম্য সিংহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে, কিন্তু বৈশালীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ভেট দেবার জন্যে ভালো ভালো

ঘোটক-ঘোটকী, চমৎকার পাণ্ডু-কম্বল, পুরাতন কাপিশেয়ী সুরা-ভাণ্ড প্রভৃতি কতো সব উপচার জমা করা হচ্ছে। আচার্যাণী নিশ্চয় এসব কথা শুনেছেন ?

—না পুত্র, রিপুঞ্জয় আজকাল আমাকে কোনো কাজ করতে দেয় না, কোনো কথা শোনারও অবসর দেয় না। তবে তো তোমাকে বৈশালীতে যেতেই হবে, কি বলো পুত্র ?

—হ্যাঁ, আমিই তো নাগরিক-মণ্ডলীর প্রধান নির্বাচিত হয়েছি।

—কবে যাবে বলে স্থির করেছো ?

—ছ'মাস পরে, বর্ষা শেষ হলে। তখন রাস্তা ভালো থাকবে, নদীর ঘাটও ঠিক থাকবে, আর পথে সার্থদের সাক্ষাৎও পাবো।

—হ্যাঁ, সেই বেশ সময়। যাত্রার সব প্রস্তুত তো ?

—কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এখোনো স্থির হয়নি, যার জন্যে আমরা দু'বছর অপেক্ষা করছি।

—কী কথা পুত্র ?

—সিংহের যাওয়া। সিংহের সঙ্গে আমাদের যেতে হবে মা।

আচার্যাণীর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়তে লাগলো। তাঁর কোলে রিপুঞ্জয় শুয়েছিলো। তিনি তার মুখচুম্বন করে ভারী গলায় বললেন—পুত্র ! আমি বরাবর এই দিনের আশংকাই করতাম। রোহিণীর বিয়ের বছরে যখন নাগরিক-মণ্ডলীর যাত্রা স্থগিত রইলো, তখনি তার কারণ বুঝতে পেরেছিলাম। এখনো পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখা অনুচিত মনে হয়নি, কিন্তু এ কথা আমি বারবার চিন্তা করেছি। তুমি সহজেই বুঝতে পারবে—রোহিণী আর সিংহের চলে যাওয়া আমার পক্ষে কি-রকম অসহ্য হবে। আচার্যের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কতোবার আলোচনা হয়েছে আর আমাকে তাঁর সামনে নিরুত্তর থাকতে হয়েছে। কিন্তু মন যে মানে না। —এই পর্যন্ত বলেই আচার্যাণী নীরব হলেন। আর কিছু বলতে পারলেন না।

—আচার্যাণী ! আপনি ঠিকই বলেছেন। একমাত্র কন্যাকে বিদায় দেওয়া মায়ের পক্ষে বড়ো কষ্টকর।

—সত্যিই বড়ো কষ্টকর, পুত্র। কিন্তু আমি তা সহ্য করবো বলে মন স্থির করেছি। আমি সিংহ আর রোহিণীকে এই বছরই যাবার অনুমতি দেবো আর আমার ব্যথার সান্ত্বনার জন্যে এই জয়কে ভিক্ষা চাইবো।

কপিল যখন এই আলোচনার কথা জানালো, তখন মনে মনে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। রোহিণী তো বলেই বসলো—ও ছেলে তো মায়েরই। ভিক্ষা চাওয়ার কথা মা বলছেন কেন ?

পরদিন আমরা সোজা মায়ের কাছে গেলাম। আমাদের তাঁর কাছে যাওয়ার সঙ্গে কাল কপিলের সঙ্গে আলাপের সম্বন্ধ আছে বলে তিনি বুঝতে পারলেন। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া দেখতে পেলাম। কিন্তু নিজের মনের ভাব দমন করে তিনি জোর করে মুখে হাসি টেনে নিয়ে বললেন—আমার ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী কোথায় যাবে ?

আমি সাহস সঞ্চয় করে বললাম—মা, কালকের কথা কপিল আমাদের বলেছে। আমরা তো মায়েরই, সুতরাং ভিক্ষার কথা কেমন করে উঠতে পারে ? মা ইচ্ছা করলে জয়কে নেবেন। যদি চান তো আমাদের না যাবার আদেশও দিতে পারেন। আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে নেবো। কিন্তু বৈশালীর ওপর মগধরাজের যে রকম কোপদৃষ্টি, তাতে আচার্যও আমাকে সম্মতি দিয়েছেন, আর আমার কর্তব্যও আমাকে বৈশালীতে ফিরে যেতে বাধ্য করছে।

মা আমার কথা শেষ করার জন্যে নীরবে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে রোহিণীকে কোলে টেনে নিলেন। মনে হলো, আজও যেন রোহিণী তাঁর কাছে সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি। রোহিণীর মুখচুম্বন করে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে তিনি বললেন—পুত্র ! ভয় নেই। আমার যেমন মাতৃহৃদয় আছে, তেমনি কর্তব্য-অকর্তব্য বোঝবার মতো বুদ্ধিও আছে। যখন মাতৃহৃদয় প্রাধান্য লাভ করে, তখন বুদ্ধিশূন্যতা দেখা দেয়। আমি আশা করি, ছ'মাস আমাকে এই বুদ্ধিশূন্য জীবন-যাপনের অনুমতি দেবে। আমি প্রায় ষাটের কোঠায় পৌঁছে গেছি, এখন আবার আমার রোহিণী--বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো, চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আবার কিছুক্ষণ পরে বললেন—পুত্র ! আমার কাছে এসে বসো।

আমি পাশে বসে পড়লাম। তিনি আমার কপালে অশ্রুমিশ্রিত চুম্বন দিলেন। তারপর তুষারশুভ্র চুলগুলি নিজের মুখ থেকে সরিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন—পুত্র ! আমি জয়ের মাতা-পিতার স্থান পূর্ণ করবো। জয়ের কোনো দুঃখ হবে না। কারণ সে আমাকে যতোটা চায়, রোহিণীকে ততোটা নয়। দুধ খাওয়া ছাড়ার পর তার সঙ্গে রোহিণীর আর দেখাশোনা কতোটুকু ? এদিকে আমার হাত থেকে ছাগলের দুধ খেতে খেতে রোহিণীকে ও ভুলতে বসেছে।

মা আমাদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিলেন।

একদিকে তক্ষশীলার স্নেহময় পরিবেশের বিয়োগ-ব্যথা যেমন মাঝে মাঝে আমার মনকে উদাস করে দিতে লাগলো, তেমনি অপরদিকে বাল্যস্মৃতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে লাগলো। রোহিণীর কাছে সামনের ছ'মাস

বড়োই দুর্লভ সময় বলে মনে হলো। সে শুধু তার সখা-সখী বা বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গেই নয়, এখানকার তরু-গুল্ম, বন-উদ্যানের সান্নিধ্যেই এই সময়টুকু কাটাতে চাইতো। এর ফলে এক এক সময় নিজেকে বড়োই নিঃসঙ্গ বোধ হতো, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম রোহিণীর পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। শেষের দু'মাস আমরা দু'জন কতোবার দু'দিন কি চার দিনের জন্যে কর্মান্তেই থেকে যেতাম আর দেখতাম, জয় দিদিমার স্নেহে আমাদের ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে বর্ষা শেষ হলো। তক্ষশীলার কাছে পাহাড়ে-জঙ্গলে কাঁচ সবুজ তৃণ আর বনস্পতিদের গাঢ় সবুজ বর্ণ পক্কবর্ণ ধারণ করতে লাগলো। ক্ষেতে ধান পাকতে শুরু করলো, লোকে ঘরদোর পরিষ্কার আর মেরামতের কাজ শুরু করলো।

কপিলের নেতৃত্বে দশ জনের এক নাগরিক-মণ্ডলী বৈশালী যাবে। উপহারের জন্যে দশটি উত্তম ঘোড়া, কম্বল প্রভৃতি জমা হয়েছে। তাদের সঙ্গে তক্ষশীলা গণ-এর জন্যে সুবর্ণ-ফলকে এক অভিলেখ [অভিনন্দনপত্র] ছিলো। তার মধ্যে খানিকটা হলো এই—

"বৈশালী আর তক্ষশীলার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে আসছি যে, গান্ধার থেকে আর্যরা প্রাচীতে গিয়েছিলেন, তাঁরাই বৈশালী গণ প্রতিষ্ঠা করেন। যাই হোক, দুই নগরী আর নাগরিকদের অনেক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য যে আজও একই রকমের, এ কথা তো সত্য। ······

"বৈশালী তক্ষশীলার চক্ষে বীরপ্রসবিনী। তার বীরপুত্র সিংহ যে কৌশলে পার্শব সৈন্যদের ধ্বংস করেছে, তা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা সেই বীরপুরুষকে সম্মানিত করেছি এবং আশা করি এই বীর সেনানীকে পাওয়া বৈশালীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা হবে। যে তার বীরগাথা শুনবে, সে বৈশালীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস করবে না।

"আমরা চাই, তক্ষশীলা আর বৈশালী চিরকালের জন্যে ভগিনীত্বের সূত্রে বাঁধা থাক এবং গান্ধার আর লিচ্ছবিরা পরস্পরকে যেন ভাই-ভাই বলে মনে করে···"

এগারো জন নাগরিক আর আমরা দু'জন ছাড়া বৈশালী থেকে আগত আরো পাঁচ জন তরুণ, শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলো। অতএব আমরা সবশুদ্ধ আঠারো জন ছিলাম। স্থির হয়েছিলো, তক্ষশীলা থেকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত স্থল-সার্থের সঙ্গে যাওয়া হবে, তারপর নৌকায়। উপহারের জন্যে প্রদত্ত জিনিসপত্র এবং পাথেয় ক্রয়ের জন্যে বিক্রয়ের উপযোগী বস্তুসম্ভার আমরা ছ'খানি শকটে ভরে নিলাম। সুতরাং ছ'জন

লোক বাদে বারো জন বারোটি ঘোড়ায় সওয়ার হলো। আমার এবং রোহিণীর জন্যে আচার্য তাঁর ঘোড়াশাল থেকে দুটি শ্রেষ্ঠ ঘোড়া আমাকে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা আমাদের বিদায় দেবার জন্যে বন্ধু-বান্ধবীদের যে সম্মেলন হয়েছিলো তাতে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিলো বটে, কিন্তু কিছুই যেন জমলো না। সুস্বাদ আহার্যও বিস্বাদ লাগলো। নৃত্য-গীতের কথা বলতে পারি না, কারণ সব সময়ই আমাদের বিষাদ-ভরা আলাপে সময় কেটেছিলো। রোহিণীর সখীরা অশ্রুধারায় তার মুখ সিক্ত করে, তাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলো। আমার বন্ধুরা আবার দেখা হবার শুভকামনা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

ভোর হবার আগে, একটু রাত থাকতেই তক্ষশীলার পূর্ব-দ্বার দিয়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে। আমরা দু'জনে উঠে মুখ ধুয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করলাম। তারপর মায়ের হাতে তৈরী মধুর মাংসগোলক আর অপূপ [পিষ্টক] খেয়ে নিলাম। জয় প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। কয়েক বছর পর হয়তো ও বুঝতে পারবে, ওর বাবা-মা কোনো এক রাত্রিশেষে ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় এখানে রেখে চলে গেছে। আমি আর রোহিণী আলতোভাবে ওর মুখে চুম্বন করলাম। একবার আমার মনে হলো--জয় বুঝি হাসছে। তার রক্তিম ওষ্ঠাধরের মাঝে মুক্তার মতো দাঁতগুলি যেন একবার দেখা গেলো। কিন্তু সে আমার মনের ভ্রম। জয় গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জ্বলন্ত প্রদীপের আলোকে দেখলাম, রোহিণীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। আমার চোখে জল ঝরছে না বটে, কিন্তু অন্তরে বড়ো বেদনা অনুভব করছিলাম।

সার্থদের শকটের সঙ্গে আমাদের শকটটিও নগর-দ্বার থেকে বেরিয়ে গেছে, আমাদের অন্যান্য সাথীরাও চলে গেছে। জোর করে মা আর আচার্যকে নগর-দ্বার পর্যন্ত যেতে দিলাম না। দ্বারপ্রান্তে তাঁদের আলিঙ্গন ও ললাট-চুম্বন গ্রহণ করে আমরা নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়লাম।

এক মাইলটাক গিয়ে শকটগুলিকে ধরে ফেললাম। সূর্যোদয়ের সময় অনুপম শোভামণ্ডিত তক্ষশীলাকে দেব-নগরীর মতো সামনে দেখা যাচ্ছে। এখন অন্য দশ জন অশ্বারোহীর সঙ্গে আমরা শকটের পেছন পেছন চলেছি। শেষ পর্যন্ত আমরা সেইখানে এসে পৌঁছালাম, যেখান থেকে তক্ষশীলা এবার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। সেখানে আমাদের দু'জনকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে কপিল আর তার সঙ্গীরাও নেমে পড়লো।

আমি তক্ষশীলার দিকে চেয়ে করজোড়ে বললাম--এই আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন তক্ষশীলা। কিন্তু তোমার কোলে অতিবাহিত এই দশ বছরের স্মৃতি কখনো ভুলবো না।

রোহিণীও করজোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলো, কিন্তু কথার পরিবর্তে তার চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো।

আমার বৈশালীর বন্ধুরা আগে আগে শকটে করে যাচ্ছিলো। তাদের এখানে এসে কী মনে হয়েছিলো, তা বলতে পারবো না।

রোহিণী তখনো অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তক্ষশীলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ঘোড়া নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম, সে জানতেও পারলো না। তারপর যখন তাকে বললাম —রোহিণী চলো! —তখন সে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো।

ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়াকে চলার ইঙ্গিত করলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আমরা শকটগুলির কাছে গিয়ে পড়লাম।

এগারো

বৈশালীর পথে

মদ্র [যে প্রদেশে শিয়ালকোট অবস্থিত] এবং মল্ল [মালব] গণ-এর মধ্যে দিয়ে দশ বছর আগেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন দূর থেকে এদের অপরিচিত প্রদেশ বলে মনে হয়েছে। আর এরা এখন পরিচিত মিত্রের মতো। এই গণ-এর অভ্যন্তর ভাগের রাস্তাগুলি সুরক্ষিত। চোর-ডাকাতের ভয় নেই। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে পথগুলি মেরামত করেছে। চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীর ওপর সেতু বাঁধা হয়েছে এবং নৌকারও ব্যবস্থা রয়েছে। গণ-এর মধ্যে প্রবেশ করবার সময় সার্থদের কিছু শুল্ক দিতে হয়। নগরের বাইরে সার্থদের আশ্রয় নেবার চমৎকার স্থান আছে। সেখানে মানুষের আহার্য আর পশুখাদ্যও পাওয়া যায়। নগরে কোনো জিনিস বেচতে হলে সামান্য কিছু শুল্ক দিতে হয়।

মদ্র এবং মল্লের বীরেরা তক্ষশীলাকে রক্ষার জন্যে সেখানে গিয়েছিলো, সুতরাং তারা আমার কথা ভালো করেই জানে। মদ্রের রাজধানী শাগলে [শিয়ালকোট] যখন পেঁছালাম, তখন সেখানে সংস্থাগারে গণ-এর পক্ষ থেকে আমার অভ্যর্থনার খুব ভালোরকম আয়োজন করা হয়েছিলো। গান্ধারী রোহিণী, মাদ্রী তরুণীদের পেয়ে কিছুকালের জন্যে তক্ষশীলার বিয়োগ-ব্যথা ভুলে গেলো। প্রাচীতে মদ্র দেশ সুন্দরীদের খনি বলে প্রসিদ্ধ —এ কথা যখন রোহিণীকে বললাম, সে গণ্ডদেশ দুটি আরক্তিম করে বললো —প্রাচীর লোকেরা হয়তো মদ্র আর গান্ধারের প্রভেদ জানে না।

—হ্যাঁ, সে কথা স্বীকার করছি। কারণ গান্ধারী আর মাদ্রীদের মধ্যে কাউকে কম-বেশী বলা চলে না।

যখন আমরা শতদ্রু [সতলজ] আর সরস্বতী [ঘগঘর] পার হয়ে প্রাচীর মধ্যে পেঁছালাম তখনি আমাদের এই নিশ্চিন্ত ভাব আর রইলো না। পথ নিরাপদ নয়। জঙ্গল, গুহা, নদী —সর্বত্রই চোরের ভয়। এখানে লোক-বসতিও বেশ দূরে দূরে, তাই কতোদিন জঙ্গলেই রাত কাটাতে হতো। যেখানে বসতি আছে, সেখানেও যে ডাকাতের ভয় নেই, তা নয়। তবে সেখানে শাকসব্জী, দুধ, ননী এবং অন্যান্য আহার্য পাওয়া যায়। এখানে রাজার শাসন —তাই মানুষের ব্যবহারে কৃত্রিমতাই বেশী। ছোট-বড়োর

ব্যবধানও প্রচুর। সাধারণ মানুষ গণ-এর অধিবাসীদের চেয়ে বেশী দরিদ্র। আর অনেক দাসও এখানে দেখা গেলো।

জঙ্গলে মৃগয়ার [শিকারের] সুবিধা আছে যথেষ্ট। রোজই কিছু-না-কিছু শিকার পাওয়া যেতো। কখনো আমরা গবয় [নীল গাই] শিকার করতাম—কখনো হরিণ, কখনো শূকর, আবার কখনো ময়ূর। এইরকম সুস্বাদু খাদ্যের এখানে সুবিধা ছিলো। আমাদের সঙ্গী সার্থে চারশো লোক ছিলো। প্রতিদিনই আমরা অবশ্য তাদের সকলকে মাংস দিতে পারতাম না। কিন্তু যেদিন গবয় [নীল গাই] পাওয়া যেতো, সেদিন সার্থদলের আনন্দের সীমা থাকতো না। সার্থদলের সঙ্গে অনেক বাড়তি বলদও ছিলো। যখন কোনো বলদ চলতে অশক্ত হতো, তখন তার পরিবর্তে কোনো একটাকে শকটে জুড়ে অক্ষম বলদটা সার্থদের খাদ্যে পরিণত হতো। আবার সামনে কোনো গ্রাম পড়লে তখন নতুন বলদ কিনে তাদের সংখ্যা পূরণ করা হতো। গ্রামে পেঁছালে তখন পেট ভরে সুরা পান আর মাংস ভোজনের জন্যে সার্থদলের অবকাশ মিলতো। আমাদের সমগ্র সার্থদলের জন্যে অন্তত তিনটে বড়ো বলদ নিলে তবে মাংসে কুলাতো। যেখানে চোর-ডাকাতের ভয়, সেখানে সার্থবাহদের সুরাপানের ছুটি দেওয়া সম্ভব হতো না।

ইন্দ্রপ্রস্থে পেঁছাবার পাঁচ দিন আগে আমরা বুঝতে পারলাম, একদল ডাকাত আমাদের পিছু নিয়েছে। তখন সার্থদল সেনা অভিযানের রূপ ধারণ করলো---রোহিণীও তাতে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় বলে প্রমাণ হলো। কিন্তু কপিল যখন তাকে অন্তত রাত্রে সৈনিকের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলো, তখন রোহিণী রেগে গেলো। তার স্বভাব যদিও মোটেই ঝগড়াটে নয়, তবুও সেদিন আমি তাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যমুনা পার হয়ে আমরা গঙ্গার ধারে হস্তিনাপুরে পেঁছালাম। পথে পড়লো কল্মাষদম্য রাজধানী। একদিন দেখলাম, কুরুর বৃদ্ধ রাজা রথে করে নগরের বাইরে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে-পেছনে অসংখ্য প্রহরী! আমার তক্ষশীলার সঙ্গীদের অধিকাংশই কখনো কোনো রাজাকে দেখেনি। তাই তারা ভাবলো, রাজা বোধ হয় কোথাও যুদ্ধে যাচ্ছেন। আমি যখন বললাম যে রাজা কোনো যুদ্ধে যাচ্ছেন না, চলেছেন উদ্যান-ক্রীড়ায়—তখন তারা তো অবাক হয়ে গেলো। এইজন্যে এতো সশস্ত্র প্রহরী দরকার? আমি তাদের বুঝিয়ে দিলাম—রাজতন্ত্রে একজন লোকই রাজা। সমস্ত ক্ষমতা আর শক্তিই এই রাজা নিজের হাতে নিয়ে নেন। তার ফলে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি হয়! তার ওপর উত্তরাধিকারীরা সুযোগ পেলেই নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে

তাঁকে হত্যা করতেও চাইতে পারে। এইসব কারণে রাজার জীবন সর্বদা বিপন্ন থাকে। আর তাই রাজা এমন কি গাছ থেকে টাটকা ফল পেড়েও খেতে পারেন না, যতোক্ষণ না অপর কেউ আগে সেটাকে চেখে দেখে। তৃষ্ণার সময় স্বচ্ছ জল সামনে থাকতেও তাঁকে ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, যতোক্ষণ না অপর কেউ দু'ঢোক খেয়ে প্রমাণ করে যে সে জল বিষ মেশানো নয়। আর রান্না করা খাদ্যের তো কথাই নেই। রাজা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যেতেও পারেন না। অধিকাংশ রাত্রিই কাটে তাঁর দুঃস্বপ্নের ঘোরে।

এ কথা শুনে আমাদের সঙ্গীভদ্রিক বললে—এতো সব বিপদ দেখেও রাজা নিজের ঘাড়ে এতো দায়িত্ব নেন কিসের জন্যে ?

—কারণ যথেষ্ট ভোগের সুযোগ পাওয়া যায়। তিনিই হলেন দেশের সবচেয়ে ধনী। কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য না করেও সারা দুনিয়ার ধনরাশি তাঁর ভাণ্ডারে চলে আসে! তাঁরই থাকে সবচেয়ে বেশী কর্মান্ত [ক্ষেত]। তিনিই সবচেয়ে বেশী-সংখ্যক দাস-দাসীর মালিক। নিত্য-নতুন সুন্দরী তরুণীতে তিনি নিজের অন্তঃপুর পূর্ণ করেন।

—কিন্তু লোকে এসব সহ্য করে কেন ?

—উপায়ান্তর না দেখে মানুষ যখন এইসব সহ্য করতে বাধ্য হয়, তখনই তো তাদের ওপর রাজার শাসন শুরু হয়।

—আমরা তো কখনো এ অন্যায় সহ্য করতাম না।

—কিন্তু পশ্চিম গান্ধারের লোকেরা যে পার্শ্ব রাজাধিরাজের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে! রাজা শুধু একটি মাত্র জন-এর [জাতির] ওপর নিজের শাসনকে সীমিত রেখে নিজের ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখতে পারে না। রাজ্য শাসনের জন্যে অনেক জন-এর প্রয়োজন, যাতে তিনি এক জাতির বিরুদ্ধে অপর জাতিকে কাজে লাগাতে পারেন। এজন্যে দরকার দাসের সমাজ —যাতে এক জাতির মধ্যেও নিজের সাহায্যকারী খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা অখণ্ড জাতিকে পর্যন্ত রাজা খণ্ড খণ্ড করে বিভেদ সৃষ্টি করেন। উত্তরাপথের গণ-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এতো সব ভেদ দেখতে পাবে না। সেখানে দেবতার পূজা-প্রার্থনার জন্যে কোনো পৃথক সম্প্রদায় নেই। কিন্তু এখানে রাজার শাসনাধীন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে রাজার স্বেচ্ছাচারী শাসনের সুবিধার জন্যেই।

হস্তিনাপুরে আমাদের কয়েকদিন থাকতে হলো। অবশ্য সেখানে নদী সার্থের কোনোই অভাব ছিলো না। এখান থেকে কাম্পিল্য, কান্যকুব্জ, অলবিকা, প্রয়াগ-প্রতিষ্ঠান, বারাণসীতে নিয়মিত নৌকা যাতায়াত করছে। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলোর জন্যে এমন ধরনের নৌকা প্রয়োজন ছিলো,

যা আর কোনো সার্থের কাছে না পেয়ে নিজেদেরই তৈরী করিয়ে নিতে হলো।

আমরা জ্যোতিয় শ্রেষ্ঠীর নদী-সার্থে মিলিত হলাম। অনেক সার্থই আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে উৎসুক ছিলো। অনেকে তো এজন্যে আমাদের ভেট দিতেও প্রস্তুত ছিলো। সতেরো জন ধনুর্ধর, আবার তাদের মধ্যে অধিকাংশই অশ্বারোহী—তাদের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যে-কোনো সার্থের পক্ষে কম লাভজনক নয়। শ্রেষ্ঠী জ্যোতিয়র সর্বার্থক ভীম খুব চতুর এবং বহুদেশদর্শী লোক। সে শুধু পূর্ব, পশ্চিম সমুদ্রে নয়, কতো দূর দূর দ্বীপেও গিয়েছে। গান্ধারেও আমরা তাকে দেখেছি। তার বিশাল তরণী গান্ধার আর তুষার প্রদেশের অজস্র দ্রব্যসম্ভারে ভরা। তার মধ্যে উত্তর কুরুর কাদলী মৃগের চর্মও ছিলো। সেইসব বহুমূল্য জিনিস কেবল মগধ বা সুহ্মের জন্যেই নয়, সুবর্ণভূমি [বর্মা], এমন কি সমুদ্রের [বঙ্গোপসাগর] অন্যান্য দ্বীপেও যাবে।

ভীমের কাছে মগধ সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারলাম। রাজা বিম্বিসার আবার সৈন্যদলকে প্রস্তুত করছেন। উত্তরাপথ [পঞ্জাব] থেকে হাজার হাজার ঘোড়া তিনি কিনেছেন। অবশ্য কোন দেশের ওপর আক্রমণ হবে, তা ভীম বলতে পারলেন না। সমগ্র জম্বুদ্বীপ [ভারতবর্ষ], এমন কি সাগরপারেও জ্যোতিয় শ্রেষ্ঠীর বাণিজ্য-দূত রয়েছে। এইজন্যেই বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরে যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট খবরাখবর রাখেন। কারণ বাণিজ্যও তো দেশের শান্তি-সমৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। এঁরা অবশ্য এ খবর রাখেন যে, কোশল এবং বৎসের রাজা আর লিচ্ছবি-গণও সেনা প্রস্তুত করছে। লিচ্ছবির নাম শুনেই আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ করতে লাগলো। বিম্বিসার কি লিচ্ছবিদের কাছে পরাজয়ের কথা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো?

নদী-সার্থের সুবিধা হলো—বলদের ঝামেলা নেই বলে তাদের ঘাস দানা জোগাড় করতে ব্যস্ত হতে হয় না, আর শকটের মতো ঢিমে-তালে চলতেও হয় না। গঙ্গার স্রোতে নাব্য অঞ্চলে যেতে গেলে, এমনিতেই নৌকার গতি হয় দ্রুত; তার ওপর এখন তো সুবাতাস বইছে। সুতরাং পালের সাহায্যে আমাদের তরী আরো জোরে ভেসে চললো। আমাদের ঘোড়ার জন্যে শুক্‌নো খাদ্যের অভাব ছিলো না। কখনো কখনো কোনো জঙ্গলের ধারে কাঠ সংগ্রহ করতে সার্থ তরী বাঁধতো। সেই সময় আমরা আমাদের ঘোড়াকে খানিকটা ছুটিয়ে নিতাম আর কিছু শিকারও করতাম। সামান্য কয়েক কার্ষাপণ খরচ করলেই রোজ নাবিকদের কাছে মাছ পাওয়া যেতো। জ্যোৎস্না থাকলে দিনরাতই নৌকা চলতো, অন্ধকার রাত্রে তীরের কাছে

লঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করতে হতো। সুরার সঙ্গে খাবার জন্যে এই সময় মশাল জেবলে মাল্লারা মাছ ধরতো। কাম্পিল্য, কান্যকুব্জের মতো মহাতীর্থে জ্যোতিয়র বাণিজ্য-ঘর ছিলো। এইসব জায়গায় সার্থদের জিনিসপত্র ওঠানো নামানো হতো। তাই দু'একদিন অপেক্ষা করতে হতো। এই সময় ঘুরে ঘুরে আমরা নগর দেখতাম। কিছু জিনিসপত্র বেচে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস কিনতাম।

শীতকালের মাঝামাঝি তখন। রোহিণী কিন্তু বলতো —এখানে শীত তক্ষশীলার চেয়ে কম। রোহিণী প্রাচীর নগরগুলিতে সমৃদ্ধ পণ্যবীথি [বাজার], চমৎকার প্রাসাদ, সুন্দর ক্রীড়া-উপবন ইত্যাদি দেখে খুব খুশী হতো। আবার চণ্ডাল, দাস, কর্মকর [বেতনভুক্ ভৃত্য] প্রভৃতির জীর্ণ-শীর্ণ কুটীর আর দীন-হীন অবস্থা দেখে বড়োই ক্ষুব্ধ হতো। এখন সে বুঝতে পারছিলো —দাস-প্রথা কতোখানি ক্রুর হতে পারে, দারিদ্র্য কতো অসহ।

কান্যকুব্জের রাজোদ্যানে আমরা গিয়েছিলাম। উদ্যানের মাঝখানে ফোটা পদ্মে সুশোভিত অপূর্ব এক পুষ্করিণী। তাতে হংসমিথুন কেলি করছে। চারিদিকে স্থলপদ্ম, জাতি, যূথী ইত্যাদি নানাবর্ণের গন্ধপুষ্পের কেয়ারি। মাঝে মাঝে সবুজ কন্দুক-ভূমি [বল খেলার মাঠ]। সেখানে তরুণীরা কন্দুক ক্রীড়ায় [বল খেলায়] অথবা রহস্যালাপে মগ্ন। কুণ্ডল ছাড়া রোহিণীর সর্বাঙ্গে আর কোনো ভূষণ ছিলো না। তার কাপড়-চোপড়ও সাধারণ নাগরিকের মতোই ছিলো। কিন্তু গান্ধার-রমণীর অপূর্ব রূপশ্রীও তো সেই সঙ্গে তার ছিলো, যার ফলে সহসা সকলের দৃষ্টি পড়তো তার দিকে। কান্যকুব্জের সেই রাজোদ্যানে পঞ্চালের রাজকন্যা নিজের সহচরীদের নিয়ে সেই সময় এসেছিলেন। নিজের সখীর কাছে রোহিণীর কথা শুনে আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। আমি তখন একখানা মর্মর-প্রস্তরে বসে পুষ্করিণীর শোভা দেখছিলাম। রাজকন্যাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। রাজকন্যার এক সখী এসে আমাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলো। আমি রোহিণীকে তার সঙ্গে যেতে বললাম।

তারা দু'জনেই পরস্পর মিলিত হবার শিষ্টাচার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। রোহিণী যে-কোনো মেয়েকে নিজের সমান মনে করেই কথাবার্তা বলতে পারে। রাজকন্যা নিজের সমবয়স্কাদের সঙ্গে পরিজন-এর [অধীনস্থ] মতো মিশতেই অভ্যস্ত! কিন্তু রোহিণীর রূপ দেখে রাজকন্যা তাকেও ভুল করে রাজকন্যা ভেবেছিলেন। তাই রোহিণীর 'স্বাগত' জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বললেন —স্বাগত রাজকুমারী।

আমি কিছুটা দূরে সরে গিয়ে ওদের দেখছিলাম। পরে রোহিণীর মুখে

তাদের কথাবার্তা যা হয়েছিলো, সব শুনেছিলাম। এখানে সেই আলাপ কিছুটা তুলে দিচ্ছি—

রাজকন্যা —সখী, তোমাকে এ দেশের বলে মনে হচ্ছে না। তাই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি, তাহলে ক্ষমা করো।

রোহিণী —না রাজকুমারী। এ কথা মনেও এনো না। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

রাজকন্যা —উনি তোমার কে ?

রোহিণী —আমার পতি।

রাজকন্যা —তোমার জন্মভূমি কোথায় ?

রোহিণী —গান্ধার দেশের তক্ষশীলা নগরী।

রাজকন্যা —আমার ঠাকুমাও গান্ধারদেশীয়া ছিলেন। তোমার নামটা কি বলবে ভাই ?

রোহিণী —রোহিণী। তোমার ?

রাজকন্যা —বিদ্যা। হ্যাঁ সখী, লতাকুঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ? আমি তোমার পতিকেও ওখানে আমন্ত্রণ করছি। আমি নিজে গান্ধারের অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে চাই।

—আমার পতিকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। —বলে রোহিণী আমার কাছে এলো। আমাদের তখন যথেষ্ট অবসর ছিলো, কাজেই দুপুরটা লতাকুঞ্জে কাটাতে আপত্তির কোনো কারণ ছিলো না।

আমরা দু'জনেই সেখানে গেলাম। রাজকন্যার সারা দেহ অলঙ্কারে মোড়া। তার কানে মণিখচিত বড়ো বড়ো কুণ্ডল, যার ভারে কান কাঁধের কাছে ঝুলে পড়েছে। গলায় তার মহার্ঘ হার—তাতে সারা বক্ষস্থল ঢাকা পড়েছে। কোমরে কয়েক প্যাঁচ মুক্তাখচিত মেখলা। হাতে অনেকগুলি কঙ্কণ আর চুড়ি থাকায় কনুই পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। মাথায় চূড়া আর শিরোভূষণ দিয়ে কালো কালো চুলগুলিকে সাজানো হয়েছে। পায়েও রুমুঝুমু শব্দকারী পাদভূষণ [তোড়া-জাতীয় অলঙ্কার]। আমাদের বৈশালীতেও অলঙ্কারের চলন আছে খুব। কিন্তু এতো অলঙ্কার ওখানেও দেখিনি। অলঙ্কারের ভারে রাজকন্যার চলাফেরা করাই মুশকিল।

কাছে যেতেই রাজকন্যা বললো —স্বাগত অতিথি। আশা করি মধ্যাহ্ন-টুকু সপত্নীক আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। আমার অবসর আছে।

রাজকন্যা —আপনারা কি কিছুদিন কান্যকুব্জে [কনৌজ] অবস্থান করবেন না ?

—না রাজকুমারী। আমরা নদী-সার্থের সঙ্গে মগধের দিকে চলেছি। শুধু আজকের দিনটা আছি।

—তবে আপনি মগধের রাজকুমার ? সখী রোহিণী গান্ধার-রাজকুমারী ?

রোহিণী—না রাজকুমারী। আমরা রাজকুমার-রাজকুমারী নই। আমরা ক্ষত্রিয়। আমার স্বামী বৈশালীর ক্ষত্রিয়-কুমার। তক্ষশীলা থেকে বিদ্যাধ্যয়ন করে আমাকে নিয়ে ফিরছেন।

কথা বলতে বলতে আমরা লতাকুঞ্জে পৌঁছে গেলাম। সেখানে দাসীরা আসন বিছিয়ে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করছিলো। আমি আসনে উপবেশন করলাম।

রাজকুমারী বললো—রাজকুমারী হলে কি হবে, আমিও ক্ষত্রিয়। আচ্ছা সখী রোহিণী—তুমি এতো সুন্দর যে তোমার কোনো ভূষণের প্রয়োজনই নেই এটা বুঝি। কিন্তু তা বলে হাতে একটা কঙ্কণও পরোনি কেন ?

—ভূষণ আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে রাজকুমারী। —নিজের হাত এবং তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কর্কশ গাঁটগুলো দেখিয়ে রোহিণী উত্তর দিলো —আমাকে ধনুক টানতে হয়, খড়্গ-চালনা করতে হয়। ক্ষেত এবং উদ্যানেও কাজ করতে হয়! এই অবস্থায় ভূষণ আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

রাজকুমারী রোহিণীর হাত দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো। কারণ তার ধারণা ছিলো, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য হলো শিরীষ কুসুমের মতো। তা সামান্য রোদে, একটু জোর বাতাসেই ঝরে পড়ে। রোহিণীর কর্কশ হাত-খানিকে নিজের কোমল হাতের মধ্যে নিয়ে সে বললো—তোমাদের ওখানে কি রাজকুমারীদেরও এমন কঠোর শ্রম করতে হয় ?

—আমি রাজকুমারী নই, তক্ষশীলার ক্ষত্রিয়-কুমারী।

—কিন্তু তোমার কথার ভঙ্গীতে, তোমার নির্ভীকতায় স্পষ্ট বোঝা যায়, তুমি রাজকুমারী।

—তার অন্য কারণ আছে রাজকুমারী। গান্ধারে কেউ রাজা নয়; কেউ দাস-দাসী নয়। ওখানে সবাই ক্ষত্রিয়, সবাই সমান।

—কিন্তু আমার ঠাকুমা তো গান্ধারের রাজকন্যা ছিলেন।

—এখানে এসে নিজের ঐ পরিচয়ই হয়তো দিয়েছেন। আমাদের ওখানে গণ-এর রাজ্য। আমরা আমাদের ওপর কখনো রাণী বা রাজকুমারী দেখিনি। —তাই আমরা সমবয়স্কা অন্য যে-কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে শুধু সমান সমানের মতো কথাবার্তা বলতেই জানি!

এ কথা শুনে রাজকুমারী শুধু বিস্মিত হলো না, তার অবিশ্বাসও হতে লাগলো। কিন্তু রোহিণীর সুনীল নেত্রতারকায় সত্যের জ্যোতি ফুটে উঠেছিলো।

এই সময় ভোজন পর্বের উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হয়েছিলো। রাজকুমারী আমাদের তার কাছে আহ্বান করলো। পঞ্চাল প্রাচীন রাজবংশ। অবশ্য আজকাল সুরসেন [বজ্র] আর বৎসের [এলাহাবাদ কমিশনারী] দাপটে তার প্রভুত্ব অনেকটা খর্ব হয়েছে। তবু এখনো কুরু-পঞ্চাল রাজবংশের রাজসিক চালচলন অপর রাজারাজড়ার কাছে আদর্শ বলেই মনে হয়। পঞ্চালের রাজ-ভোজন খুবই বিখ্যাত। খাবার সময় আমরা তার খুব প্রশংসাও করলাম বটে, কিন্তু আমার আর রোহিণীর বিশেষ পছন্দ হলো না।

ভোজনের পর রাজকুমারী নিজে সখীদের কাছ থেকে বীণা নিয়ে গান গেয়ে শোনালেন। রোহিণীও তাতে যোগ দিলো। কিন্তু যখন নৃত্যের কথা উঠলো, তখন সময়াভাবের অজুহাতে বিদায় নিলাম। কিছুক্ষণ রাজ-কুমারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে রাজান্তঃপুরচারিণীদের প্রতি রোহিণীর শ্রদ্ধা তো বাড়েইনি, বরং একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলো।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর রোহিণীকে বলতে শুনলাম—এও দেখছি সরস্বতীর মতো মহিষ হয়ে দাঁড়াবে।

—কেন? —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ষোলো-সতেরো বছর বয়েসেই ওর চিবুকের নীচে কি-রকম মাংস জমেছে দেখোনি? আর ওর অলঙ্কারের বোঝা দেখে তো আমার ভয় হয়ে গিয়েছে। এতো বোঝা? আমার মনে হয়, যদি রাজকুমারী কিছুটা শ্রম করতো, কিছুটা মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতো, তাহলে সে কুরূপা হতো না। কিন্তু চোখের কোণে এই কালি কি বিশ্রীই যে লাগলো।

—তাহলে আজ তো রাজকুমারী দেখা হলো রোহিণী?

—হ্যাঁ দেখেছি, আর সাধও ঘুচে গেছে। আমাদের গান্ধারকন্যার ফুঁয়েই রাজকন্যা উড়ে যাবে, এমন চেহারা।

—ফুঁয়ে উড়ে যাওয়া কথাটা তো রাজকন্যার কাছে একটা মস্ত প্রশংসা!

—কিন্তু তাতে নারীত্ব কলঙ্কিতই হয়।

—রাজাদের তো আর নারীত্বের প্রয়োজন নেই, তাদের প্রয়োজন খেলার পুতুল। আর তাও একটা হলে হবে না।

—একটার বেশী?

—হ্যাঁ, শত শত—তাদের হাতে রোজ নতুন নতুন খেলনা চাই।

—তবে এদের কাছে নারীত্বের মূল্য নেই?

—মূল্য নেই কে বললে! দেখলে না, রাজকন্যার গায়ে কি রকম অলঙ্কারের বোঝা।

—ওই বোঝা দিয়ে মূল্য দেওয়া? ও তো রীতিমতো শাস্তি।

—কিন্তু রাজমহিলারা একে শাস্তি বলে মনে করে না।

—তবে কি ওরা সব নির্বোধ ?

—রাজকুমারী বিদ্যাকে তো দেখলে। সে কথা তুমিই বলতে পারো।

—আমার তো রাজকুমারীকে বোকা বলে মনে হলো না। তবে অনেক-গুলো কথা অস্বাভাবিক বলে মনে হলো।

—প্রিয়ে রোহিণী! রাজতন্ত্র নর-নারীর বন্দিশালা। সেখানে রাজার কাছে কোনো মানুষেরই কোনো মূল্য নেই। নারীত্ব সেখানে ক্রীড়া আর কামুকতার সামগ্রী। স্বাধীন মানুষের সেখানে কোনো স্থান নেই।

—প্রিয়! তুমি রাজতন্ত্রকে এতো ঘৃণা করো!

—নিশ্চয়। আমি রাজতন্ত্রকে মনুষ্যত্বের কলঙ্ক বলে মনে করি। আর তার আরো একটা মস্ত কারণ হলো —রাজতন্ত্র আমাদের বৈশালীর শত্রু।

—কিন্তু এই জনপদে কি চিরকাল রাজতন্ত্র চলে আসছে ?

—না। আমি বৃদ্ধ লোকদের কাছে যা শুনেছি, তাতে এটুকু জানি—প্রথমে কুরু, পঞ্চাল, কাশী, কোশল, চেদি, বৎস প্রভৃতি সব জায়গাতেই গণ শাসন ছিলো। পরে মালিক আর দাস, আর্য আর অনার্য, বর্ণসঙ্কর প্রভৃতির মধ্যে যে বিরোধ, তার সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর জননায়ক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে।

—বড়ো বেশী মূল্য দিতে হয়েছে তো!

—হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—তাহলে প্রিয় বুঝতে পারছো, তক্ষশীলাতেও যদি দাস আর মালিক, আর্য-অনার্য, বর্ণসংকর এইসব ভেদভাব থাকতো, তবে সেখানে গণতন্ত্র আর টিঁকতো না।

—বৈশালীর সমস্যা তো আমার সামনেই রয়েছে রোহিণী। আমরা গণ শাসন বজায় রেখেছি, আর তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লিচ্ছবি-কুমাররা সব কিছু সমর্পণ করতে প্রস্তুতও আছে। কিন্তু আমি জানি —আর্য-অনার্য, দাস-প্রভুর ভেদভাব আমাদের পক্ষে ভয়ানক বিপদের হেতু। যখন বৈশালীতে ছিলাম, তখন এ কথা বুঝিনি। বৈশালীর চেয়ে ছোট হলেও তক্ষশীলা-গণ কেন এতো শক্তিশালী —তার কারণ খুঁজতে গিয়েই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

আমরা কথা বলতে বলতে গঙ্গাতীরে পৌঁছালাম। তখন দিবা অবসানের আর এক প্রহর বাকী। সার্থের লোকেরা পণ্যবস্তু নৌকায় তোলা শেষ করে সান্ধ্য-নৃত্য-পান-উৎসবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কেউ শূকর-মাংস আগুনে ঝলসে নিচ্ছে, কেউ মশলা পিষছে। কেউ সুরা-ভাণ্ড সাজিয়ে রাখছে। আমাদের আঠারো জনের সার্থও বড়ো সার্থের কাছে নিজেদের সুরা আর মাংস দিয়ে খাদ্য-পেয় তৈরীর কাজে লেগে গেছে। শুভ লিচ্ছবি

মৃদঙ্গে ওস্তাদ বলে খ্যাত, সে নিজের মৃদঙ্গ ঠিক করছে। সর্বার্থক ভীম নিজের বীণাটির তারগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কপিলকে বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো। সে বললে—বন্ধু! গান্ধারীর জন্যে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে দেখছি।

—বিপদ?

—হ্যাঁ, ভীম সর্বার্থক বলছিলো—রাজা বড়ো বেশী জুলুম করছে। পরধন, পরস্ত্রী অপহরণ করাই তো ওদের ধর্ম। তার ওপর রোহিণীর মতো নারীরত্ন।

—রত্ন! উগ্রমূর্তি ধারণ করে রোহিণী বলে উঠলো—আমি নির্জীব রত্ন নই। কোনো কামুক রাজা আমার দিকে নজর দিলে নারীত্ব কাকে বলে তা আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

—হ্যাঁ রোহিণী। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভীমের এই কথা শুনে একদিকে যেমন রাজার ওপর ঘৃণা হচ্ছিলো, তেমনি আবার তোমাদের দেরী দেখে দুশ্চিন্তাও হচ্ছিলো।

রোহিণী—হ্যাঁ, কিছুটা দেরী হয়ে গেছে বটে! তবে আমরা স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়েছিলাম।

কপিল—স্নেহডোর? পঞ্চালের রাজধানী এই কান্যকুব্জে? কোনো বৈশালী বা তক্ষশীলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো না-কি?

— বন্ধু নয়, ভাই কপিল। কপিলের কাঁধে হাত রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে রোহিণী বললো—আমি রাজকুমারী দেখছিলাম।

—রাজকুমারী দেখছিলে! কোনো বিচিত্র জন্তুর মতো দেখলে না-কি?

—বিচিত্র জন্তুর চেয়েও বিচিত্রতর। কিন্তু তার ওপর আমার করুণাই হচ্ছিলো।

—করুণা!

—হ্যাঁ ভাই। আমাদের তক্ষশীলার কুমারীদের মতো তার মধ্যে সজীবতা নেই। তাকে গয়নায় মোড়া পুতুল বলে মনে হচ্ছিলো। সে যেন আশ্রয়-তরুহীন লতার মতো নিরাশ্রয়া—তাই তাকে দেখে দয়া হচ্ছিলো!

—তবে আমাকে নিয়ে গেলে না কেন? আমি তার আশ্রয় হতাম, আর তোমাকেও করুণা প্রকাশের কষ্টটা স্বীকার করতে হতো না। —কপিল হাসতে হাসতে বললো।

রোহিণী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো—ঠাট্টা করো না কপিল ভাই। নারীত্বের এই নিরীহ অবস্থা, তার এই বুদ্ধিহীনতা দেখে আমার খুব দুঃখই হলো।

কপিল রোহিণীর কেশগুচ্ছ নিয়ে ক্রীড়া করতে করতে বললো

—নারীত্বের অপমান আমিও দেখেছি রোহিণী। পার্শ্ব [ইরাণ], ববের্ [ব্যাবিলন] এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোতে নারী কামুকের ক্রীড়ার বস্তু বলেই বিবেচিত হয়। নারীর সম্মান ঠিক নারীর মতোই আছে শুধু গণগুলিতে।

সেদিন রাজকন্যার অবস্থা দেখে রোহিণীর সত্যিই খুব দুঃখ হয়েছিলো। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে সকলের সঙ্গে ছিলো বটে, কিন্তু নৃত্য-গীতের সময় মাথা ধরায় আমি তাকে নিয়ে নৌকায় চলে গেলাম। কিছুক্ষণ ধরে গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে মাথা ভেজানোর পর তার কষ্টটা কমলো। অতঃপর চারিদিকে বিস্তৃত দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে গঙ্গার শ্বেতধারায় অপেক্ষমাণ নৌকার ওপর শায়িতা রোহিণীর পাশে উপবেশন করে আমি তার মনকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু মাঝে মাঝেই রাজকুমারীর কথা তার মনে পড়তে লাগলো, আর সে বলে উঠছিলো —বেচারী অবোধ বালিকা! আমার কর্কশ হাত দেখে সে যেন গলেই গেলো। ওর ধারণা, রূপই নারীর সম্বল। ধিক্।

—ধিক্ তো বটেই, কিন্তু এতে মেয়েদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। ওদেরও যদি মহাসিন্ধুর তটে পার্শ্ব বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হতো, তবে ওরাও গান্ধার-কন্যাদের মতো বীরাঙ্গনা আর আত্মনির্ভরশীল হতো।

—কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধিটা তো আছে! তারা তো রূপের ভালো-মন্দটা বুঝতে পারে?

—বুদ্ধি তো রাজার হাজার হাজার প্রজারও আছে। কিন্তু তারা কি রাজার হাতের কাঠের পুতুল হয়ে নেই?

এইসব কথাবার্তায় তার মন চঞ্চল হচ্ছে দেখে তার মন অন্যদিকে পরিবর্তনের জন্যে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম —প্রিয়ে, আমরা এখন তক্ষশীলার চেয়ে বৈশালীর অনেক কাছে আছি।

—কাছে? তুমি তো আট মাসে তক্ষশীলায় পৌঁছেছিলে।

—কারণ আমি স্থলপথে গিয়েছিলাম। দু'মাসের বেশী আমরা তক্ষশীলা ছেড়েছি। আমার মনে হয়, এক মাসের মধ্যে বৈশালীতে পৌঁছে যাবো।

—এতো শীগ্‌গির?

—নিশ্চয়। আমাদের নৌকা খুব জোরে দিনরাত চলছে।

—মাসখানেক পরেই আমি মা আর বৈশালীকে দেখতে পাবো?

—তা তো দেখবেই। সোমাকেও দেখবে। আমি বিয়ের সময় মা-র কাছে তোমার কথা লিখেছিলাম। কিন্তু তিনি সে চিঠি পেয়েছেন, তার ঠিক কি?

—তাহলে আমি যখন সোজা দরজায় গিয়ে হাজির হবো, তখন মা কি বলবেন?

—এমন সোনার শনুষা [পুত্রবধূ] পেয়ে মুখে কথাই জোগাবে না। কিন্তু এমন হবে না প্রিয়ে! গঙ্গা আর মহীর [গণ্ডকা] সঙ্গমে পেঁৗছেই আমাকে বৈশালীতে খবর পাঠাতে হবে। আমাদের সঙ্গে তক্ষশীলার যে নাগরিক-মণ্ডলী চলেছেন, তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে লিচ্ছবিদের সময় দিতে হবে তো।

—তবে কি আমরা গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করবো? অন্তত আমাকে আগে যেতে দিও।

—গঙ্গা থেকে বৈশালীতে যাবার দুটি পথ আছে। এক হলো উল্কাচল [গঙ্গার বাম তটে একটি জায়গা] থেকে স্থলপথে, অপরটি হলো মহী থেকে বৈশালীর কাছাকাছি গিয়ে আবার স্থলপথে। কিন্তু এই দ্বিতীয় পথে সময় কিছু বেশী লাগে।

—আমরা আঠারো জন লোক, অথচ আমাদের বারোটা ঘোড়া আছে।

—সেজন্যে কোনো চিন্তা নেই প্রিয়ে। উল্কাচলে আমরা আরো ছ'টা ঘোড়া জোগাড় করতে পারবো। আর উপহার-দ্রব্যগুলো বইতেও দশটা ঘোড়া চাই। তাহলে আমাদের দরকার ষোলোটা ঘোড়া। তা সহজেই পাওয়া যাবে।

—তবে পথে এতো দেরী হবে কেন প্রিয়?

—নাগরিক-মণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্যে। তোমারই বা এতো তাড়া কিসের রোহিণী?

—মাকে আর সোমাকে আমি তাড়াতাড়ি দেখতে চাই।

—কিন্তু আমি যাত্রাপথে বজ্জী দেশের সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবো। পাঁচ-ছ'দিন পথে যা আমাদের দেরী হবে, তার মধ্যে তুমি বজ্জীর আম আর কলার সুন্দর বাগান দেখবে। আমি তোমাকে গোপালদের গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাবো। হরিণ আর ময়ূর শিকার করবো। এই পাঁচ-ছ'দিনে তুমি বজ্জীর এতো কিছু দেখতে পাবে যে, বৈশালী তোমার কাছে পরিচিত মনে হবে।

—আমি অপরিচিতের মতোই যেতে চাই। তাতে অনেক বেশী আকর্ষণ থাকে।

রোহিণীর শিরঃপীড়া এখন জানি না কোথায় পালিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। আমি ওর ওষ্ঠ চুম্বন করে বললাম —তাহলে প্রিয়ে, তুমি আমাকে ছেড়ে আগে যেতে চাইছো?

—তোমাকে তো নাগরিক-মণ্ডলীর সঙ্গে নানান কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে।

—আর তোমাকে বুঝি তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না?

—এখন আর তা হয় না মশাই।

—কিন্তু রোহিণী, আমার ইচ্ছা ছিলো —আমরা দু'জনে একসঙ্গে মায়ের কাছে যাবো। আমি আমার ঘোড়া শুভকে দিয়ে দেবো। তোমরা দু'জনে দ্বিতীয় দিনেই বৈশালীতে পেঁছে যাবে।

—হ্যাঁ প্রিয়তম। —বলে উঠে বসে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রোহিণী বললো —আমি আগে গিয়ে আমাদের একখানি ঘর তৈরী করাবো।

—ঘর তো মায়ের ওখানেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রিয়ে, আমাকে নিজের ঘর তৈরী করতে হবে —পিতার ঘর।

—পিতৃগৃহ ?

—হ্যাঁ, আমি আসার সময় সেটা খাড়া ছিলো। মা দেখাশোনা করতেন। বৈশালীর বাইরে আমার একটা কর্মান্তও আছে।

—আর বাগানও আছে —না ?

—আছে। আমের বাগান —আমার কর্মান্ত-ভূমিতেই। আমার বাবা খুব ধনী ছিলেন না।

—বাবা ধনী নয় বলে কি তোমার খুব দুঃখ হয় প্রিয় ?

—মোটেই না। বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আর তিনি ধনী না হয়ে ভালোই হয়েছে। তার ফলে আমি সাহসী আর কষ্টসহিষ্ণু হতে পেরেছি।

—তবে আমাদের নিজেদের ঘর দেখতে হবে, কর্মান্ত আবাদ করতে হবে ?

—আর বৈশালীর সেবার জন্যে প্রস্তুতও হতে হবে।

—তবে কি তুমি স্থির-নিশ্চয় যে বিম্বিসার বৈশালী আক্রমণ করবে ?

—বৈশালীকে পরাস্ত না করলে মগধ এক পা-ও এগোতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, কেবল বৈশালীর জন্যেই তাদের যুদ্ধের আয়োজন।

—তবে তো আমরা ঠিক সময়েই পেঁছেছি।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—তাহলে আমাদেরও খড়্গধারণ করতে হবে তো ?

—হয়তো তারও প্রয়োজন হবে। তবে লিচ্ছবি-নারীরা বড়ো একটা অস্ত্রধারণ করে না। এদিকের রাজারা বিশেষ করে স্ত্রীলোকের ব্যাপারে অত্যন্ত নীচ।

—তাই বলে আমাকে পিটারীর [বায়ুহীন একপ্রকার পাত্র] মধ্যে বন্ধ থাকতে হবে না-কি ? —রোহিণীর গলার স্বরে একটা পরিবর্তন দেখা গেলো।

আমি তার মাথাটা আমার কোলে তুলে নিয়ে বললাম —না প্রিয়ে। আমার কথার অর্থ তা নয়। আমি বলতে চাইছিলাম, আমাদের এদিক থেকে হয়তো নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে।

—সেজন্যে আমি প্রস্তুত। আমি শুধু চাই, খড়্গের কালিমা থেকে আমার হাত যেন বঞ্চিত না হয়।

বহুক্ষণ এমনি করে আমরা গল্পগুজব করলাম। তারপর রোহিণী শুয়ে পড়লো। আমি তার গায়ে একটা কম্বল দিয়ে দিলাম।

ভোরবেলা যাত্রা করতে হবে। তাই আমার ভয় হলো, নাবিকরা সকাল অবধি এমনি মাচ-গান চালাবে না-কি। কিন্তু অর্ধেক রাত হতে-না-হতে নাবিকদের মধ্যে অনেকেই নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়লো—তখন তাদের ধরাধরি করে এনে নৌকায় শুইয়ে দেওয়া হলো। আমিও যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—একটা ভীষণ যুদ্ধ চলছে। কাছে যেতে বুঝলাম, লিচ্ছবিরা এ যুদ্ধের একটা পক্ষ। আমি যেন ঘোড়সোয়ার। মহাসিন্ধুর তটে সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে যে হাতিয়ার ছিলো, আজও সেই হাতিয়ার। শত্রুর সৈন্যশ্রেণী ভেদ করে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় লক্ষ্য পড়লো, একটা হাতী এগিয়ে আসছে। হাতীটা বেশ দূরে ছিলো, হঠাৎ তাড়া করে আসতে লাগলো। এতো বড়ো হাতীর ওপর আমার ভল্ল কি পেঁছাবে—এই চিন্তা করছি, এমন সময় দেখি আমার ঘোড়া আর মাটির ওপর নেই। বাতাসে ভর করে উড়ে চলেছে। আমার রশ্মি-সংকেতে ঘোড়া গাছপালার ওপর দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। আমি সোজা হাতীর ওপর পেঁছে গেলাম! হাতীর ওপর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং দয়া ভিক্ষা করতে লাগলেন। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম—তোমায় একবার পরাজিত করেও ছেড়ে দিয়েছি, এবার আর ছাড়া হবে না। —এই কথা বলে'আমি শল্য চালাতে গেলাম, এমন সময় ঘুম ভেঙে গেলো। তখন চন্দ্র অস্তাচলগামী। আমাদের নৌকা ছাড়ার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে।

গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে বহুদূর পর্যন্ত সবুজ ফসলের সমারোহ। কোথাও কোথাও গোয়ালাদের কুটীর বা জেলেদের বাসগৃহ। কিন্তু এসবের চেয়ে গঙ্গার স্রোতোধারায় ক্রীড়ারত কুমীরদের দেখতে রোহিণীর ভালোই লাগছিলো। চড়ার ওপর পড়ে পড়ে কুমীরগুলো রোদ পোয়াচ্ছে দেখে সে তাকে কাষ্ঠখণ্ড বলেই ভুল করেছিলো। কিন্তু নৌকা কাছে আসতেই যখন তারা জলে নেমে পড়লো, তখন রোহিণীর কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। তারপর আমি যখন তাকে বললাম যে, এই কুমীরগুলো মানুষকে ধরে নিয়ে যায়, তখন সে শিউরে উঠলো।

গঙ্গা-মহীর সঙ্গম দিয়ে একদিন বেলা এক প্রহর থাকতে থাকতেই আমরা উল্কাচলে [হাজীপুরে] পেঁছে গেলাম।

বারো

লিচ্ছবিদের দেশে

উল্কাচলে পেঁাছে আমরা ছ'জন লিচ্ছবি আর রোহিণী —সকলেই খুশী হলাম। শেষ অবধি আমরা তিন মাসের সংকটপূর্ণ যাত্রা শেষ করে আমাদের দেশে —বজ্জীতে পেঁাছে গেছি। তীরে নামতেই শৌল্কিক [কাস্টমস্, চুঙ্গীর অফিসার] এলেন। আমি তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলী এবং উপহার দ্রব্যসমূহের কথা বললাম। লিচ্ছবিটি খুব খুশী হলো এবং আমাকে তখনি সেনানায়কের কাছে নিয়ে গেলো। গঙ্গার ওপারে মগধের সীমান্ত —তাই উল্কাচলে লিচ্ছবিদের সীমান্ত-সৈন্যদল রাখতে হয়। এখানের সেনানায়ক আমার পিতৃবন্ধু রোহণ। তাঁকে দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। তাঁরও চোখ দুটি আমাকে দেখে অশ্রুতে ভরে গেলো। তিনি আমাকে আলিঙ্গন এবং ভ্রূ-চুম্বন করে বললেন —পুত্র, তুমি ঠিক সময়েই এসেছো! এখন বৈশালীর তোমাকে খুবই প্রয়োজন।

নিজের কথা খুব সামান্য মাত্র বলে আমি তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলী এবং তাঁদের উপহারের কথা জানালাম। শুনে সেনানায়ক রোহণ বললেন— পুত্র! আমি বৈশালীতে এখনি লোক পাঠাচ্ছি। দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমার পত্র পেঁাছে যাবে। আমি এখনি চিঠি লিখছি। তুমিও যদি কিছু লিখতে চাও তো লেখো। এই তালপত্র, লেখনী আর মসীপাত্র [দোয়াত] রয়েছে! আর কিছু চাই?

—শকটে করে উপহার-দ্রব্যগুলি আর ঘোড়া দশটাও পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ এগুলো পেঁাছাতে কিছু বেশী সময় লাগবে।

—তাছাড়া অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতেও আমাদের একটু সময় চাই। তক্ষশীলায় আমি নিজে যাইনি, তবু তক্ষশীলা লিচ্ছবিদের কাছে চিরপরিচিত। বংশ-পরম্পরায় আমরা তক্ষশীলাকে দ্বিতীয় মাতৃভূমির মতোই মনে করে আসছি। গান্ধারের গণ-এর নাগরিক-মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জানাবার এই আমাদের সর্বপ্রথম সুযোগ এসেছে। প্রথমে চিঠিটা লিখে ফেলো। তারপর আর যা যা দরকার শুনছি।

আমি প্রথমে একখানি চিঠি লিখলাম আমাদের গণপতি সুনন্দকে। তার-পর আর একখানা লিখলাম মাকে।

উল্কাচল থেকে যোজন যোজন দূর অবধি অশ্বারোহী সর্বদা প্রস্তুত আছে। প্রত্যেকেই অতি দ্রুত তার পরবর্তীকে চিঠিখানা পোঁছে দেবে—সুতরাং চার যোজন পেঁছাতে আর কতোটুকুই বা সময় লাগবে?

সেনানায়ক তাঁর পত্রখানিতে একটু বিস্তৃত বিবরণই দিলেন। তারপর তালপত্রখানিতে নিজের মোহর অঙ্কিত করে, মুড়ে সুতা দিয়ে বাঁধলেন এবং জোড়ের মুখে কোমল মাটি লাগিয়ে মুদ্রাঙ্কিত করে সংবাদবাহকের হাতে দিয়ে তাকে বৈশালী যাত্রার আদেশ দিলেন।

কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বললেন—আগে তোমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজের ব্যবস্থা করি। ক'জন লোক আছে?

—নাগরিক-মণ্ডলীর দশ জন, তাদের সেনানায়ক কপিল এবং শুভ প্রভৃতি পাঁচ জন লিচ্ছবি-পুত্র যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে ফিরেছে। আমি আর আমার স্ত্রী রোহিণী—

—তোমার স্ত্রী! আমার পুত্রবধূ! বলেই তিনি আমাকে আর একবার গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন—বৎস! তুমি তক্ষশীলা আর বৈশালীর সম্বন্ধকে আরো দৃঢ় করেছো। যাতে আমাদের এই ষাট যোজন দূরের সম্পর্ককে কেউ ছিন্ন করতে না পারে, আমাদের এখন সেই চেষ্টাই করতে হবে। তোমার কাকীকে ঘরে বধূর বিশেষ অভ্যর্থনা করতে বলে দিচ্ছি। আঠারো জনের জন্যে আজ ওদন [ভাত] আর শূকর-মার্দব [বাচ্চা শূকরের মাংস] করলে কেমন হয়?

—খুব ভালোই হয় কাকা।

—দশটা ঘোড়ার দশ জন সহিস চাই। আর ক'টা গাড়ী?

—পাঁচটা হলেই হবে।

—তাহলে পাঁচটা গাড়ী আর পাঁচ জন গাড়োয়ান। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আমার নিজের সারথিকে পাঠাচ্ছি। আজানীয় [শ্রেষ্ঠ জাতির] সৈন্ধব ঘোড়া এতো দূর তো বড়ো একটা আসেই না।

—তার ওপর এগুলো তক্ষশীলারও অসাধারণ [আজানীয়] ঘোড়া।

—গাড়ীর সঙ্গে আমি সেনানী তিষ্যকে পাঁচ জন সৈন্যের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। চড়বার জন্যে ঘোড়া বা রথ যা চাইবে, তাই যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এখনি সেনানী তিষ্যকে বলে আসছি নৌকা থেকে ঘোড়া আর জিনিসপত্র নামিয়ে যতো শীঘ্র সম্ভব বৈশালী রওনা হতে। তুমি তোমার কাকীমার সঙ্গে দেখা করো। তারপর আমাদের দু'জনকেই অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে যেতে হবে।

সেনানায়ক এই কথা বলে সূপকারকে আদেশ দিতে চলে গেলেন। আমি 'কাকী' বলে ডাকতে ডাকতে অঙ্গনের দিকে চললাম। সিংহের আগমনবার্তা

দাসী আগেই দিয়ে রেখেছিলো। আমার আওয়াজ পেয়েই কাকীমা ছুটে এলেন এবং আমার ললাটে চুম্বন করে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন —পুত্র! কতোদিন হলো তোমার কোনো খবরই পাইনি। অল্পদিন আগে গণ-সমজ্যা [মহোৎসব] উপলক্ষে বৈশালীতে গিয়েছিলাম। তখন মল্লিকা বোন বিষণ্ণ মুখে বলছিলো, সিংহের কোনো খবরই পাচ্ছি না। প্রায় বারো বছর হলো তুমি দেশ ছেড়ে গেছো পুত্র।

—না কাকী। দশ বছর।

—আচ্ছা, দশ বছরই না হয় হলো। এক যুগ তো বটে! সোমাও খুব কান্নাকাটি করে। তোমাকে জানাবার অবকাশ হয়নি বৎস। এখন বোন মল্লিকার মেয়েটি [সোমা] আমার পুত্রবধূ। শূরসেন আর সোমা এসে যখন আমার কাছে বিবাহের অনুমতি চাইলো, তখন আমার ও তোমার কাকার যে কী আনন্দই হয়েছিলো! শূরসেন আর সোমাকে তুমি বৈশালীতে দেখতে পাবে। কিন্তু পুত্র, তোমার মুখ বড্ড শুকনো মনে হচ্ছে! ও কালী! আমার ছেলের মুখ শুকিয়ে গেছে দেখছিস্ না। যা, মধুগোলক [নাড়ু] আর গরম দুধ—

এর মধ্যে কাকা পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললেন —ছেলেকে তো মধুগোলক খাওয়াবে, কিন্তু বৌয়ের শুকনো মুখের কথাটাও তো চিন্তা করতে হয়।

—বৌ! হ্যাঁ বাবা, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ, ছেলে বিয়ে করে বৌ নিয়েই ফিরেছে। আর আমরা দু'জনে এখন চললাম। ঘাটে গিয়ে বৌ আর ষোলো জন অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন করে আনতে হবে। আমি সুনিয়কে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি। কিন্তু বৌ তো তোমারই সুকুলা। ঘরে বৌয়ের আদর-যত্নের ব্যবস্থা করো। এসো পুত্র, ওরা সব ঘাটে অপেক্ষা করছে। শৌল্কিক তাদের হয়তো বসার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে।

আমরা দু'জনে সেনানায়কের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘাটে গেলাম। দেখলাম, শৌল্কিক ষোলো জনকে নিজের সুন্দর খড়ে-ছাওয়া কুটীরে বসিয়ে মধুগোলক আর দুধ খেতে দিয়েছে। অপরদিকে সেনানী তিষ্য নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে গাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করছে। ঘোড়াগুলো মহানন্দে তীরে নেমে সবুজ ঘাস খেতে শুরু করেছে।

সেনানায়ক বললেন —তুমিই ফাঁকি পড়লে দেখছি বৎস! ওদিকে কাকীর কাছেও জলযোগ করা হলো না, আবার এদিকে শৌল্কিক মনোরথের নেমন্তন্নটাও বাদ গেলো!

—না আর্য ! শৌণ্ডিক মনোরথ সেনানায়কের কথা শুনে বলে উঠলো —বৌকে ভামা ভেতরে নিয়ে গেছে। স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের পক্ষপাতিত্বের কথা তো জানেনই। আয়ুষ্মান্ সিংহকেও সেখানেই যেতে হবে।

—তাহলে বেচারী সুকুলার মধুগোলক আর দুধ পড়েই থাকবে ! আচ্ছা পুত্র, তুমি ভেতরে যাও। —এই কথা বলে তক্ষশীলার নাগরিকদের দিকে ফিরে সেনানায়ক বললেন —বন্ধুগণ ! লিচ্ছবিদের দেশে তাদের সেনানায়ক রোহণ আপনাদের 'স্বাগত' জানাচ্ছে। আপনারা এই বজ্জী-ভূমিকে গান্ধার-ভূমি বলেই মনে করবেন। এখানে আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো ?

দুগ্ধপান শেষ হয়েছে। আমি প্রথমে সেনানায়ক কপিলের পরিচয় দিলাম। রোহণ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এমনি করে বাকী ক'জনের পরিচয় দান এবং তাঁর আলিঙ্গন শেষ হলে তিনি শুভ, প্রভৃতি পাঁচ জন লিচ্ছবি-পুত্রকেও আলিঙ্গন করে ললাট চুম্বন করে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

আমাকে মনোরথ তার ঘরে নিয়ে গেলো। অস্থায়ী পর্ণকুটীর হলেও বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের পায়ের শব্দ শুনেই ভামা ছুটে এলো।

—দেবর সিংহ ! শুভাগমন করো। বৌ তোমার প্রতীক্ষা করছে।

গিয়ে দেখি, দুধ আর মধুগোলক সাজানো রয়েছে। আমরা চার জন আসনে বসলাম। শৌণ্ডিক আমার চেয়ে বছরখানেকের হয়তো বড়ো হবে, সুতরাং ভামা আমাকে দেবর বলে দাবী করতেই পারে। সে আমার গালে নিজের গাল স্পর্শ করে বললো —দেবর সিংহ ! আমি এতোদিন তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। তুমি এলে না। দেখলাম যে ক্রমে বুড়ী হয়ে যাচ্ছি। তখন ভয় হলো এরপর তো আর কোনো লিচ্ছবি ফিরেও চাইবে না। তাই শেষে হার মেনে মনোরথেরই পাণিগ্রহণ করলাম।

—তবু তো সেই ঘরেই এলে বৌদি।

—হ্যাঁ দেবর। স্ত্রী আর বৌদিতে তো তফাৎ নেই কিছু।

রোহিণী কতকটা হতচকিতভাবে চেয়েছিলো। ভামা তার চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করে বললো —বৌ, তোমার হিংসা হচ্ছে। আমি সিংহকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি না। আর যদি তাই চাই, তাহলে তোমাকে ছেড়ে এই বুড়ীকে চাইবেই বা কে ?

এমন সময় আমাদের সেনানায়ক এসে বললেন —আমি অতিথিদের আমার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তবে মধ্যাহ্নভোজনের আগে আমার ওখানে আসা চাই।

রোহিণী জবাব দিতে গিয়ে চুপ করে গিয়েছিলো। আমি তার হাত ধরে

অঙ্গনে নিয়ে এলাম। কাকা দেখেই বুঝে নিলেন সে কে। তিনি রোহিণীর কাঁধে হাত রেখে ললাট চুম্বন করে পুলকিত স্বরে বললেন —কন্যা, তোমার আগমন শুভ হোক। তোমার মা —সোমার শাশুড়ী সুকুলা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বৎস সিংহ, শীঘ্র এসো।

এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এতোক্ষণ খৈ ফোটার মতো বৌদির অবিরাম বাক্যস্রোত বন্ধ ছিলো। আবার তা শুরু হলো —তা বৌ! দোষ দিও না। আমাদের প্রেম এতোদূর এগিয়েছিলো যে, নাচবার সময় সিংহ আমার গালে চুম্বন করেছিলো। প্রিয় মনোরথ! এই গোপন কথা জেনে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না বলেই আশা করি।

—গোপন কথা আর ঘৃণা! লিচ্ছবি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কে কার গালে চুম্বন করেনি শুনি? —মনোরথ উত্তর দিলো।

—তুমি বড়ো উদার মনোরথ।

—এবার বুঝি দেবরকে ছেড়ে স্বামীকে নিয়ে পড়লে ভামা? বৌ কী বলবে!

—বলবে আবার কী! ভাববে, ভামা বেচারী বড়ো দুঃখিনী। তার প্রথম প্রেমিক তক্ষশীলায় পালালো, তারপর আবার দেখা হলো বুড়ো বয়েসে। স্বামীও এমন যে, এতোটুকু মায়া নেই তার।

—বৌদি, আমি বললাম —তুমি বুড়ী হলে কবে? তুমি তো আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, অর্থাৎ রোহিণীর চেয়ে তিন বছরের বড়ো।

—বয়েসে কি হয় দেবর?

—তোমার ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলগুলোও তো তেমনিই আছে। তোমার গালে— একটা চুমু খেতে দাও —বলেই একটা চুম্বন করে নিলাম —হ্যাঁ, তোমার গাল দুটিও তেমনি গোলাপী আর মিষ্টিই আছে। তোমার ঘাড়ও কাঁপছে না, লাঠি ধরেও চলছো না আর দাঁতগুলোও তো পড়ে যায়নি। তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে ভামা বৌদি, যেন কালই তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম।

—তাহলে ছেড়ে যে গিয়েছিলে তা তো স্বীকারই করছো দেবর! আর মনোরথ তো রোজই ছাড়বো-ছাড়বো বলে ভয় দেখায়।

—আমাকে আর কেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছো ভামা! তোমার একগাছি কেশই আমাকে বেঁধে আছাড় দেবার জন্যে যথেষ্ট, এ কথা তো তুমি জানো। বৌ কী ভাববে বলো তো?

—বৌ কী ভাববে? —এই বলে বৌদি রোহিণীকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। —ও আমার ছোট বোন। বলবে বড় বোনের বক্‌বক্ করা একটা রোগ। কি

বলো বৌ ? তোমার সিংহকে আমার আঁচলে —কিংবা আমার স্বামী যেমন বললে —চুলে বেঁধে নেবো বলে তোমার ভয় হচ্ছে না তো ?

—না বোন। —রোহিণী হেসে বললো —তোমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

—উঁহু বৌ, আমার হাতে সিংহকে সঁপে দিও না। শেষে ঠকে যাবে।

—নিজেকেও না বোন ?

—তুমি বড়ো চালাক বৌ। আর আমার কৃষ্ণবর্ণ কেশের চেয়ে তোমার সোনালী কেশ অনেক মূল্যবান।

—সোনার দাম বেশী হতে পারে বোন, কিন্তু লোহার শক্তি বেশী।

—তাহলে তোমার ভয় হচ্ছে বৌ। আর মনে হচ্ছে, আমার কথায় মনোরথেরও ভয় হচ্ছে। ভয় পেয়ো না প্রিয়তম। —মনোরথের গুম্ফশোভিত ওষ্ঠে চুম্বন করে ভামা বলে —আমি তোমাকে আমার কেশের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো। জানো বৌ, মনোরথের ওপর আমার মন বিরূপ থাকার একটা কারণ হলো ওর বড়ো বড়ো গোঁফজোড়া। আমার ঠোঁটে ফুটে যায়। সিংহর গুম্ফহীন ঠোঁট কেমন কোমল দেখো তো !

—আচ্ছা, কালই আমি গোঁফ কামিয়ে ফেলবো।

—দেখলে তো বৌ, আজ নয় —কাল। যুগ পার হয়ে গেলো, ওর কাল আর হয় না। আর সবচেয়ে ওর ওপর আমার রাগ কেন জানো ? কোথায় কোনো সীমান্তে সেনানী হবে, তা নয়, উনি এখানে বসে বাটখারা নিয়ে ওজন করছেন। বলো তো রোহিণী, ওর হাতে খড়্গ শোভা পায়, না দাঁড়িপাল্লা ?

—কিন্তু বৌদি —আমি বললাম, এতে মনোরথের অপরাধ কোথায় ? গণ-এর ইচ্ছামতোই আমাদের হয় খড়্গ, না হয় দাঁড়িপাল্লা ধরতে হয়। লিচ্ছবিরা খড়্গ আর দাঁড়িপাল্লা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে না।

—আমি তো তোমাকে বলছি না দেবর ! দেখো রোহিণী পুরুষ পুরুষের ওপর কি রকম পক্ষপাতিত্ব করে। আমাদের দু'জনকেও এক হতে হবে —নইলে 'জাগা ঘরে চুরি' হতে দেরী হবে না।

—হ্যাঁ বোন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি তোমার দিকে আছি।

ভামা রোহিণীর মুখচুম্বন করে বললো —তাহলে আমাদের জয় নিশ্চয়। আর একটা বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য চাই। এই লিচ্ছবিরা ভারী অহংকারী। লিচ্ছবি-নারীদের লিচ্ছবি-নারী বলে মনেই করে না। আমরা কয়েকজন লিচ্ছবি-কুমারী বলেছিলাম —মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদেরও সৈন্যদলে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু ওরা একটার পর একটা অছিলা করছে।

—হ্যাঁ ভাই মনোরথ, তাহলে মগধের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা আছে? —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—খুব বেশী। লিচ্ছবিরা সকলেই সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন করছে। আমরা বাগমতী আর গঙ্গার তীরের কাছে অনেক মগধের গুপ্তচরকে ধরে বন্দী করেছি। আর তার বদলে বিম্বিসারও আমাদের বেশ কয়েকজন ব্যাপারী নাগরিককে ধরে রেখেছে।

—তবে আমি তো খুব ভালো সময়েই এসেছি!

—নিশ্চয়। আর শীঘ্রই কোনো বৃদ্ধ লিচ্ছবি এখানে শৌল্কিক হয়ে আসছে। আমাকে এবার দাঁড়িপাল্লা ছেড়ে খড়্গ তুলে নিতে হবে।

ভামা নিজের স্বামীর ওষ্ঠ চুম্বন করে প্রসন্ন বদনে জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে প্রিয়তম, আমার কাছে এ কথা গোপন করেছো কেন?

—কারণ তুমি স্ত্রীলোক।

—আমার পেটে কথা থাকবে না, না? দেখলে রোহিণী? পুরুষদের মনের ময়লা কি-রকম দেখলে?

—আমার হার, আর তোমার জিত, ভামা। তুমি কেবল ঠাট্টা করেই যাচ্ছো, কিন্তু আমাকে একবারও সুযোগ দিচ্ছো না।

—প্রথমে ঠাট্টা করতে শেখো মনোরু!

—কার কাছে?

—দূরে যাবার দরকার হবে না। তার জন্যে ঘরেই তোমার ভামা রয়েছে। আচ্ছা, বলো তো—আমাকে এতো বড়ো খবরটা বলোনি কেন? —ভামার দৃষ্টি ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠলো।

মনোরথ হাত জোড় করে বললো—তোমার এ দাসকে ক্ষমা করো দেবী। কিন্তু আমার পদ-পরিবর্তনের খবর মাত্র কিছুক্ষণ হলো এসেছে।

ভামা তাকে পার্শ্বালিঙ্গন করতে করতে বললো—না মনোরথ, আমি কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি! আমার বরং এই আশা আছে, বৈশালীতে গিয়ে লিচ্ছবি-নারীদের খড়্গধারণ করার প্রস্তাবে তোমার প্রতিজ্ঞামতো জোর দেবে। কি করবো রোহিণী? আমরা গণ-সংস্থার সদস্য নই—নইলে ওদের আমাদের প্রস্তাব মানিয়ে তবে ছাড়তাম। সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার পাওয়ার পর আমরা গণ-সংস্থায় আমাদের অধিকার চাইবো। তোমার কি মত রোহিণী?

—আমি তোমার সঙ্গে একমত বোন। কিন্তু প্রথমে খড়্গধারণ সম্পর্কে একটা মীমাংসা করতে হবে।

আমি আর মনোরথ একসঙ্গে বলে উঠলাম—এ ব্যাপারে আমি সাহায্য করবো।

ভামা তার স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললো —আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো প্রিয় ! যুদ্ধের পর কতো লিচ্ছবি-তরুণী নিজের বীরগতিপ্রাপ্ত [পরলোকগত] স্বামীর অপার ভালোবাসার স্মৃতি বুকে ধরে রেখেও অন্য স্বামীর জন্যে সন্তান ধারণ করতে বাধ্য হয়। পতির সঙ্গে পত্নীর যেমন বাঁচার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি করেই তার সঙ্গে মরার অধিকারও থাকা উচিত।

তারপর দেরী হয়ে যাচ্ছে মনে হওয়ায় ভামা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললো —আচ্ছা, চলো রোহিণী ! সুকুলা কাকী সবটুকু রাগ আমার ওপরই ঝাড়বেন। বলবেন, ওই ভামাটাই গল্পের ফাঁদে ফেলে আটকে রেখেছে। দেরী দেখে যদি নিজেই এসে পড়েন, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমরা চার জন পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মনোরথ নিজের কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিলো, তারপর আবার আমরা কাকার বাসভবনের পথ ধরলাম। পথে কালী দাসী আমাদের দেখেই ঘুরে বাড়ীর দিকে চললো। ভামা বৌদি বললো —দেখলে তো, কালী দাসী আমাদের জন্যেই আসছিলো। একটু তাড়াতাড়ি চলো।

দ্বারপ্রান্তে কাকী আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে রোহিণীকে আলিঙ্গন করলেন —মুখের দিকে চেয়ে ওষ্ঠে চুম্বন করলেন। রোহিণীর মুখের আরক্তিম ভাব দেখে মনে হলো, সেও মাতৃস্নেহের আস্বাদ লাভ করছে।

কাকী বললেন —নিজের ঘরে শুভাগমন করো পুত্রী। সোনার মেয়ে ! পথে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা দু'জনে কাকার কাছে যাও। আয় তো ভামা ! —বলে রোহিণীকে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন।

কাকা ঘোড়া দশটা আর শকটগুলো রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের ঘোড়া দুটো অশ্বশালায় বিশ্রাম করছিলো। আমরা কাকার কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি তরুণদের সঙ্গে বসে কি যেন বলছেন, আর মাঝে মাঝে তারা সকলে হেসে উঠছে। আমরা যেতেই কাকা কম্বল-বিছানো মসনদে বসে বসেই বললেন —এসো, এসো ! আমি গতবারের মগধের সঙ্গে যুদ্ধের কথা বল-ছিলাম। বলছিলাম, কেমন করে মাগধীদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, ওদের সেনানায়ক আমাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলো কেমন করে, আর তোমার পিতা অর্জুন কমলা-দ্বারে সমগ্র মগধ বাহিনীকে কিভাবে ঘিরে ফেলে বন্দী করেছিলেন। আমি ছিলাম অর্জুনের উপ-নায়ক [সহকারী]। আমরা জয়ী হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সেনানায়ককে রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক মাগধী বন্দী হত্যা করেছিলো। সেই বন্দীকে অর্জুন বিশেষ স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু সেই কৃতঘ্নের হৃদয় ছিলো অত্যন্ত নীচ।

এদিকে আমাদের কথাবার্তা চলছে, আর ওদিকে বৌয়ের আদর-আপ্যায়ন চলছে কাকীর কাছে। সেই আদর-আপ্যায়নের কথা রোহিণী রাত্রে আমাকে বললো, যখন আমি তাকে বললাম—কি রোহিণী, তুমি সবার আগে বৈশালীতে যেতে চাও ?

—না, এখন আর চাই না।

—কেন ? মতলব বদলে গেলো ?

—সুকুলা কাকীও তো মায়ের মামাতো বোন।

—ও ! একটা নয়, দুটো মায়ের সবটুকু স্নেহ দখল করতে চাও ?

—সত্যি প্রিয়। সুকুলা কাকীর ব্যবহার বড়ো মিষ্টি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি বারবার আমায় চুমু খাচ্ছিলেন, আর আমার মায়ের কথা মনে পড়ছিলো। তিন মাস পরে আজ আবার মায়ের স্নেহের স্বাদ পেলাম।

—তবে তো লিচ্ছবিদের দেশে বারোটা ঘণ্টা যেতে-না-যেতেই মায়া পড়তে শুরু করেছে।

—হবে না কেন ? ভামা বোনটি তো রাতদিন হাসাবার বিদ্যাটি আয়ত্ত করে রেখেছে। আর সুকুলা কাকীও ঠিক আমার মায়েরই মতো। আমি তো ঠিক করেছিলাম, আগে আগে ঘোড়ায় করেই যাবো। কিন্তু এখন কাকীর মেয়ে রথে চড়েই যাবে।

—রথে ?

—হ্যাঁ। কাকী বলছিলেন, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন।

—কবে ?

—যখন তাঁর খুশী। তবে তিনি তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলীর অভ্যর্থনার সময় বৈশালীতে উপস্থিত থাকতে চান।

—তাহলে তুমি এখন কাকীর সঙ্গে যাবে, আর বেচারা সিংহ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে ?

—তোমার হিংসে হচ্ছে না-কি ?

—কাকীর জন্যে ? না। হিংসে হবার কথা মনোরথ ভাইয়ের।

—সত্যি প্রিয়, ভামা বোনটির কাছে তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কাকী ওকে খুব ভালোওবাসেন, আবার ভয়ও করেন।

—ভয় করেন কেন ?

—কারণ কথায় ভামার জুড়ি নেই, আবার কাজকর্মেও তেমনি। এসেই তো শূকর-মার্দবের রান্নাটা সামলালো। তারপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই সন্ধ্যার পান-ভোজন, নৃত্য-গীত ইত্যাদির প্রস্তুতিতে সেই যে লাগলো, তখন থেকে নিজে একটি মুহূর্তের জন্যে যেমন চুপ করে বসে

থাকেনি, তেমনি অন্য কাউকেও বসতে দেয়নি। আর উল্কাচলে যতো তরুণী তো ওর অঙ্গুলি-হেলনে ওঠে বসে। শুধু কালী দাসীকে বলে দিলো —ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসো, কাকীর ঘরে ভামা তোমাদের ডেকেছে। আর অমনি এক ঘণ্টার মধ্যেই উল্কাচলের তরুণী-মণ্ডলী সব হাজির।

দেখলাম, রোহিণীর দেহের সর্বাঙ্গে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তিন মাসের কুষ্মাণ্ডলতা যেমন শ্রাবণের ধারায় পরিসিক্ত হয়, সেও তেমনি উচ্ছ্বসিত।

আমি তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম —প্রিয়ে, লিচ্ছবি-ভূমি তোমাকে আপনার করে নিতে কিছুটা সফল হয়েছে দেখে বড়ো খুশী হলাম।

—কিছুটা সফল হয়েছে? প্রিয়, এ আমার আশার অতিরিক্ত। কান্যকুব্জের রাজকন্যাকে দেখে মনে হয়েছিলো, বোধ হয় এখানে মিলে-মিশে যেতে বছরখানেক সময় লাগবে, আর মনের সঙ্গেও খানিকটা লড়াই করতে হবে।

—কিন্তু এখন?

—একদিনেই পুরো লিচ্ছবি-নারী হয়ে গেছি। বাবা ঠিকই বলতেন —বৈশালী প্রাচীর তক্ষশীলা। এ কথা কেবল কাকী আর ভামাকে দেখে বলছি না। আজ সন্ধ্যায় যতো লিচ্ছবি স্ত্রীলোক এসেছিলো, তারা সবাই কান্যকুব্জের স্ত্রীলোকদের থেকে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাতেই বুঝলাম, বৈশালীতে কান্যকুব্জের হাওয়া লাগেনি।

—তা তো ঠিকই। কিন্তু দাসীদের সম্পর্কে তোমার কি মনে হলো?

—কালী দাসীর মতো যারা, তাদের কথা বলছো?

—হ্যাঁ, আর কাক দাসের মতো দাসদের বিষয়েও বলছি।

—এদেরই তো তোমরা কেনা-বেচা যায় এমন মানুষ [ক্রীতদাস-দাসী] বলো?

—হ্যাঁ।

—দেখে দয়া হয়। এদের মানুষের চেয়ে নীচু বলে ধরা হয়। অথচ মানুষ করার কোনো উপায়ও বোধ হয় নেই, নাহলে এমন মধুরস্বভাব লিচ্ছবিরা কি ওদের জন্যে কিছু করতো না।

—ঠিক বলেছো। এদের জন্যে কিছু করা বড়ো মুশকিল। সংখ্যায় কম হলেও না হয় কিছু করা যেতো, কিন্তু ওরা সংখ্যাতেও যেমন বেশী, তেমনি আবার লিচ্ছবিদের চেয়ে অ-লিচ্ছবিদের দাসের সংখ্যাই অধিক।

—অ-লিচ্ছবি?

—হ্যাঁ, বজ্জীতে লিচ্ছবিদের চেয়ে অ-লিচ্ছবিদের সংখ্যা সামান্য কিছু কম। তাদের মধ্যে শুধু কর্মকরই [কর্মচারী] নেই; ব্রাহ্মণ, গৃহপতি [বৈশ্য] প্রভৃতি অনেক ধনাঢ্য জাতিও আছে। তাদের নাগরিক

অধিকার নেই। যুদ্ধে মরারও ভয় নেই। কিন্তু তারা অনেক জমির মালিক, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য করে —তারা স্বাধীন আর বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপন করে। দাস-দাসীদের মুক্ত করতে গেলে সবচেয়ে বেশী বাধা আসবে তাদের পক্ষ থেকে। আর সেই সঙ্গে আমাদের দেশের দু'দিকে, দক্ষিণে আর পূর্বে মগধের রাজ্য, এ কথাটাও মনে রাখতে হবে। অনেক দাস তো সেখান থেকে স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করেছে।

—আমি ভাবছি, এতো বেশী অ-লিচ্ছবি এখানে এলো কি করে ?

—এটা হলো লিচ্ছবিদের ন্যায়পরায়ণতা আর দয়ার ফল। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন সর্বপ্রথম এই বজ্জী-ভূমিতে এলেন, তখন এখানে শুধু গভীর জঙ্গল ছিলো। তাঁরা গরু-মহিষ পালন করতে শুরু করলেন, সিংহ বাঘ, গণ্ডার-হাতীতে ভরা জঙ্গল পরিষ্কার করে একখানি গ্রাম গড়ে তুললেন। সেই গ্রামের চারিদিক ঘিরে তৈরী করা হলো কাঠের প্রাকার। তারপর জন-সংখ্যা বাড়তে থাকায় সেই প্রাকারের ভেতর আর নতুন কোনো বাড়ীর স্থান হওয়া অসম্ভব হলো। তখন সেই প্রাকার ভেঙে ফেলে আরো বড়ো করা হলো। এমনিভাবে কয়েকবার প্রাকার ভাঙা আর তাকে বিশাল করার জন্যেই এই নগরীর নাম হলো বৈশালী। জঙ্গলে বৈশালীর কর্মান্তিও বাড়তে লাগলো। পশুর সংখ্যাও হলো অনেক। আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তে বীরত্ব অণু পরমাণুতে ভরে ছিলো —আশপাশের রাজাদের মতো তাঁদের জীবন বিলা-সিতায় ভরা ছিলো না। আর তাঁদের ভূমিতে ন্যায় ও সত্যের রাজত্ব ছিলো। শরণাগতকে পরিত্রাণ করা তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই দুর্গত ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং অন্যান্যরা তাঁদের আশ্রয়ে শরণ নিতে এলেন। তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে অভয় দান করলেন, কর্মান্তের জন্যে জমি দিলেন, পশুচারণের জন্যে জঙ্গল উন্মুক্ত করে দিলেন, নিজেদের বাহুবলে তাঁদের বাণিজ্য রক্ষা করলেন। এইভাবে সমৃদ্ধ অ-লিচ্ছবিদের সংখ্যা আমাদের এখানে একত্রিত হয়ে বেশী হয়ে গেলো। শাসন ব্যাপারে তাঁরা আমাদের অধীন বটে ; কিন্তু মগধ, কোশলের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীন এবং বজ্জী দেশকে নিজের বলে ভালোওবাসেন। তাছাড়া কতো কর্মকর পরিবার এখানে এসে বাস করতে শুরু করেছে, তারা বেতন নিয়ে কাজ করে। দাস শুধু লিচ্ছবিদেরই নেই, অ-লিচ্ছবিদেরও আছে আর তাদেরই সংখ্যা বেশী। ওদের প্রচুর অর্থ এই দাসদের পেছনে ব্যয় হয়েছে। এজন্যে দাস-প্রথা তুলে দেওয়া এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তবে দাসদের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে আমরা তাকে দণ্ড দিই। এখানকার দাসকে বজ্জী দেশের বাইরে বিক্রী করা নিষিদ্ধ। বজ্জী দেশের কোনো দাসই বাইরে বিক্রী হতে চাইবে না।

এতেই বুঝতে পারছো, লিচ্ছবিরা তাদের সঙ্গে কতোখানি সদ্ব্যবহার করে।

—হ্যাঁ প্রিয়, আমি লক্ষ্য করেছি, এখানকার সমস্যা গান্ধারের চেয়ে বেশী। গান্ধারে একই বর্ণের লোক, ভাষাও তাদের এক।

—তাই সেখানে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ। কিন্তু এখানে? —দাস এক-রকম, কালো আর অর্ধগৌর কর্মকর আর একরকম, তারপর ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি মিশ্রিত জাতি আছে। সবাইকে আমরা চাইলেও লিচ্ছবি বলা চলে না। তবে লিচ্ছবিদের নবকুলে [নয়টি বংশে] ভেদ-ভাব কিছু নেই।

—ন'টা কুল?

—হ্যাঁ, জ্ঞাতৃ [জথরিয়া], দীর্ঘব [দিঘবহত] ইত্যাদি লিচ্ছবিদের ন'টা কুল আছে। তারা প্রথম পূর্বপুরুষের নয় জন সন্তানের বংশজাত।

—কিন্তু প্রিয়, এতো বিভিন্ন জাতির ভেতর থেকেও লিচ্ছবিদের এমন আর্য-বর্ণ কেমন করে হয়?

—এজন্যে আমাদের খুব কঠোর নিয়ম করতে হয়েছে। আমরা কোনো অ-লিচ্ছবি পিতা বা মাতার সন্তানকে লিচ্ছবি বলে স্বীকার করি না। বৈশালীর অভিষেক-পুষ্করিণীতে কেবল তারই অভিষেক হয়, যার মাতা পিতা দু'জনই লিচ্ছবি। মাঝে মাঝে এর জন্যে নিজের সন্তানের ওপরও নিষ্ঠুর হতে হয়, কিন্তু লিচ্ছবি-রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে সকলেই সব কিছু স্বীকার করে নেয়।

—আমার কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা ভালো লাগে না। সত্যি বলছি প্রিয়! যখন কালীকে 'ওরে কালী' বলে ডাকতে শুনি, তখন শুনতে এতো খারাপ লাগে!

—তাছাড়া ওর নাম কালীও নয়। ওর রঙ কালো বলে ওকে কালী আর দাসকে কাক বলা হয়। আমার এক-একবার মনে হয়, যদি পূর্বপুরুষরা অ-লিচ্ছবি শরণার্থীদের আশ্রয় না দিতেন!

—সেও তো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতাই হতো।

—ঠিক বলেছো! মনে হয়, কালই [ইতিহাস] এ সমস্যার সমাধান করবে। এখন এসব নীরস কথা থাক। আজকের নাচ কেমন লাগলো বলো তো?

—ভামাকে তো সর্বগুণের আধার বলে মনে হয়। তোমার সঙ্গে কোন নৃত্য করছিলো?

—ত্রিপদী।

—ত্রিপদীই বটে! ওর পা, হাত আর কটির গতিতে আমার ঈর্ষা হচ্ছিলো। তুমি এদিকে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছো, কিন্তু ও ডাইনীর আর ছাড়বার নাম নেই!

—ডাইনী !

—আদরের শব্দ প্রিয় ! অবশ্য এখনো ভামার সামনে বলিনি ; কিন্তু ও যে-রকম আমার পেছনে লেগেছে, তাতে ওকে একদিন এই কথাটা শুনতেই হবে ।

—আর ও ডাইনী বলে স্বীকারও করে নেবে । ভামা এক অসাধারণ মেয়ে রোহিণী । কাজেই ঐ অসাধারণ পদবী মেনে নিতে একটুও আপত্তি করবে না । ভামার সৌন্দর্য কি-রকম বলে তোমার মনে হয় ?

—তক্ষশীলার যে-কোনো সুন্দরী ওর কাছে হার মানবে ।

—এটা তোমার পক্ষপাতিত্ব রোহিণী ! তবে ও তিন বছর আগে পর্যন্ত বৈশালীর জনপদ-কল্যাণী [শ্রেষ্ঠ সুন্দরী] ছিলো ।

—জনপদ-কল্যাণী তো বটেই । আর চুলগুলিও কেমন চমৎকার নীল ।

—তেল মাখার ফলে অমন হতে পারে ।

—আমার মাথায়ও তেল দিতে বলছিলো, কিন্তু আমার কেমন চট্‌চটে লাগে ।

—আর সারা বালিশ দুর্গন্ধ হয়ে যায় । তবে স্নানের আগে তেল মেখে রিটে দিয়ে ধুয়ে ফেললে আর কোনো অসুবিধা হয় না ।

—কিন্তু আমার চুল কালো হয়ে যাবে না তো ?

—কালো হলে কিছু ভয় আছে না-কি ?

—ভামার মতো নীল হলে আমার আপত্তি নেই ।

—আমার সোনার প্রতিমা ! —তার হাসিমাখা ঠোঁটে একটা চুম্বন দিয়ে বললাম —এখানে আমাদের আরো কয়েকদিন থাকতে হবে ।

—দিন পাঁচেক তো ? আমি আরো পরিচয় করতে চাই ।

—আর তোমার গান্ধার নাচ-গানের জন্যে 'সাধু সাধু' [বাহবা] শুনতে চাও । আজ বৈশালী থেকে উত্তর এসেছে । তাতে, স্বাগত জানিয়ে সেনা-নায়ককে নাগরিক-মণ্ডলীর সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে । বৈশালীতে আমাদের কবে রওনা হতে হবে, সে কথা জানাবার জন্যে কাল আবার চিঠি আসবে । তুমি তো কাকীর রথেই যাবে, না রোহিণী ?

—হ্যাঁ, আমি তো কাকীর সঙ্গে রথে যাবোই, তাছাড়া এর মধ্যে নতুন শৌল্কিক বুড়ো এসে পড়লে ভামাও আমার সঙ্গে যাবে ।

—তাহলে এখান থেকেই একটা সৈন্যদল তৈরী করে নিয়ে যেতে চাও ?

—সেজন্যে ঈর্ষা করো না । আমি আর ভামা বোনটি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে লিচ্ছবি-নারীদের সৈন্যবাহিনী কেমন হয় দেখো । আমরা কেবল ডিমে তা দিতেই পৃথিবীতে আসিনি ।

—ডিমে তা দেওয়াটা এমন কিছু খারাপ কাজ নয় প্রিয়ে । তুমি কি চড়াই

পাখীর জোড়কে অনাগত সন্তানের জন্যে তৈরী হতে দেখেছো? চড়াই যুগলের কিছুদিন ধরে চলে প্রণয়-লীলা আর মধুর কূজন, তারপর বাবা-মা হবার জন্যে প্রস্তুতি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ঠোঁটে করে কতো জায়গা থেকে খুঁটে খুঁটে খড়-কুটো নিয়ে এসে একটা নতুন নীড় তৈরী করে। তারপর স্ত্রী ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়, আর তাকে রক্ষা করে। তারপর ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়, চিঁ চিঁ করতে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই উড়ে গিয়ে নানা জায়গা থেকে বাচ্চাদের খাবার জন্যে নরম কীট নিয়ে আসে। বাপ-মাকে দেখে বাচ্চাগুলো কিচির-মিচির করে ডাকতে থাকে—তারা বাচ্চাদের মুখে খাবার দিয়ে আবার উড়ে যায়। দম্পতিরও এমনি হওয়া উচিত। চড়াইদের কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে থাকি।

—আর সেই সঙ্গে এটাও দেখবার মতো যে, কোনো শত্রু এলে ওরা নিজেদের প্রাণের মায়া না করে কেমন করে তাদের মুখোমুখি হয়।

—হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমিও একমত! যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে একটা চুম্বন দাও, তাহলে গণ-সংস্থায় লিচ্ছবি নারী-সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যে আমি প্রবল সমর্থন দেবো।

রোহিণী আমার ওষ্ঠে চুম্বন করতে করতে বললো—আগেই পারিশ্রমিক চাইছো?

—পারিশ্রমিক নয় প্রিয়ে, তোমার চুম্বন থেকে সেই বাগ্‌যুদ্ধের জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

গভীর রাত্রে আমরা শয়নকক্ষে পেঁীছেছিলাম। এইরকম কথাবার্তায় রাত্রির আরো অনেকটাই অতীত হলো। কিন্তু তারপরই প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন রৌদ্রে চারিদিক ভরে গেছে। রোহিণী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে উঠে চলে এলাম।

'পরদিন জানতে পারলাম, পরশু আমাদের প্রস্থান করতে হবে।

উল্কাচলে কখন আমাদের তিন দিন কেটে গেছে, বুঝতেও পারিনি। আজ এখানে, কাল ওখানে ভোজের নিমন্ত্রণ, রাত্রে কাকার বাড়ী নাচ-গানের ধুমধাম লেগেই ছিলো। রোহিণীরও সঙ্কোচ কেটে গেছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সে ভামার মতো বাক্‌পটু হতে পেরেছে। তবে এইখানেই রোহিণীর সঙ্গে ভামার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায় আর আজীবন সে বন্ধুত্ব বেড়েই চলেছিলো।

গান্ধারী-বধূর আসার খবর এখানে আশপাশের কর্মান্তগুলোতেও পেঁীছেছিলো। তৃতীয় দিনে দেখলাম, বাইরের কর্মান্তগুলি থেকে দলে দলে তরুণীরা আসছে। কিছুকালের জন্যে উল্কাচল যেন সুন্দরী আর তাদের নৃত্য-গীতের প্রদর্শনীস্থল হয়ে উঠলো। এইসব বহিরাগত তরুণীদের মধ্যে

উল্কাচল [হাজীপুর] থেকে এক ক্রোশ পূর্ব দিকে দীর্ঘি [দিগ্ঘী] গ্রামের এক তরুণীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কোঁকড়ানো কালো দীর্ঘ কেশরাজি, তার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ডাগর চোখ দুটি, তার তন্বী লীলায়িত নাতি-দীর্ঘ তনু, তার বিকাশোন্মুখ তারুণ্য এবং উরোজ, তার মধুর কণ্ঠ, তার চতুর মনোরম পাদবিক্ষেপ একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। দীর্ঘির এই তরুণীর সঙ্গে তার স্বামীও এসেছিলো। সে-ও ঠিক মনোরথের মতো। তাকেও তার স্ত্রী এই দীর্ঘি তরুণীটি নিজের একটিমাত্র কেশেই বেঁধে রাখতে পারে; দীর্ঘি তরুণীটি যেমন প্রাণোচ্ছল, তার স্বামী চন্দ্র তেমনি ধীর, শান্ত। তরুণীটির চোখ দুটি দিয়ে আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। তরুণী পত্নী নিজের নৃত্য-গীতের নিপুণতা প্রদর্শন করতে এসেছে। এই প্রতি-যোগিতায় তার সাফল্য চন্দ্র সন্দেহের চোখেই দেখছিলো। সে নিজে নেচে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর উপহাসের লক্ষ্যস্থল হচ্ছিলো, অথচ যখন সেই দীর্ঘি তরুণীকে কপিল নিজের সহনর্তকী নির্বাচন করে আসরে অবতীর্ণ হলো, তখন চন্দ্রের মূর্তিটা দেখার মতো। মাঝে মাঝে সে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে এক-একবার ওদের আড় চোখে লক্ষ্য করছিলো।

ব্যাপারটা ভামা লক্ষ্য করেছিলো। পরের নৃত্য-চক্রের সময় সে গিয়ে চন্দ্রকে ধরলো। সে বেচারা তো নিজের অক্ষমতা ভালো করেই জানে, তাই মুক্তির আশায় ভামার হাতে-পায়ে ধরতে লাগলো। শুভ প্রভৃতিও ভামাকে এইরকম করে চন্দ্রের হাত ধরে টানতে দেখে বলতে শুরু করলো —না ভাই চন্দ্র, তোমাকে নাচতেই হবে। তোমার 'মুনিমোহিনী'কে যখন কপিল নাচবার সুযোগ দিয়েছে, তখন ভামার আগ্রহও তোমাকে পূরণ করতে হবে।

ভামাও চন্দ্রের হাত ছাড়তে রাজী হলো না। —সারা বজ্জী দেশে যদি কোনো তরুণ আমার সঙ্গে নাচতে পারে, তবে সে আমার এই প্রিয় চন্দ্র— বলে সে চন্দ্রের গালে একটি চুম্বন করলো। চন্দ্রের দুর্গতি দেখে মুনি-মোহিনীও খুব খুশী বলে মনে হলো। ছায়ার মতো চন্দ্রের অনুগামিনী হওয়া তার যে বেশ পছন্দ নয়, তাও বোঝা গেলো।

নিজের চারিপাশে ক্রমেই ভীড় জমতে দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে চন্দ্র শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বললো —ভামা! কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি আমার নাচে অনভিজ্ঞতাকে উপহাস করতে চাইছো।

কপিল বললো —বন্ধু চন্দ্র! যদি ভামার মতো ত্রিভুবন-মোহিনী আমার হাত ধরতো, তাহলে তো আমি নিজেকে ইন্দ্রের সিংহাসনে আসীন মনে করতাম।

শুভ বলে উঠলো —আর ভাই কপিল! তখন আমার মনে হয় তুমি 'মুনিমোহিনী'র সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্য এই বেচারা শুভকে প্রদান করতে।

মনোরথও এবার চন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলতে লাগলো—ভাই চন্দ্র ! তোমার আর আমার দুর্ভাগ্য ঠিক একই রকমের। ওই দেখো 'মুনিমোহিনী' কপিলের ডান হাত ধরে তার পাশে এক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এদিকে ভামা আমার কান্নাকাটি উপেক্ষা করে তোমার হাত ধরেছে ! কি আর বলবো ! একেই বলে ভাগ্য !

শুভ বললো —কিন্তু ভাই মনোরথ, তুমি যদি শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে বাধ্য হতে, তাহলে ওর দুঃখ বুঝতে।

ভামা মনোরথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো —খুব যে সমব্যথী সাজছো দেখছি ! এইমাত্র রোহিণীর সঙ্গে নাচছিলে না ?

মনোরথ —কেন ? তোমার কি তা খুব খারাপ লাগছিলো ?

ভামা —লাগতো, যদি তুমি আমাকে চন্দ্রের সঙ্গে নাচতে বাধা দিতে।

মনোরথ —আমি বাধা দেবো কেন ? নাচো না তোমরা দু'জনে। কিন্তু ভামা, কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নাচতে বাধ্য করা উচিত নয়। একে তো এই ভেবে আমার বন্ধুর মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে যে, তার 'মুনি' কপিলের সঙ্গে এতো অনুরাগ নিয়ে নাচছে, তার ওপর আবার নাচতে নাচতে অপর জুটিদের আড়ালে পড়লেই কপিলকে না জানি কতো চুম্বন করছে !

আড়ালে কেন —বলেই 'মুনিমোহিনী' তখনি কপিলের গালে একটি একটি করে তিন বার চুম্বন করলো। চন্দ্র বেচারা মুখখানি নীচু করে বসে রইলো।

শুভ তখন মনোরথের কাছে গিয়ে বললো —বন্ধু চন্দ্রকে যে বড়ো সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে। যদি ভামা কপিলের হাত ধরে এমন বেমক্কা চুম্বন করতে শুরু করতো, তবে তো কতো ধানে কতো চাল হয় বোঝা যেতো ! যদি কপিল আর 'মুনিমোহিনী'-র মধ্যে মনের আদান-প্রদান হয়েই যায়, তবে কোথায় দীঘি আর কোথায় তক্ষশীলা ! বেচারা চন্দ্র কোনো খোঁজই পাবে না। তার ওপর তোমাদের লিচ্ছবিদের আইনই হচ্ছে এমন যে, স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুতেই বাধ্য করা যাবে না।

শুভর দিকে তির্যক্ দৃষ্টিতে চেয়ে ভামা বললো —শুভ, তুমি আমার চেয়ে বেশী চালাক নও। তুমি চাও আমি কপিলকে চুম্বন করতে যাই, আর এদিকে তুমি আমার প্রিয় চন্দ্রকে এখান থেকে সরিয়ে দাও। —এই কথা বলেই সে চন্দ্রের অপর গালে একটি চুম্বন করে আবার বলতে লাগলো —প্রিয় চন্দ্র ! সে সময় তোমাকে যদি পেতাম, তাহলে কি আর মনোরথের পাল্লায় পড়তাম।

রোহিণী পাশে এসে বললো —তাহলে তো তুমি বোন চন্দ্রকে নাচাতে নাচাতেই মেরে ফেলতে।

ভামা —তখন না হয় আবার মনোরথের হতাম। কিন্তু এ তো মরা-বাঁচার কথা নয় ভাই। দীঘি'র ওই ছুঁড়িটা আমার চন্দ্রকে আর কোনো কাজের যোগ্য রাখেনি। ও ভাবছে কি, চন্দ্র যদি নাচতে শিখে যায়, তাহলে আসরে আর নিত্য-নতুন জুড়িদার বেছে নিতে পারবে না। আমি আজ আমার চন্দ্রকে নাচ শেখাবো। চলো। বন্ধুরা সব এখানেই ভীড় জমাতে শুরু করেছেন। ওদিকে নাগরায় কাঠি পড়লো বলে।

আমি বললাম —ভামী বৌদি, আজ ওকে ছেড়ে দাও। আমার মনে হয়, চন্দ্র নাচতে ভয় পায় না।

ভামা বসে পড়ে চন্দ্রের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো —এই পা তো নাচার জন্যেই এতো সুন্দর হয়েছে।

আমি উত্তর দিলাম —ঠিক বলেছো। চন্দ্র ভাইয়ের সারা দেহই যেন নাচের জন্যে তৈরী হয়েছে। তবে আজ বোধ হয় মাথা ধরেছে কিংবা অন্য কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করছে।

চন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো —ঠিক বলেছো ভাই। আজ মাথাটা বড্ড ধরেছে। আর বুকেও যেন কেমন কেমন—

শুভ —বুকেও ব্যথা বলো!

মনোরথ —কিন্তু আমার বুকে কখনো ব্যথা হয় না।

শুভ —সবার ব্যথা যে একরকমেরই হবে, তার তো কোনো স্থিরতা নেই।

মনোরথ —তাহলে এ বিবাদের মীমাংসার জন্যে আমি একটা উপায় বলছি।

সবাই বলে উঠলো —বলো, বলো।

মনোরথ —আমি ফাঁকা কথা বলতে চাই না। আগে চন্দ্র ভাই রাজী হোক, তবে বলবো।

আমি —কি বলবে না জেনেই রাজী হবে, তুমি তো আচ্ছা লোক হে!

মনোরথ —আরে, রাজী হবার মতোই কথা বলবো।

আমি —একই কথা কারো পক্ষে রাজী হবার মতো, আবার কারো পক্ষে নয়।

মনোরথ —তাহলে তোমার বোধ হয় এই মতলব যে, ভামা চন্দ্রর মাথা ধরা নিয়েই তাকে নাচতে বাধ্য করুক!

আমি —আচ্ছা ভাই চন্দ্র বলে দাও —যদি একেবারে অন্যায্য কিছু না হয় তো মেনে নেবো।

চন্দ্র বললো —আচ্ছা।

মনোরথ —নৃত্যশালার সমস্ত সুন্দরী চন্দ্রকে চুম্বন করবে।

শুভ —আহা, চন্দ্রের যেন আবার বিয়ে হতে যাচ্ছে, তাই সব কুমারীরা মিলে চুম্বন করতে যাবে! বলি এটা শাস্তি, না পুরস্কার?

আমি —চন্দ্র, তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে যাও। নাহলে এখানে কাজ বিগড়ে দেবার মতো লোক অনেক আছে।

চন্দ্র বললো —আমি রাজী।

মনোরথ —কিন্তু এ হলো শর্তের অর্ধেক অংশ। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে —এখানে উপস্থিত সব তরুণই 'মুনিমোহিনী'কে চুম্বন করবে।

শুনেই চন্দ্রের মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে কিছু বলার আগেই আমি বললাম —এও কি আবার একটা শাস্তি না-কি? বজ্জীর তরুণীরা তো দিন-রাত চুম্বন বিতরণ করছে। ভাই চন্দ্র, তাড়াতাড়ি 'হ্যাঁ' বলো।

চন্দ্রও তাড়াতাড়ি 'হ্যাঁ' বললো, আর তা শুনে 'মুনিমোহিনী'র চোখে একটা বিচিত্র হাসি দেখা গেলো।

প্রথমে ভামা চন্দ্রকে চুম্বন করলো। তারপর রোহিণী। রোহিণীর পর অপর সব তরুণীরা। শেষে যখন 'মুনি' সেদিকে এগোলো, তখন ভামা বাধা দিয়ে বললো —তুমি তো ওকে রোজই চুমু খাও। আজ তোমার পালা নয়।

কিন্তু কপিল 'মুনি'কে চন্দ্রের কাছে নিয়ে গেলো। 'মুনি' চন্দ্রের ঠোঁটে চুম্বন করলো।

অতঃপর শুরু হলো 'মুনি'কে উষ্ণ চুম্বন। নাচের চেয়ে এই চুম্বন মহোৎসবই সেদিন সবার বেশী মনোরঞ্জন করেছিলো।

এদিনের নাচ-গান আরো বেশীক্ষণ ধরে চললো। যখন বিছানায় শুতে গেলাম, তখন অবসাদে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে।

তেরো

বৈশালীতে অভ্যর্থনা

উৎকাচল থেকে সেদিন সকালে যাত্রা করে আমরা রাত্রে কোটিগ্রামে বিশ্রাম করলাম। পরদিন সকালে আমরা বৈশালীতে পেঁছাবো। কাকী আর ভামার সঙ্গে রোহিণী রথে যাত্রা করায় সেইদিনই বৈশালীতে পেঁছালো।

কাকী রোহিণীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সোমা সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলো। রথের চাকার শব্দ শুনেই সে দরজায় এসে দাঁড়ালো।

কাকী আদেশের স্বরে বললেন—সোমু! দেখছো কী? তোমার বৌদিকে রথ থেকে নিয়ে যাও।

সোমা রথের কাছে আসতেই ভামা মুখখানি করুণ করে বললো—এসো ভাই সোমা। আমরা দু'জনে একটু সাহায্য করি। বেচারীর পায়ে—

সোমার মুখের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো। সে মনে করলো, রোহিণীর পায়ে কিছু একটা হয়েছে। তাই এসে রোহিণীর পা দুটি ধরলো।

ভামা হাসি সামলে বললো—খুব সাবধানে ধরো গো ননদ সোমু। যেন না লাগে।

সোমা আরো সাবধানে ধরে বললো—তুমি ওদিকে ঠিক করে ধরো তো বৌদি—দু'জনে সাবধানে নামিয়ে নেবো।

ভামা মুখখানি আরো করুণ করে জানালো—ভারী মুশকিল সোমু। পায়ে সামান্য একটু নড়াচড়া লাগলেই তোমার সোনার বৌদিটিকে হারাতে হবে। কি যে করি! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সোমা তাড়াতাড়ি পিঠ পেতে দিয়ে বললো—আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমার পিঠে উঠতে একটু সাহায্য করো।

ভামা যখন সাহায্য করতে যাচ্ছে, এমন সময় কাকী, বাইরে থেকে সহিস সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। ভামা খিল খিল করে হেসে উঠলো। সোমা পেছন ফিরে দেখেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। কাকী তো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বকাবকি শুরু করলেন—ভামা, তুই তো বড়ো দুষ্টু।

—না কাকী! ভামা নম্র স্বরে বললো—বৈশালীতে নববধূ যখন প্রথম আসে, তখন ননদ তাকে পিঠে করে দেউড়ী পার করে দেয়।

—তোমার মাথা করে! আমি তো আর বৈশালীতে নববধূ ছিলাম না কোনোদিন!

—তোমার সময় হয়তো এ রীতি ছিলো না কাকী। আজকাল তো সবাই এইরকমই করে। ননদ সোমাকে জিজ্ঞাসা করো।

বেচারা সোমা ভালো করেই ভামাকে জানতো! তবুও তার প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলো। তাই লজ্জায় সে যেন কুঁকড়ে গেলো। এমন সময় রোহিণী রথ থেকে নেমে সোমাকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো এবং তার মুখচুম্বন করতে করতে বললো—ভাই সোমু! তুমি কি ভামা দিদিকে জানো না!

সোমার চোখে আনন্দাশ্রু উপচে পড়ছিল। তার সব সংকোচ কোথায় চলে গেলো। সে তার নতুন বৌদিকে বুকে টেনে নিতে নিতে বললো—ভামাকে ভালো করে জানলেও লোকে ওর পাল্লায় পড়ে।

ভামা এই সময় এসে সোমার গলা জড়িয়ে ধরলো। সোমা বললো—প্রথমে প্রহার করে তারপর সোহাগের ঘটাটা একবার দেখো বৌদি!

—কষা আমলকীর পর জল খেতে মিষ্টিই লাগে সোমা।

এদিকে পাড়ায় পাড়ায় তখন খবর পৌঁছে গেছে। সব বাড়ী থেকেই লিচ্ছবি-নারীরা নববধূকে অভ্যর্থনা করতে আসছে। মঙ্গলকার্য করে, মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে সকলে রোহিণীকে বাড়ীর মধ্যে দালানে নিয়ে গেলো। সেখানে ফরাস বিছানো ছিলো। এমন সময় মল্লিকা এলেন - তাঁকে যাবার জন্যে সকলেই পথ ছেড়ে দিলো।

কাকী রোহিণীর কানে কানে বললেন—ইনিই সিংহের মা, মল্লিকা। —শুনেই রোহিণী উঠে দাঁড়ালো। মল্লিকা রোহিণীকে বুকে টেনে নিয়ে সজল চোখে চুম্বন করতে করতে বললেন—আমার সোনার বৌ! বৈশালীতে তোমার আগমন শুভ হোক!

সবাই বসার পর বধূর জন্যে মধুপর্ক—বাছুরের ঝলসানো মাংস আর আঙুরের সুরা আনা হলো। রোহিণী সেগুলো চেখে নিয়মরক্ষা করলো।

লিচ্ছবি-নারীরা কোমল কণ্ঠে মঙ্গলগীত গাইতে লাগলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগলো ভামা। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরতে লাগলো। সকলেই গান্ধারী বধূর সৌন্দর্য বর্ণনা করছিলো। কেউ তার ডাগর নীল চোখ দুটির, কেউ পাতলা লাল ঠোঁট দুটির, কেউ সোনালী দীর্ঘ কেশগুচ্ছের প্রশংসা করছিলো। কেউ আবার প্রশংসা করছিলো তার সুগৌর প্রশস্ত ললাট আর চাঁদমুখের। সে যে বৈশালীতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী—এ বিষয়ে সবাই একমত।

পরদিন দ্বিপ্রহরে নাগরিক-মণ্ডলীর সঙ্গে আমি বৈশালীর দক্ষিণ দ্বারে পৌঁছালাম। লিচ্ছবিরা নগরের অনেকখানি আগে থেকেই রথে করে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো এবং শোভাযাত্রা করে নগরে চললো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে সেনাবাহিনীর বাদ্যভাণ্ড বাজানো হচ্ছিলো। বাদকদলের পর তক্ষশীলার দশটি ঘোড়া, উপহার-সামগ্রী-ভরা শকটগুলো, তারপর অশ্বারোহণে তক্ষশীলা থেকে প্রত্যাগত আমরা ছ'জন লিচ্ছবি-কুমার, আর সব শেষে লিচ্ছবিদের শত শত রথ। এই রথগুলোর আগে ছিলেন সেনাপতি সুমন।

দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে নগরের প্রধান পথ ধরে আমরা সংস্থাগারের [পার্লামেণ্ট ভবন] সামনে পৌঁছালাম। সেখানে লিচ্ছবি-গণপতি সুনন্দ অমাত্য পরিষদের সঙ্গে মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেনাপতিও গিয়ে গণপতির সঙ্গে মিলিত হলেন। গণপতি একবার ঘোড়াগুলি আর উপহার-দ্রব্যসামগ্রীর দিকে চাইলেন, তারপর অতিথিদের নিয়ে চলে গেলেন সংস্থাগারে। আমাদের ছ'জন লিচ্ছবি-কুমারকে সদস্যদের থেকে পৃথক এক বিশেষ আসন দেওয়া হলো।

সংস্থাগারে গণ-সংস্থার ন'শো নিরানব্বই জন সদস্যদের মধ্যে ন'শো জনের বেশী উপস্থিত ছিলেন। গণপতি হাত তোলা মাত্রই সভা নীরব হয়ে গেলো। তখন সেনানী কপিল দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো —পূজ্য লিচ্ছবি-গণ, শুনুন। তক্ষশীলা আর বৈশালী চিরদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করে আসছে। কিন্তু সম্ভবত এই সর্বপ্রথম তক্ষশীলা তার ভগ্নী বৈশালীকে আন্তরিক সম্মান ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করার জন্যে নাগরিক মণ্ডলী প্রেরণ করেছে। গান্ধার-গণ বৈশালী এবং লিচ্ছবিদের প্রতি কি ভাব পোষণ করে, দশ জন গান্ধার-পুত্রের আপনাদের মধ্যে অবস্থিতিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর তাঁদের বক্তব্যও আপনারা এই সুবর্ণ-পত্রের মধ্যে থেকেই জানতে পারবেন।

এই কথা বলে কপিল সুবর্ণ-পত্রটি গণপতির হাতে সমর্পণ করলো এবং নিজের বক্তব্যের জের টেনে বললো —আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আর সামান্য কিছু আমি আপনাদের বলতে চাই। বলতে চাই, কেমন করে একজন লিচ্ছবি-পুত্র তক্ষশীলাকে বৈশালীর এতো নিকটবর্তী করেছে। শত শত বৎসর ধরে প্রাচীর অন্যান্য বিদ্যার্থীর মতো শত সহস্র লিচ্ছবি-পুত্র তক্ষশীলায় গমন করেছেন। তক্ষশীলা তাঁদের প্রতি স্নেহপরায়ণা। তাঁরাও তক্ষশীলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু লিচ্ছবি-পুত্র সিংহের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অসাধারণ। আমার মনে হয়, তক্ষশীলার বিপদের সময় যে-কোনো লিচ্ছবি-পুত্র উপস্থিত থাকতেন তিনিই সিংহ এবং তাঁর পাঁচ জন সঙ্গীর মতো নিজের

রক্ত ঢালতে প্রস্তুত হতেন। সুতরাং যদি এ বিষয়ে আগে কোনো উদাহরণ না শোনা গিয়ে থাকে, তার কারণ হয়তো এমন সুযোগ আর আসেনি। তবুও দু'বছর আগে যে লিচ্ছবি-পুত্র তক্ষশীলার জন্যে নির্ভয়ে তরবারি চালনা করেছিলেন, তাঁর গুরুত্ব কমে না। আমি নিজে এই যুদ্ধে গান্ধার-ভূমির জন্যে লড়েছি, এবং শুভ প্রভৃতি অপর পাঁচ জন লিচ্ছবি-পুত্রের পরাক্রমও আমার অবিদিত নয়। তাঁদের জন্যে যে-কোনো গণই গর্ববোধ করতে পারে। এই অল্প বয়সেই তাঁদের এই বীরত্ব দেখে বোঝা যায়, আমরা ভবিষ্যতে তাঁদের ওপর আশা রাখতে পারি। আর সেনানায়ক সিংহ সম্পর্কে গান্ধার-গণ কি মত পোষণ করে, তা ওই সুবর্ণ-পত্র থেকেই আপনারা জানতে পারবেন। আমি তাঁর উপ-নায়ক ছিলাম, সুতরাং সে সময় সিংহকে খুব কাছ থেকেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। আমার নিজের, তক্ষশীলার প্রাক্তন এবং বর্তমান সেনাপতির, সেনানায়ক ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদদের অভিমত এই যে, সিংহের মতো সেনাসঞ্চালক পেয়ে যে-কোনো দেশ গর্ব করতে পারে। সেনানায়ক সিংহকে যে যুদ্ধক্ষেত্রের ভার অর্পণ করা হয়েছিলো, সেটিই হলো সবচেয়ে বড়ো মর্মস্থান। আমরা বুঝেছিলাম, পার্শব বাহিনীর সবচেয়ে ভয়ংকর আক্রমণ সেইখানেই হবে। আমাদের ভূতপূর্ব সেনাপতি, তক্ষশীলার দিশা-প্রমুখ যুদ্ধ-বিদ্যাচার্য বহুলাশ্ব সিংহের যোগ্যেতা ভালো করেই জানতেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের সেনাপতি মহাসিন্ধুর সেই গুরুত্ব-পূর্ণ ঘাটে সিংহকে সেনানায়ক নির্বাচন করেছিলেন। সেনানায়ক সেখানে কোথায় ব্যূহ রচনা করেছিলেন, কেমন করে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন, কিভাবে শত্রুর কৌশল পূর্বেই ধরে ফেলেছিলেন—সেসব কথা এখানে বলতে চাই না। পূজ্য লিচ্ছবিগণ! এই একটি কথা থেকেই আপনারা সিংহের যোগ্যতা অনুভব করতে পারবেন। পার্শব শাহানশাহের অদ্বিতীয় বিশাল সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে এক ধাক্কাতেই উনি শেষ করেছেন এবং পার্শব সেনাপতিকে বন্দী করেছেন। এই যুদ্ধে সিংহ স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আচার্য বহুলাশ্বের কন্যা, পরে সিংহের পত্নী রোহিণীও সে সময় নিজের খড়্গের যে শক্তি প্রদর্শন করেন, তা না করলে সিংহের কৃপায় সমরবিজয়ী হয়েও রোহিণীর কৃপার অভাবে সিংহকে আমরা ফিরে পেতাম না।

কপিল ভাষণ শেষ করে বসতেই সদস্যদের আসনগুলি থেকে শোনা যেতে লাগলো —রোহিণী আর সিংহকে আমরা দেখতে চাই।

রোহিনীকে কোণ থেকে সামনে আনা হলো। গণপতির আদেশে সিংহও আরো কাছে চলে এলো। তারপর দু'জন গণ-এর সম্মুখে দাঁড়াতেই সহস্র কণ্ঠে গণ-এর জয়ধ্বনি শোনা গেলো—

'জয় জয় গান্ধার-গণ।'
'জয় জয় লিচ্ছবি-গণ।'
'জয় জয় তক্ষশীলা।'
'জয় জয় বৈশালী।'

তারপর আবার—

'লিচ্ছবি-পুত্র সিংহ চিরজীবী হোক।'
'গান্ধার-পুত্রী রোহিণী চিরজীবী হোক।'

গণপতি সুবর্ণ-পত্র পাঠ করার আগে বললেন —পূজ্য গণ! সর্বাগ্রে আমি আপনাদের সামনে তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলীকে স্বাগত জানাচ্ছি। আয়ুষ্মান্ কপিল! আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা পথের কতো বাধা-বিঘ্ন, কতো কষ্ট সহ্য করে বৈশালীতে পেঁাছেছেন, তা আমরা অনুভব করছি। কিন্তু সে অসুবিধা দূর করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। আমাদের এই বজ্জী-ভূমি, এই বৈশালীতে যদি আমরা আপনাদের সেই ক্লেশ কিছুটা ভুলে থাকার সাহায্য করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদের সৌভাগ্য বলেই মনে করবো। আপনারা লিচ্ছবি-ভূমিকে গান্ধার এবং বৈশালীকে তক্ষশীলা বলেই মনে করবেন। এ আপনাদের নিজেদের দেশ। আপনারা আমাদের সম্বর্ধনাকে পরমাত্মীয়ের সম্বর্ধনা মনে করেই গ্রহণ করুন।

তারপর গণপতি তক্ষশীলার সুবর্ণ-পত্র পাঠ করে শোনালেন —পাঠের সময় মাঝে মাঝে সদস্যরা 'সাধু সাধু' বলে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। অতঃপর কোষপতি ঘোড়া দশটি ও উপহার-সামগ্রীগুলির তালিকা পাঠ করে জানালেন —ঘোড়াগুলিকে গণ-এর অশ্বশালায় আর উপহার সামগ্রীগুলি কোষশালায় দেখা যেতে পারে।

কোষপতির ঘোষণার পর গণপতি সভা ভঙ্গ হলো বলে ঘোষণা করলেন। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে নিজের নিজের বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলো।

সংস্থাগারের উত্তরে পাথিক গৃহপতির প্রাসাদে কপিল প্রভৃতির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

রোহিণীর সঙ্গে সংস্থাগার থেকে বেরিয়ে দেখলাম —সেখানে কাকীর সঙ্গে মা এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি দৌড়ে মায়ের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখের জলে আমার মুখ সিক্ত করলেন। তারপর একটু শান্ত হলে বললেন —বাবা, ভেবেছিলাম তোকে আর দেখতে পাবো না।

এবার আমাদের কাকীর বাড়ীতেই যেতে হবে। বুঝতে পারলাম, আমাদের সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি নিজের পিতৃগৃহ দেখার

ইচ্ছা প্রকাশ করায় মা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমার কর্মান্তের কাজও চলছে বলে মায়ের কাছে জানতে পারলাম।

এখান থেকে আমার সৎ-পিতার বাড়ী খুব কাছে। সেখানে যেতেই দূরাগত পুত্রের মতো সৎ-পিতা আমাকে আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে আলিঙ্গন করলেন। বিয়ের পর সোমা চলে যাওয়ায় তিনি এবং মা—এই দুটি প্রাণীই এখন আছেন এ বাড়ীতে। আমি তাঁকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম—মা বললেন, উনি এখন ভালো শুনতে পান না। মায়ের শরীরেও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তাঁর অর্ধেক চুলই সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু সৎ-পিতা একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি টেনে টেনে শ্বাস নিয়ে বললেন—সোমার বিয়ে দিয়ে একদিকে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। এখন কেবল তোমার অপেক্ষাতেই জীবনটা আছে। তুমি এসে পড়েছো, ভালোই হলো।

—আর বাবা, এই বৌও এসেছে।—আমি রোহিণীকে কাছে টেনে নিয়ে খুব জোরে জোরেই বললাম।

ছলছল চোখে রোহিণীকে তিনি চুম্বন করলেন। তারপর 'একটু দাঁড়াও' বলে নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে দৌড়ে গেলেন। বৃদ্ধ কি করেন দেখার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি এক টুকরো নীল বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে সযত্নে মোড়া মুগা-মোতিমিশ্রিত মালা নিয়ে ফিরে এলেন এবং স্বহস্তে রোহিণীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—বৎসে! আমি মল্লিকাকে পর্যন্ত গোপন করে এই মালাগাছি সিংহের বৌয়ের জন্যে রেখেছিলাম। আজ আমার সাধ পূর্ণ হলো।

—না পিতা, তোমাকে এখনো বাঁচতেই হবে।—আমি বললাম।

—না বৎস, কোনোরকমে টেনে-টুনে নৌকাকে এ-পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, এখন তোমাকেও দেখলাম এবার আনন্দেই মরতে পারবো। সত্তর বছর পূর্ণ হয়েছে, কানেও আর ভালো শুনতে পাই না। এ-রকম জীবন লিচ্ছবিদের প্রার্থনীয় নয়।

বাবার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। আমার কিন্তু মনে হলো—বার্ধক্যে লোকে শিশুর মতোই হয়ে পড়ে, ওঁরও অবস্থা সেইরকম। অথচ কি আশ্চর্য, এরপর চতুর্থ দিনেই তিনি ঘুমের মধ্যেই অনন্তনিদ্রা লাভ করেছিলেন।

যাই হোক, ওখান থেকে মায়ের সঙ্গে আমরা দু'জনে কাকীর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ভিতর-দালানে ভামা বৌদির সুরেলা কণ্ঠ আর বহুকণ্ঠের হাস্যধ্বনি শোনা গেলো। তরুণীদের ভীড় দেখেই মা 'ভামা আবার কী

উপদ্রব শুরু করলো দেখো' বলতে বলতে কাকীর ঘরের দিকে চলে গেলেন। অমনি আমাদের দিকে লক্ষ্য পড়লো ভামার। সে আর পাঁচটি লিচ্ছবি সুন্দরীর সঙ্গে প্রায় নাচতে-নাচতেই আমাদের সামনে এসে হাজির!

রোহিণীর গলায় নতুন মালা দেখে ভামা 'তোমাকে এই মালা পরে বেশ মানিয়েছে তো' বলে চুম্বন করলো। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো--দেবর! তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে সারা বৈশালীর রূপরাশি একত্র হয়েছে।

আমি হেসে উত্তর দিলাম —শুধু অভ্যর্থনা করতে, না আর কিছুর জন্যে বৌদি?

ভামা কোনো উত্তর না দিয়ে রোহিণীর হাত ধরে নিয়ে চললো এবং আমাকেও তার অনুসরণ করতে ইসারা করলো। দালানের একপ্রান্তে বিছানো একটি আসনে গিয়ে আমরা বসলাম। আর কতকগুলি তরুণী বীণা, মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুমধুর কোকিলকণ্ঠে নব বর-বধূর আগমনী মঙ্গলগীত গাইতে লাগলো। গান শেষে ভামা একে একে সব তরুণীদের ডেকে রোহিণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। ভামার আজকের এই আমন্ত্রণে লিচ্ছবিদের কোনো বংশের তরুণীই বাদ পড়েনি।

পরিচয়ের পর কিছুক্ষণ সব নীরবতায় ভরে গেলো। তারপর গলা পরিষ্কার করে ভামা বলতে লাগলো —বোনেরা এবং বৌদিরা! কুমারী এবং বধূরা! সিংহকুমার আর তার গান্ধারী বধূকে অভ্যর্থনা জানাতে আজ আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দবোধ করছি। সিংহকুমার একসময় আমাদের তরুণীদের খেলার সাথী ছিলো। তখন তার কাছে আমরা কতো চুম্বনের আনন্দ পেয়েছি, তার সঙ্গে নৃত্য করেছি, তাকে নিয়ে পান-গোষ্ঠী রচনা করেছি। সেসব দিন কতো মধুর ছিলো —আজ যেন সবই স্বপ্নকথা। কিন্তু আজ আর আমাদের সেই অপূর্ব মধুর দিনগুলির স্মৃতি স্মরণপথে আনার প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে আমরা নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করতেই উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলেই বধূ রোহিণীকে দেখেছেন। সোনার বৌ, পিটারীতে [বাক্সে] তুলে রাখার মতো। তক্ষশীলার এই সুন্দরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো বৈশালীতে কেউ আছে কি? তা যদি থাকতো, তাহলে আমাদের বর্তমান জনপদ-কল্যাণী [সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী] ক্ষেমা পরাজয় স্বীকার করতে চাইতো না। ক্ষেমা, একবার এদিকে এসো তো—

অষ্টাদশী এক অনুপমা সুন্দরী, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, বিশালনেত্রা, ঘননীল-মূর্ধজা লজ্জাবনতমুখী তরুণী ভামার কাছে এসে অপরাধিনীর মতো

দাঁড়ালো। রোহিণী একদৃষ্টে তাকে দেখতে লাগলো। তক্ষশীলাতেও এমন সুন্দরী দুর্লভ।

ভামা তার পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বললো —তাহলে ভগ্নীরা দেখছেন, ক্ষেমার মতো তরুণী সম্পর্কে বৈশালী যদি গর্ববোধ করে, তবে তা অনুচিত নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, রোহিণীকে এই রূপসীদের মধ্যে যদি সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তাতে অন্যায় কিছু হবে না এবং আমার এই কথায় কেউ ভামা যে ক্ষেমার কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই কলঙ্ক আরোপ করবেন না। আর যেহেতু আমরা এখানে জনপদ-কল্যাণী নির্বাচন করছি না, অতএব ক্ষেমারও এজন্যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানে আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই —লিচ্ছবি-কুমারীরা বর্তমানে সৌন্দর্যকলার চর্চায় খুব বেশী মনোযোগী হয়েছেন। বিশেষ করে যখন থেকে পোড়ারমুখী আম্রপালী [আমার দুঃখ এই যে তার মুখটা সত্যি পোড়া নয়] তার দোকান খুলে বসেছে, তখন থেকে বৈশালীর তরুণীদের গৃহত্যাগিনী হবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সকলেই সাজসজ্জায় গণিকা আম্রপালীকে হার মানাতে চায়। আমি অবশ্য এটা খারাপ বলছি না। সকলের স্বামীই তো আর মনোরথের মতো একটি মাত্র চুলে বাঁধা পড়ার মতো অনুরক্ত নয়। কিন্তু যেসব লিচ্ছবি-কুমারী আম্রপালীকে নিজেদের সৌন্দর্যকলাগুরু করেছেন এবং এই কৌশলে সহস্র সহস্র কার্যাপণ বাঁচিয়েছেন, তাঁরা একদিক দিয়ে ভীষণ অপরাধ, ভীষণ নয়, অতি মারাত্মক অপরাধ করেছেন।

—হ্যাঁ, আমি এই কথা বেশ ভেবেচিন্তেই বলছি। লিচ্ছবি-কুমারীরা সৌন্দর্যোপাসনায় এতো মত্ত হয়ে উঠেছেন যে তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা লিচ্ছবি। ভগ্নী রোহিণী, তোমার হাতটা দেখি।

রোহিণী ভামার হাতের ওপর নিজের হাতখানি রাখলো।

ভামা আবার বলতে লাগলো —আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি দশ জন করে ডেকে ডেকে রোহিণীর হাত দেখাবো। ওর হাত বড়ো সুন্দর। সুন্দর হাত কি-রকম সেটা স্মরণ রাখবেন। রোহিণীর হাত শুধু চোখে দেখবেন না, তার হাতে হাত রাখুন। সত্যি করে বলুন তো, বজ্রের মতো কঠোর নয় ?

সকলেই সে কথা স্বীকার করলো। তখন এমনি করে দশ জন করে ডেকে নিয়ে ভামা প্রত্যেককে রোহিণীর হাত দেখালো। সকলে দেখে যাবার পর ভামা বলতে শুরু করলো —ভগ্নীগণ! রোহিণী কি আমাদের কারো চেয়ে কম সুন্দরী ? মন-রাখা কথা বলতে হবে না, সত্যি কথাই বলুন।

প্রত্যেকেই বললো —আমাদের সকলের চেয়ে, এমন কি ক্ষেমার চেয়েও সুন্দরী।

—কিন্তু বোনেরা, রোহিণীর সৌন্দর্যে একটা মস্ত বড়ো কলঙ্ক আছে —তার হাত শিরীষ বা পদ্মফুলের মতো কোমল নয়। আম্রপালীর পাঠশালায় একে সুন্দর বলা হয় না। তবে কি এইরকম কলঙ্কপূর্ণ হাতের জন্যে রোহিণীকে অসুন্দরী বলবো? আম্রপালীর পাঠশালার অনুরাগিনীরা বলবেন —নিশ্চয়। কিন্তু আমি এবং আমার আগের সব জনপদ-কল্যাণীরা বলবেন —আম্রপালীর পাঠশালা মিথ্যাবাদী। রোহিণীর অপূর্ব সৌন্দর্যের সঙ্গে এই হাতখানিও অপূর্ব। কারণ লিচ্ছবি-নারীর হাতে তরবারিই শোভা পায়। অত্যাচারী মগধরাজ একদিন রাত্রে গোপনে আম্রপালীর সৌন্দর্য-মধু পান করতে বৈশালীতে এসেছিলেন। এখন তিনি যে-কোনো সময় বজ্জীভূমি আক্রমণ করতে পারেন। সেই আক্রমণ রোধের জন্যে আমাদের ভ্রাতা, স্বামী, দেবর, শ্বশুর, পিতা, পিতৃব্য সকলেই প্রস্তুত হচ্ছেন। এখন বলুন দেখি, যদি আমাদের পিতামহীদের মতো আজ শত্রুদের সঙ্গে যুঝতে হয়, তবে আম্রপালীর আদর্শে গড়া কমল-কোমল হাত দু'খানি কোন কাজে লাগবে? এই হাত কি শল্য বা খড়্গ-চালনা করতে পারে, না এই হাতে ঢালের ধাক্কা সামলানো যায়? কিন্তু ভগ্নী রোহিণীর হাত আপনারা দেখলেন। ঐ হাত দিয়েই বিম্বিসারের চেয়ে শতগুণে বলশালী পার্শ্বরাজের দর্প সে চূর্ণ করেছে। তাই আমি বলি, যাঁরা আম্রপালীর হাত ধার করেছেন, তাঁরা তাঁকেই সে হাত ফিরিয়ে দিন। ও হাতের মূল্য বড়ো বেশী দিতে হবে। আমরা চাই লিচ্ছবি-নারীর হাত। রোহিণীর হাত তার আদর্শস্থল। রোহিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র পাঁচ দিনের। কিন্তু মনে হচ্ছে, সে যনে আমার জন্ম জন্মান্তরের আত্মীয়া। আমার হাতও রোহিণীর মতো —এটা আমার সৌভাগ্য। আর আমরা দু'জনে স্থির করেছি যে, যখন সিংহ এবং মনোরথের হাতে খড়্গ শোভা পাবে, তখন আমরাও খড়্গধারিণী হবো। ভগ্নীগণ! আপনারাও কি খড়্গধারিণী হতে চান না?

অনেকেই বললো —হ্যাঁ, আমরা তাই চাই।

ভামা পুনরায় বললো —তা যদি চান, তবে আগে ঐ হাত দু'খানি পালটে ফেলুন। যাঁদের হাত আম্রপালীর মতো কলঙ্কিত, আমি শুধু তাঁদেরই বলছি। আর এই পরিবর্তনের উপায়ও বলে দিচ্ছি। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করার মতো খাটাখাটনি আর হাত দু'খানিকে সবল করার কাজ শুধু দাসীর ওপরই ছেড়ে দেবেন না। সেইসঙ্গে খড়্গ, চর্ম [ঢাল], শল্য, ধনুক নিয়ে প্রত্যহ অভ্যাস করুন। কর্মান্তে গিয়ে ক্ষেতে কোদাল চালনা করুন, রোদে থাকা অভ্যাস করুন। নাচ এবং লাফঝাঁপ করে সারা দেহের চর্বি গলিয়ে ফেলুন। আমি আজ আপনাদের হয়তো অনেক উপদেশ দিয়ে ফেললাম, সেজন্যে ক্ষমা করবেন। এবার আমোদ-প্রমোদ শুরু হবে।

অতঃপর মাংস, সুরা-ভাণ্ড আর চষক এলো। সকলে চর্বণ এবং পান করতে লাগলো। ভামা নিজে সুরা-ভাণ্ড নিয়ে আমার পাশে বসে চষকে [পাত্রে] সুরা ঢালতে লাগলো।

আমি বললাম —বৌদি, তুমিও পান করো।

—করবো।

—তাহলে পেয়ালা নিয়ে এসো।

—কি হবে পেয়ালা! এতেই পান করবো।

—এই পাত্রেই?

—নিশ্চয়। তোমার ওষ্ঠের স্পর্শ আছে বলে এ পাত্রে পান করতে মিষ্টিই লাগবে।

আমার মাথা ঘুরে গেলো। ভামার গম্ভীর উপদেশ শুনে ভেবেছিলাম, আজ প্রাণটা বাঁচলো। কিন্তু এখন চিন্তা বেড়ে গেলো।

আমাকে নীরব দেখে ভামা বললো—কি দেবর? ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে বসে এক ঢোক সুরা পান করার অধিকারও নেই না-কি?

তারপর তরুণীদের লক্ষ্য করে বললো—শুনছো তো ভাই, দেবর সিংহ বৌদিকে নিজের সঙ্গে বসে এক ঢোক মদিরা পানের অধিকারও দিতে চায় না। এটা খুব অন্যায় বলেই আমার মনে হচ্ছে।

শ্যামার পীত চোখ দুটিতে লালের আভা দেখা দিয়েছে। সেই প্রথম বললো—হ্যাঁ, বোন! সত্যিই খুব অন্যায়। আর ছেলেবেলা থেকেই সিংহ-কুমারের অন্যায় করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ও কতো মেয়েরই হৃদয় ভেঙে চুরমার করেছে। সিংহের সঙ্গে আমি কতোবার আম্রবনে বেড়িয়েছি। ধান্য-ক্ষেত্রে সিংহকে কোলে নিয়ে কতোবার আদর করেছি। নাচের আসরে কতো রাত আমার সঙ্গেই কেটেছে। কতো চুম্বন করেছি, কতো আলিঙ্গন দিয়েছি, তারও সীমা-সংখ্যা নেই! আমাকে ও কথা দিয়েছিলো—শ্যামী, এ হৃদয়ে শুধু তোমারই স্থান আছে। এখন বলো তো সখী! কথা রক্ষা না করে সিংহ ঠিক করেছে, না অন্যায় করেছে?

—ভয়ানক অন্যায়।—ভামা বললো।

—তাহলে এর জন্যে ওর কি শাস্তি হওয়া উচিত?

—দেবর সিংহ, এক পায়ে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে শ্যামার কাছে মাপ চাও। নাহলে—

—এ পার্শ্ব সৈন্য নয় দেবর! এ হলো লিচ্ছবি-নারীসেনা। বুঝতে পারছো তো তুমি এখন একা, তোমার কি গতি হবে?

চার জন তরুণী আমার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো। একজন একটা পা তুলে ধরে বললো—ব্যস্! এইবার মাপ চাও।

রোহিণীর দিকে চাইলাম। সে মুচকি হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। আমি বললাম —আচ্ছা! যেমন করে বলছো, তেমনি করেই মাপ চাইবো।

শ্যামা পাশে এসে বসলো। আমি সখীদের কথার পুনরাবৃত্তি করে মাপ চাইলাম।

এবার ঊষা মুখ ভারী করে বললো —ভামা সই, আমার বিচার করো। কতো বছর আগে ঠিক মনে নেই, একদিন আমার সঙ্গে সিংহ বেড়াতে গিয়েছিলো। সেদিন ও বলেছিলো, ঊষা পাঁচটা চুম্বন দাও। আমি পরে ফিরিয়ে দেবো। আমি পাঁচটা চুম্বন দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনো ফিরে পাইনি।

ভামা আমার দিকে ফিরে বললো —বলো, তোমার কি বলার আছে?

—বৌদি, সে ছোটবেলার কথা। বোধ হয় তখন পাঁচ-ছ'বছর আমাদের বয়স।

—তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, ঋণ খুব পুরোনো। সুদও অনেক বেড়ে গেছে।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি? উষার দশটা চুম্বন পাবার অধিকার আছে। আমাদের গণ-এ দ্বিগুণের বেশী সুদ নেবার নিয়ম নেই। ঊষা, তুমি নিজের ঋণ শোধ করে নাও।

চার জন তরুণী আমার হাত ধরলো। আর উষা আমার এক-এক গালে পাঁচটি করে দশটি চুম্বন করলো। আমি ঘাবড়ে গেলাম। যদি এমনি করে ঋণ শোধ করতে হয়, তাহলে তো শোধ করতে করতেই মারা পড়বো।

ভামা আবার উচ্চৈঃস্বরে বললো —সখীগণ! শুধু আজকের দিনটাই ভামা বিচারাসনে আছে। আজকের দিনটাই শুধু তোমাদের খাঁটি বিচার মিলবে।

রমা বিচার প্রার্থনা করতে উদ্যত, এমন সময় বাইরে থেকে বাজনার শব্দ পাওয়া গেলো। একজন দাসী এসে খবর দিলো —নৃত্য-সমাজ একত্রিত হয়েছে। তক্ষশীলার তরুণরাও এসেছে।

ভামা যখন বললো 'ভগ্নীগণ! নৃত্যশালায় চলুন', তখন যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। অতঃপর ভামা, আমি ও রোহিণী তিন জনেই তাড়াতাড়ি মাংসের টুকরোগুলো গলাধঃকরণ করে দু-তিন পেয়ালা মুখে ঢেলে দালান থেকে বাইরে চলে এলাম।

কাকীর বাড়ী থেকে নৃত্যশালা খুব কাছেই। সেখানে গিয়ে দেখি বৈশালীর সমগ্র লিচ্ছবি-তরুণ-মণ্ডলী এসে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলী ছাড়া আমার বাল্যবন্ধুর সংখ্যাই বেশী। বাল্য-বন্ধুদের এতো অধিক সংখ্যায় একত্র দেখে খুব আনন্দিতই হলাম। যাদের

আট-দশ বছরের দেখে গেছি, আজ তারাও বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। আজ প্রচলিত রীতি অনুসারে আমাকে রোহিণীর সঙ্গে নাচতে হবে। জনপদ কল্যাণী ক্ষেমা কপিলকে সহনর্তক নির্বাচন করলো। যূথ-নৃত্য, মিথুন-নৃত্য প্রভৃতি কতোরকম নাচই চলতে লাগলো। আজকের এই নাচে শুধু বৈশালীর নয়, সারা বজ্জী দেশের প্রসিদ্ধ তরুণ-তরুণীরা যোগ দিয়েছে। তাই এ নাচের প্রশংসার জন্যে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

মাঝে মাঝে যখন একটা নৃত্যচক্র বিশ্রাম গ্রহণ করছে, তখন অপর দল আসরে অবতীর্ণ হচ্ছে। বিশ্রামের সময় খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা গণ-এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অতিথিদের সম্মানার্থেই এই নৃত্য মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো।

যখন আমরা ঘরে ফিরলাম, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

চোদ্দ

লিচ্ছবি-অভিষেক

আমার সৎ-পিতা গণ-সংস্থার সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একজন নতুন সদস্য নির্বাচনের প্রয়োজন হলো। আমাদের কুল [বংশ]-এর গৃহমুখ্য আমাকেই সদস্য করার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু আমার খুড়তুতো ভাই অজিত সদস্য হবার জন্যে খুব আগ্রহী ছিলো। কুল-এর মধ্যে তারই কর্মান্তর পশু বেশী, সুতরাং সে মনে করতো সদস্য হবার যোগ্যতাও তার আছে। এই মতভেদের শেষ বিচার গণ-সংস্থাকেই করতে হবে। আমি অবশ্য নিজে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের কুল-এর গণপতি সুনন্দ আর সেনাপতি সুমন এই কথাই জোর দিয়ে বললেন যে —এখন গণ-এর সংকট-কালে সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকার করা ত্যাগস্বীকার নয়; লিচ্ছবিদের প্রতি কর্তব্যে বিমুখ হওয়া। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সরে দাঁড়ানোর মতলব ছাড়তে হলো। অজিতকে অনেকেই অনেক বোঝালো; কিন্তু সে কোনো কথাই শুনলো না। তার বিশ্বাস ছিলো, তার মামা সেনাপতি সুমন এবং অন্যান্য প্রভাবশালী আত্মীয় তাকে সাহায্য করবেন; সুতরাং গরীবের ছেলে সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার জয় সুনিশ্চিত।

অবশেষে একদিন সংস্থাগারে গণ-সন্নিপাত [অধিবেশন] হলো। মা আর কাকীর সঙ্গে রোহিণীও দর্শকের আসনে উপস্থিত ছিলো।

সংস্থার কাজ শুরু করে গণপতি সুনন্দ বললেন —পূজ্য গণ! শ্রবণ করুন। সদস্যপদের জন্যে আমাদের কাছে দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। জ্ঞাতৃ [জথরীয়] কুল-এর শূন্য স্থান পূরণ করতে আমাদের এর মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে হবে। সদস্যপদ প্রার্থীদের নাম ঘোষণার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাই। বর্তমানে লিচ্ছবিদের সামনে এক ভয়ানক সংকটকাল উপস্থিত। আমাদের সবসময় সেই সংকটকে স্মরণে রেখে কাজ করতে হবে। আমাদের সংস্থাকে আরো সুদৃঢ়, আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন —এ কথা মনে রাখতে হবে।

—পূজ্য গণ! সদস্যপদের জন্যে আমাদের কাছে দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে —সিংহ আর অজিত। দু'জনেই জ্ঞাতৃকুলজাত। আমরা এর মধ্যে মাত্র একজনকেই নির্বাচন করতে পারি। প্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন যে

গণ-এর মধ্যে দু'জনেরই পক্ষ সমর্থনকারী আছেন, না একজনের ? আয়ুষ্মান্ সিংহের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁরা 'হ্যাঁ' বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের চতুর্দিক থেকে 'হ্যাঁ','হ্যাঁ' শব্দ শোনা গেলো। তারপর যখন অজিতের পক্ষ সমর্থনকারী কেউ আছে কি-না জিজ্ঞাসা করা হলো তখনও পূর্বাপেক্ষা কম হলেও অনেকগুলি কণ্ঠের 'হ্যাঁ', 'হ্যাঁ' শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো।

অতঃপর গণপতি বললেন—পূজ্য গণ ! এখানে দুই আয়ুষ্মানের সমর্থনকারীই আছেন দেখা যাচ্ছে। তাই ছন্দ-শলাকা [ভোটের কাঠি] দ্বারা নির্বাচন ভিন্ন অন্য কোনো উপায় দেখছি না। প্রথমে আমি আয়ুষ্মান্ গণ-গণকের কাছে জানতে চাই, আজকের অধিবেশনে কতোজন সদস্য উপস্থিত আছেন ?

গণ-গণক জানালেন, আটশো বাহাত্তর জন।

গণপতি—পূজ্য গণ ! বজ্জীতে উপস্থিত গণ-সংস্থার প্রত্যেকটি সদস্যকে আজকের অধিবেশনের সংবাদ দেওয়া হয়েছিলো, অতএব যতোজন সদস্যের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব সকলেই এসেছেন। এখানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কেউ উন্মাদ রোগগ্রস্ত নয় তো ? যদি থাকেন, তাহলে তাঁর পাশের সদস্য সে কথা বলুন।—এই কথা বলে তিনি একটু নীরব হলেন। তারপর আবার বললেন—সমগ্র গণ নীরব। সুতরাং এখানে কোনো উন্মাদ নেই এইটাই সিদ্ধান্ত করছি। এবার বলুন—এখানে কোনো সুরামত্ত আছেন কি ? থাকলে তাঁর পাশের সদস্য সে কথা জানান।—আবার একটু অপেক্ষা করলেন গণপতি। তারপর বলতে শুরু করলেন—সমগ্র গণ নিঃশব্দ। অতএব ধরে নিলাম এখানে কেউ সুরামত্ত নেই।—এবার তিনি দুটি শলাকা হাতে তুলে নিলেন। সদস্যদের সেই শলাকা দুটি দেখিয়ে বললেন—পূজ্য গণ ! এই লাল আর কালো দু'রকম শলাকা—লাল শলাকা 'হ্যাঁ' অর্থাৎ পক্ষে এবং কালো শলাকা 'না' অর্থাৎ বিপক্ষে মত দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হবে। শলাকা-গ্রহায়ক [ভোটের শলাকা বিতরণকারী] দুটি পৃথক ডালিতে দু'রঙের আটশো বাহাত্তরটা করে শলাকা নিয়ে আপনাদের কাছে যাবেন। আমি যখন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবো, তখন আপনাদের অভিমত অনুযায়ী একটি করে ছন্দ-শলাকা তুলে নেবেন। দ্বিতীয় প্রার্থীর বেলায়ও ঠিক এইভাবে আপনাদের মতামত জানাবেন ! কিন্তু একটির বেশী শলাকা কেউ নেবেন না। যদি কোনো শলাকা মেঝেয় পড়ে যায়, তাহলে সেটা তুলে আয়ুষ্মান্ শলাকা-গ্রহায়ককে দিয়ে দেবেন।

—পূজ্য গণ ! আমাদের সেই পুরাতন দশ জন শলাকা-গ্রহায়কই এখানে উপস্থিত আছেন। যদি তাঁদের মধ্যে কারো প্রতি কারো অবিশ্বাস

থাকে, তাহলে সে কথা বলুন, অন্যথায় নীরব থাকুন।··· দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করছি···তৃতীয় বার··· ! পূজ্য গণ নীরব আছেন। অতএব পুরানো শলাকা-গ্রহায়কদের প্রতি সকলেরই আস্থা আছে এই সিদ্ধান্তই করছি।

—পূজ্য গণ ! শুনুন ! আয়ুষ্মান্ সিংহের নাম প্রথমে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। শলাকা-গ্রহায়ক আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছেন। যে আয়ুষ্মান্ নিজের ছন্দ [ভোট] আয়ুষ্মান্ সিংহকে দিতে চান, তিনি একটা লাল শলাকা তুলে নিন। যিনি তা চান না, তিনি একটা কালো শলাকা নিন।

শলাকা-গ্রহায়ক প্রত্যেক সদস্যের সামনে দু'রঙের শলাকার ডালি ধরতে লাগলেন। সদস্যরা সকলেই একটি করে ছন্দ-শলাকা তুলে নিতে লাগলেন। শলাকা বণ্টনের পর শলাকা-গ্রহায়ক ফিরে গেলেন।

গণপতি বললেন —পূজ্য গণ ! ছন্দ-শলাকা বণ্টন করা শেষ হয়েছে। যদি কোনো সদস্য শলাকা না পেয়ে থাকেন, বেশী পেয়ে থাকেন কিংবা উলটো-পালটা নিয়ে থাকেন, তিনি বলুন। যাঁরা ঠিকমতো পেয়েছেন তাঁরা নীরব থাকুন। ···দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করছি··তৃতীয় বার···। গণ নীরব আছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করছি সব সদস্যই ঠিকমতো শলাকা পেয়েছেন।

অতঃপর গণপতি লাল আর কালো শলাকাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে গণনা করলেন। পাঁচটি মাত্র লাল শলাকা অবশিষ্ট ছিলো, আর কালো শলাকা অবশিষ্ট ছিলো আটশো সাতষট্টিটা।

গণপতি ঘোষণা করলেন —পূজ্য গণ ! শুনুন। আমার কাছে অবশিষ্ট যে শলাকা ফিরে এসেছে তার সংখ্যা হলো লাল পাঁচটি আর কালো আটশো সাতষট্টি। এর অর্থ হলো আপনাদের মধ্যে মোট আটশো সাতষট্টি জন আয়ুষ্মান্ সিংহের পক্ষে নিজেদের ছন্দ [ভোট] দিয়েছেন। বিরুদ্ধে দিয়েছেন পাঁচ জন। কোনো সদস্যই নিরপেক্ষ থাকেননি। এইবার শলাকা-গ্রহায়ক আপনাদের কাছে যাচ্ছেন। আপনারা শলাকা ফেরত দিন।

শলাকা ফেরত এলে আগের মতোই ডালিতে রাখা হলো। গণপতি এবার অজিতের পক্ষে যাঁরা ছন্দ দিতে চান তাঁদের লাল এবং বিপক্ষে ছন্দ-দানকারীদের কালো শলাকা তুলে নিতে বললেন। একইভাবে ছন্দ গ্রহণের পর দেখা গেলো লাল শলাকা আটশো বাহাত্তরটাই ফিরে এসেছে, কিন্তু কালো শলাকা একটাও ফেরেনি। অর্থাৎ সকলেই অজিতের নির্বাচনের বিপক্ষে। পক্ষে একজনও নেই।

গণপতি ছন্দ গ্রহণের ফল ঘোষণা করে বললেন —পূজ্য গণ ! শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ সিংহ এবং আয়ুষ্মান্ অজিতের জন্যে ছন্দ-শলাকা গ্রহণের ফলাফল থেকে আমি এই সিদ্ধান্তই করছি যে, এই গণ আয়ুষ্মান্

সিংহকে নিজের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। অমাত্য-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি এখনি আয়ুষ্মান্ সিংহের অভিষেকের তারিখ জানাবো।

গণপতি অমাত্য-পরিষদের সঙ্গে পাশের একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি বললেন —পূজ্য গণ! আজ থেকে পঞ্চম দিনে আয়ুষ্মান্ সিংহের লিচ্ছবি-অভিষেক হবে।

সংস্থাগার থেকে বাইরে এলে সর্বপ্রথম আমাকে অজিতই দৃঢ় আলিঙ্গন করলো। সে বললো —ভাই সিংহ! ছন্দ যোগ্যতমের পক্ষেই গেছে, এতে আমি খুশী হয়েছি।

আমিও তাকে প্রত্যালিঙ্গন করে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম। অজিত কাছেই রোহিণীকে দেখে তাকেও সাধুবাদ জানালো। রোহিণী এগিয়ে এসে অজিতের শিরশ্চুম্বন করলো।

অতঃপর অজিত বললো —ভাই, আজ সন্ধ্যায় আমার গৃহে নিমন্ত্রণ রইলো। সেখানে জ্ঞাতৃকুল-এর তরুণ-তরুণীরা মিলিত হবে। তাছাড়া সেই উৎসবে আমি তক্ষশীলার নাগরিক-মণ্ডলীকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রোহিণী কথার মাঝখানে বলে উঠলো —আর ভামা বোনকে?

—ভামা জ্ঞাতৃকুল-এর নয়। তবু তুমি যখন বলছো, তখন তাকে এখনি বলছি। কিন্তু তুমি তার হাত থেকে আমার প্রাণটা আজ রক্ষা করো বৌদি।

—ভামা কি প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে না-কি? —রোহিণী হেসে জিজ্ঞাসা করলো।

—প্রাণ নিয়ে টানাটানিরও বেশী বৌদি। ভামা নিজের শিকারকে আছড়ে আছড়ে মারে। আমি একবার ভাগ্যের ফেরে ওর জালে পড়েছিলাম। তোমার কথাতেই তাকে নিমন্ত্রণ করছি, কিন্তু তুমি ভামার ব্যাক্যবাণ থেকে আমাকে রক্ষা করো বৌদি।

—নিশ্চয়। রোহিণী উত্তর দিয়েছিলো।

গণ-সংস্থার সদস্যরা আমার নির্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করলো এবং বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গন-প্রত্যালিঙ্গন চললো।

বাড়ী পেঁছে দেখলাম, ভামা আগেই সেখানে হাজির হয়েছে। সে প্রায় লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এলো। সত্যি বলতে কি, আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। অজিতের কথা আমার মনে পড়লো। ভামা আমাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে আমার কপালে, ভ্রূতে এবং গালে চুম্বন করলো। তারপর আমাকে ছেড়ে রোহিণীকে কোলে তুলে নিয়ে সজল নয়নে বহুক্ষণ ধরে নীরবে তার মুখচুম্বন করলো। রোহিণীর চোখও শুষ্ক ছিলো না।

ভামাই প্রথমে নীরবতা ভেঙে বললো —রোহিণী! প্রিয় রোহিণী! আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে! আমার গর্ব বোধ হচ্ছে। স্বল্পায়ু জীবনে খুব কম লিচ্ছবিই গণ-সংস্থার সদস্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের সিংহ সত্যিই এর যোগ্য! কিন্তু রোহিণী, হাসতে হাসতে অজিত কি বলছিলো তোমাকে?

- হাসতে হাসতে নয় বোন, পরে কাঁদতে কাঁদতেই বলছিলো।

—কি বলছিলো আমি শুনতে পারি কি?

—যা আমার কানে আসে, তা কি তোমায় না শুনিয়ে থাকতে পারি?

—তোমার এ বিশ্বাসের জন্যে ধন্যবাদ রোহিণী।

—ভামা বোন আমার! আমার না ছিলো সহোদর ভাই, না ছিলো সহোদরা বোন। এজন্যে আমার বড়ো দুঃখ ছিলো। কিন্তু তোমাকে পেয়ে আমার সহোদরা বোন না থাকার দুঃখ দূর হয়েছে। আমি কোনো কথাই আমার এই বোনটির কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই না।

বলতে বলতে রোহিণীর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। ভামা রোহিণীর গললগ্ন হয়ে টপ্ টপ্ করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললো —ভাই রোহিণী! তুমি আমার কতোখানি স্নেহের তা জানো। তোমাকে একদণ্ড না দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। মনে হয়, সহোদরা বোনের পক্ষেও হৃদয়ের যে স্থান দখল করা সম্ভব নয়, তুমি তা জয় করেছো।

রোহিণী —হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিলো। অজিতের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না? সে আমাকে আর সিংহকে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছে। তার বাড়ীতে আজ জ্ঞাতৃ-তরুণ-তরুণীদের উৎসব-আনন্দ হবে।

—জ্ঞাতৃ-তরুণ-তরুণীদের?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি কোনো নিমন্ত্রণ নিতেই পারি না, এ কথা তো জানো। তাই যখন আমি তোমাকেও নিমন্ত্রণ করতে বললাম তখন বেচারা ঘাবড়ে গেলো।

—বলো কি?

—তাই তো দেখলাম। সে বললো, এখনি নিমন্ত্রণ করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার বাক্যবাণ থেকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো!

—বটে রে অজিত! আমার বাক্যবাণ থেকে ত্রাণ পেতে চাও? তুমি তো তাকে কথা দাওনি রোহিণী?

—দিয়েছি ভাই!

—কাজটা ভালো করোনি। আমি একবার দেখতাম, সাত বার নাকে খৎ দিয়ে অজিত কেমন না আমাকে নিতে আসে।

—বোধ হয় এইজন্যেই সে তাড়াতাড়ি আমার কথা স্বীকার করে নিয়ে পরে আমাকে কথা দিতে বাধ্য করলো।

মা আর কাকীও আনন্দে মাতোয়ারা। অন্য একটা ঘরে তাঁদের মজলিস চলছিলো। সেখানে বৃদ্ধা লিচ্ছবি-নারীরা আমার নির্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন।

আমার প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে শূরসেন উত্তর সীমান্ত থেকে আজই এসে পৌঁছেছে। আমার গলা শুনে সে সোমার সঙ্গে ছুটে আমার কাছে এলো। তার চোখ ঘুমে এখনো ঢুলুঢুলু! মনে হলো সারা রাত ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, তাই এখন একটু ঘুমিয়ে না নিলে সে আর পারছে না। রোহিণীর ললাট চুম্বন করে, আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বললো —ভাই সিংহ! কালই সকালে তোমার ফেরার খবর পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়েছি।

—উত্তর সীমান্তে এখন তো আশংকার কোনো কারণ নেই শূরসেন?

—না ভাই! উত্তর সীমান্তে ভয় শুধু হাতী, সিংহ, গণ্ডারের। আমিই তো দুটো শেষ করলাম —কিন্তু তাড়াতাড়ি ছিলো বলে আর দাঁতগুলো আনতে পারলাম না। একটার দাঁত তো প্রায় চার হাত হবে! আমি সেটা রোহিণী বৌদিকে উপহার দেবো।

—রোহিণীকে দেবে, সিংহকে নয়? —কথার মাঝখানে বলে উঠলো ভামা —এ কি-রকম পক্ষপাতিত্ব?

শূরসেন —আর যদি আমি ভায়াকে ঐ উপহারটা দিতাম, অমনি ভামা বৌদি বলে উঠতো, পুরুষদের পক্ষপাতিত্বটা চিরকাল এমনিই।

—আচ্ছা, যেতে দাও! দাঁতটা বৌদির চরণেই অঞ্জলি দাও। কিন্তু সিংহের জন্যে কি তার গুঁড়োও রাখোনি?

—গুঁড়ো নয়, সিংহ ভাইয়ের জন্যে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল আসছে— একটা-দুটো নয়, একেবারে ছ'টা।

ভামা —তাই না-কি দেবর! তাহলে আমি তোমার বৌদি হয়েছি শুধু শুধুই! আমার হাজার হাজার চুম্বন ব্যর্থই হয়েছে!

শূরসেন —কিন্তু এখন তো বৌদি একটাও পেলাম না।

ভামা তখনি শূরসেনের গললগ্ন হয়ে তার মুখে কয়েকটি চুম্বন করে বললো —এই নাও দেবর। এইবার বলো।

শূরসেন অমনি নিজের কঞ্চুকের মধ্যে লুকানো একটা হাতীর দাঁতের খাপে ভরা ছোরা বার করে ভামার হাতে দিলো। তারপর নতজানু হয়ে করজোড়ে বললো —দেবী! দাস শূরসেনের এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন এবং তার বাহুতে বল দিন।

ভামা ছোরাটা দেখতে দেখতে স্মিতমুখে বললো —এবমস্তু দাস শূরসেন।

তোমার দেবী তোমাকে উঠে দাঁড়াতে এবং অসংখ্য চুম্বন করতে আদেশ দিচ্ছেন।

শূরসেন দাঁড়িয়ে উঠে চুম্বন করতে করতে ভামার গাল লাল করে দিলো। তারপর সকলেই ছোরার খাপে অংকিত চিত্র মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। সেটার একদিকে বুনো হাতীর দল আঁকা, হাতীর দাঁতালো দলপতিটিকে আঁকতে গিয়ে চিত্রকর তার দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। অপরদিকে গাছতলায় অংকিত আছে সিংহ-সিংহী আর তার শাবক—সিংহী শুয়ে আছে, সিংহ জিহ্বা দিয়ে তার প্রেয়সীর কর্ণমূল লেহন করছে, আর বাচ্চাটা মায়ের পুচ্ছ নিয়ে খেলা করছে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখে ভামা বললো—দেবর শূরসেন! এমন তীক্ষ্ণ ছোরা আর তার সুন্দর খাপের জন্যে সহস্র ধন্যবাদ। ভামী বৌদিকে এই উপহার দিয়ে তুমি সত্যিই প্রমাণ করেছো যে তার চুম্বনের মূল্য আছে তোমার কাছে।

—এ কথা খুবই সত্যি বৌদি! এই নীল কেশ, আয়ত নেত্রেরই যতো দোষ! সবার আগে এর কথাই মনে জাগে।

—তুমি যে বড়ো দেরী করে এলে দেবর! নাহলে এই কেশে মনোরথের বদলে তুমিই বাঁধা পড়তে।

—না বৌদি, দেরীতে কি আগে এসেছি জানি না—তবে ঐ কেশে বাঁধা পড়েছি ঠিকই।

—আমার অজ্ঞাতে?

—পতঙ্গ কী প্রদীপের জানার প্রতীক্ষা করে?

—এ কথা জেনে কি আর ঝাঁপ দেয় যে, ওখানে লেলিহান শিখা জ্বলছে, গন্ধ আসছে পলতে পোড়ার?

—তার কারণ পতঙ্গের তো আর নাক-চোখ বলে কিছু থাকে না বৌদি! পতঙ্গের আছে শুধু হৃদয়।

ভামা শূরসেনের মুখে আর একটা চুম্বন করলো। তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ আর রক্তিম গণ্ড দেখে মনে হয়—শূরসেন তার যোগ্য জুটিই হতে পারতো!

সন্ধ্যায় আমরা অজিতের বাড়ী তরুণ-তরুণীদের সম্মেলনে গেলাম। সেখানেও পান-গোষ্ঠী, নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন ছিলো। ওখানে একটা কথা জানতে পারলাম। যখন গল্প-সল্প চলছে, তখন একজন কথা প্রসঙ্গে নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের [জৈন মত-প্রবর্তক] বর্ণনা করতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কে?

অজিত—আমাদের জ্ঞাতৃকুল-এরই একজন, শ্রমণ [সাধু] হয়ে গেছেন।

আমি—আমাদের জ্ঞাতৃকুল-এর, অথচ আমি জানি না?

অজিত —সিদ্ধার্থের অনুজ। আজকাল বজ্জী দেশের বাইরেও চতুর্দিকে তাঁর তপোতেজের মহিমা কীর্তিত হচ্ছে।

আমি —তুমি তাঁকে দেখেছো অজিত ?

—কয়েকবার। গত বছর চৌমাসায় তিনি তো এখানেই মহাবনে ছিলেন।

—খুব তেজস্বী ?

—তেজস্বী-ওজস্বী তো আমি কিছু বুঝি না। তবে আমি দেখেছি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সর্বঋতুতেই তিনি নগ্ন থাকেন।

রোহিণী —নগ্ন ? স্ত্রীলোকদের সামনেও ?

অজিত —হ্যাঁ বৌদি। নিগ্রন্থ কথাটার অর্থই হলো —নগ্ন। আমি তো মাত্র দু'বার বাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই নগ্নতা দেখে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম।

রোহিণী —নগ্ন থাকা ছাড়া আর কোনো কিছু জেনেছো তাঁর সম্বন্ধে ?

অজিত —না। জানি না, আর জানবার চেষ্টা করতেও চাই না। তাঁর নগ্নতাতেই আমার হয়ে গেছে। বলো না ভাই সুভদ্র। তুমি তো নিগ্রন্থের একজন মস্ত চেলা, বৌদিকে শোনাও না কিছু।

সুভদ্র —অজিত! ধর্মে তোমার এতোটুকুও শ্রদ্ধা নেই। শ্রমণের [সাধুর] নিন্দা করতে তুমি খুব ভালোবাসো।

অজিত —শ্রমণের কথা বলো না ভাই সুভদ্র! তোমাদের নিগ্রন্থ বর্ধমান বা মহাবীর কি বলেন, সে কথা বৌদিকে বলো। বৌদি কাঁচা বুদ্ধির মেয়ে নয়, এ কথা জোর করেই বলতে পারি।

সুভদ্র —তাহলে তোমার মতে নিগ্রন্থের শ্রাবকরা [শিষ্য] সব অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, কেমন ?

অজিত —লজ্জাশূন্য !

সুভদ্রের মুখখানি রাগে লাল হয়ে গেলো। অজিত হাসতে হাসতে তার কাঁধে হাত রেখে বললো —ভাই সুভদ্র। তুমি তো আমাকে নাস্তিক বলো। সুতরাং তোমার কথা অনুসারেই বলছি, শ্রমণ মহাবীর জ্ঞাতৃপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা হতে পারে না। তবুও এ কথা স্বীকার করছি যে, তোমার শ্রদ্ধার ওপর আঘাত করা আমার অনুচিত। এর জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি বৌদির কৌতূহল নিবৃত্ত করো।

লক্ষ্য করলাম, খুব হর্ষ সহকারে ভামা অজিতের কথা শুনছিলো। তারপর যখন সুভদ্র গান্ধারী বৌকে নিগ্রন্থ-পুরাণ শোনাতে শুরু করলো, তখন ভামা অজিতের হাতটা চেপে কানে কানে বললো —শাবাশ বীর! এই ন্যাংটামির তুমি চমৎকার জবাব দিয়েছো।

অজিত তখনো ভামার জন্যে বেশ কিছুটা ভীত ছিলো। এই পরিবর্তনে সে খুব খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

সুভদ্র বললো —গান্ধারী বৌ! নগ্ন থাকা নিগ্রন্থ [জৈন]-দের তপের একটা অঙ্গ। দেহের তপস্যাই সবচেয়ে বড়ো তপস্যা। পাপ দূরীভূত করার এ এক মহৎ উপায়। শরীরকে শুষ্ক করলে, তাকে কষ্ট দিলে আমাদের পুরোনো পাপ দূর হয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দূর না হলে আমরা অনন্ত সুখের ভাগী হতে পারি না। তাই নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ মহাবীর তীর্থংকর বলেন —শ্রাবকগণ [শিষ্যগণ], জন্ম-জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে নিজের দেহ দিয়ে তপস্যা করো। শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করো। অনশন [নিরাহার-রত] করো।

রোহিণী —অনশন!

সুভদ্র —হ্যাঁ, অনশন। মহাবীরের অসংখ্য শ্রাবক-শ্রাবিকা চল্লিশ-পঞ্চাশ দিন অনশন করেন। অনেকে আমরণ অনশন করে জীবন শেষ করেন, আর এইভাবেই তাঁরা নিজেদের পুরোনো এবং নতুন পাপের সমাপ্তি ঘটান! এ পথ দুর্গম, কষ্টসাধ্য। কিন্তু সুখ থেকে তো সুখ পাওয়া যায় না। সুখ পেতে হলে প্রথমে দুঃখের পাহাড় পার হতে হয়। আমাদের সব দুঃখের কারণই হলো পাপ, তাকে দূর করার জন্যে কায়-দণ্ড দিতে হয়, তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীকেও হিংসা করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

রোহিণী —ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীকে হিংসা কথাটার অর্থ কি?

সুভদ্র —ভগবান্ মহাবীর সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী। অতীতে যা কিছু ছিলো, বর্তমানে যা কিছু আছে, ভবিষ্যতে যা কিছু হবে —কোনো কথাই তাঁর কাছে অজ্ঞাত নেই; তিনি চলতে-বসতে-শুতে, নিদ্রায়-জাগরণে, সব সময় সব কিছু জানতে পারেন। আমরা যা জানি না, সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ভগবান্ মহাবীর তাও জানেন। তিনি নিজের শ্রাবকদের [শিষ্য] বলেন, সর্বপ্রকার প্রাণী-হিংসা থেকে বিরত হতে হবে। আর সেই স্থূল-সূক্ষ্ম শুধু পিঁপড়ে থেকে হাতী পর্যন্তই নয় —জল, পৃথিবী, আগুন, বায়ু সর্বত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী আছে। তাছাড়া স্বয়ং বারি, স্বয়ং পৃথ্বী তো একেন্দ্রিয় জীব। এইভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কতো জীব-হিংসা করা হয় বৌ?

রোহিণী —গণনা করে তা নির্ণয় করা যায় না।

সুভদ্র —এইজন্যেই ভগবান্ মহাবীর বলেন, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আমরা অগণিত পাপ করে থাকি।

রোহিণী —আর এইজন্যেই জীবনটা পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুভদ্র —তাই তো ভগবান্ মহাবীর বলেন, এই নশ্বর জীবনকে পাপক্ষয়ের কাজে লাগাও।

রোহিণী —তাহলে নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের উপদেশ হলো সর্বপ্রকারের জীব-হিংসা ত্যাগ করো।

সুভদ্র —হ্যাঁ। মনসা [মননে], বাচা [বাক্যে], কর্মণা [কার্যে] কোনো জীবকে হত্যা করা তো দূরের কথা, সামান্যমাত্র কষ্ট পর্যন্ত দেওয়া অকর্তব্য।

রোহিণী —খুনী, হত্যাকারী শত্রুকে পর্যন্ত ?

সুভদ্র —তার নিজের পাপ তাকে দণ্ড দেবে। ধার্মিক নিগ্রন্থ শ্রাবকের [জৈন্য শিষ্য] দণ্ডদান করে পাপ অর্জন করা নিষ্প্রয়োজন।

রোহিণী —যদি কোনো আততায়ী কোনো আর্ত অনাথ স্ত্রী বা শিশুকে হত্যা করতে বা দূষিত করতে উদ্যত হয়, সেক্ষেত্রে নিগ্রন্থ তাঁর শ্রাবকদের কি করতে আজ্ঞা দেন ?

সুভদ্র —মনের সংযম, বাক্যের সংযম, দেহের সংযম।

রোহিণী —অর্থাৎ অকর্মণ্যতা। আততায়ীর হাতে নিজের ইজ্জত, লজ্জা, পৌরুষ সব কিছু সমর্পণ। আর এটাকে আপনারা ঠিক বলে মনে করেন ?

সুভদ্র —ঠিক বলে মনে তো করি, কিন্তু নিগ্রন্থ ধর্ম পুরোপুরি পালন করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়।

ভামা —অন্তত যে নিজেকে মানুষ বলে, তার তো একেবারেই সাধ্যায়ত্ত নয়।

ভামার স্বর কানে যেতেই সুভদ্র নিজের বাক্য-সংযম করলো।

এমনি করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের প্রীতি-মিলন, নিমন্ত্রণ, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে আমার অভিষেকের দিন এসে পড়লো। বৈশালীর অভিষেক-পুষ্করিণীতে স্নান-অভিষেক অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। গণ-সংস্থা যাকে সদস্য নির্বাচন করে, শুধু সেই এই পুষ্করিণীতে স্নান করার অধিকার পায়। বিদেশীরা এই অভিষেকের উল্টো অর্থ করে। তারা মনে করে, যার অভিষেক হয়ে গেছে সে রাজা হয়েছে। এইভাবে তারা বৈশালীর ন'শো নিরানব্বই জন রাজার কথাই বলে। অভিষেক-পুষ্করিণী লিচ্ছবিদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীনতম পুষ্করিণী —যখন বৈশালীতে প্রথম বসতি স্থাপিত হয়, তখন জঙ্গল কেটে এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। কিন্তু সেই পুরানো বসতি বিশাল হতে হতে বৈশালীর রূপ ধারণ করেছে, শুধু সেই পুষ্করিণী আগের মতোই রয়ে গেছে। যখন খুব অল্প-সংখ্যক লিচ্ছবি পরিবার ছিলো, তখন বয়স্ক হলেই প্রত্যেক লিচ্ছবি গণ-সংস্থার সদস্য হতো আর তার সূচনারূপে পূর্বপুরুষদের অক্ষুণ্ণ স্মৃতিচিহ্ন, তাঁদের দেহগন্ধে পূত এই মঙ্গল-পুষ্করিণীতে অভিষেক [স্নান] করানো হতো। তারপর লিচ্ছবিদের মূল নব কুল [ন'টি বংশ] বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে, প্রত্যেক

পরিবার থেকে একজন করে সদস্য নিলেও সদস্য-সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে যায়। তাই সংস্থার সদস্য-সংখ্যা ন'শো নিরানব্বই জন করা হলো। তখন থেকেই লিচ্ছবিদের জন্যেও এই পুষ্করিণীতে বিধিনিষেধ এবং কড়া পাহারার ব্যবস্থা হলো। তার ওপর তামার জাল বিছানো হলো, যাতে কোনো পাখীও এতটুকু জল পান করতে না পারে। এ নিয়ে প্রবাদেরও অন্ত নেই। কিন্তু কেউ যদি লুকিয়ে স্নান করেও, তাহলেই সে গণ-সংস্থার সদস্য হতে পারে না। তবে অভিষেক-পুষ্করিণীর গৌরব এবং তার উৎপত্তির কারণ পূর্ব-পুরুষদেরও গৌরব বৃদ্ধির জন্যে সেখানে সর্বসাধারণের স্নান করা নিষিদ্ধ। গণ-সদস্যরাও জীবনে মাত্র একবারই এখানে স্নান করতে পারেন।

ছোট হলেও এই পুষ্করিণীর জল খুব স্বচ্ছ এবং সুন্দর। তার চারি-দিকে ঘাট। জলে নানা বর্ণের পদ্ম। প্রতি বর্ষাকালে এর জল পালটে ফেলা হয়। সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণীতে মাছের ক্রীড়া আর কমলবনের সৌন্দর্য দেখার জন্যে অসংখ্য নর-নারী পাড়ে এসে ভীড় করে। যখন কারো অভিষেক হয়, পুষ্করিণীর চারিদিকে তোরণ নির্মাণ করে সাজানো হয়, ঘাট-গুলিকে পরিষ্কার করা হয়।

অভিষেকের দিন সমগ্র বৈশালীকে সজ্জিত করা হলো। সেদিন গণ-নক্ষত্র [মহোৎসব] ঘোষণা করা হয়েছিলো। অন্তর্বাসক [ধুতি] আর উত্তরীয় [চাদর] পরে আমি আগে আগে চলেছিলাম। আমার সামনে বাদ্যাদি আর পেছনে গণ-সদস্যরা এবং সর্বশেষে নগরের নর-নারীরা শোভাযাত্রা করে চলেছিলো। পুষ্করিণীর প্রধান ঘাটের কিছুটা দূরেই লোকজনকে থামিয়ে দেওয়া হলো। আরো আগে যাওয়ার অধিকার একমাত্র গণ-সদস্যদেরই আছে। পুষ্করিণী ঘিরে খড়্গধারী প্রহরীর দল দণ্ডায়মান। যখন আমি জলের ধারে সর্বশেষ সিঁড়িতে পৌঁছালাম, তখন গণপতি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমাকে 'লিচ্ছবি-প্রতিজ্ঞা' করালেন। সেই প্রতিজ্ঞাগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হলো—

"আমি লিচ্ছবি-গণের জন্যেই জীবনধারণ করবো, লিচ্ছবি-গণের জন্যেই মৃত্যুবরণ করবো।"

"গণ-সন্নিপাত [পার্লামেণ্টের বৈঠক] যা কিছু নির্ণয় করবেন, সর্বদা তাই আমি মান্য করবো।"

"প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত লিচ্ছবি-মর্যাদা আমি পালন করবো।"

প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর বাজনা বাজতে লাগলো, আমি পুষ্করিণীর জলে নামলাম। সে জল সাধারণ জল—এমন জল বজ্জী, গান্ধার বা যে-কোনো পুষ্করিণীতেই পাওয়া যেতে পারে। অন্য দেশের রাজধানীতে এর চেয়ে সুন্দর ঘাটযুক্ত পুষ্করিণীর অভাব নেই। এর চেয়ে সুন্দর কমলবনও ঢের

দেখা যেতে পারে। কিন্তু যখন আমি সে জল স্পর্শ করলাম, তখন আর তাকে সাধারণ জল বলে মনে হলো না। মনে হলো, প্রথম লিচ্ছবি থেকে সব লিচ্ছবি পূর্বপুরুষরা আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আমার দেহ স্পর্শ করছেন এবং সেই স্পর্শে আমার শরীরে নতুন বল, নতুন উদ্যম বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করে আমার কানে তাঁদের কথা ভেসে এলো—'আমরাও এই লিচ্ছবি-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের গর্ব এই যে, আমরা সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছি। আমরা লিচ্ছবি-খড়্গের তীক্ষ্ণতা বজায় রেখেছি। লিচ্ছবি-পতাকা কখনও অবনমিত হতে দিইনি। বৎস! তুমি কি এমনি করে নিজেকে লিচ্ছবি-পুত্র প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছো?' —আমি মনে মনে বললাম—নিশ্চয়। আমার লিচ্ছবি-রক্তই এর পর্যাপ্ত প্রমাণ। আজ লিচ্ছবি-পতাকার বড়ো সংকটকাল এসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার লিচ্ছবি-কর্তব্য পালন করবো। হে পিতৃগণ, এজন্যে শুধু তোমাদের আশীর্বাদ আর প্রোৎসাহ আমার প্রয়োজন।

জীবনে মাত্র একবারই এই পুষ্করিণীতে স্নান করা যায়। তাড়াতাড়ি করতে হবে, এমন কোনো নিয়মও নেই। তবে মাঘের জল বলে স্নানের পূর্ণ আনন্দ গ্রহণে বঞ্চিত হবো কেন? পুষ্করিণীর পাড়ে তেমনি বাজনা বাজছে, স্থানে স্থানে লোক নৃত্য করছে। এক জায়গায় রোহিণী আর ভামা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। তাদের মুখ বড়ো প্রসন্ন।

পুষ্করিণী থেকে উঠে নতুন উত্তরীয় আর অন্তর্বাসক পরে চুলগুলো জটার মতো পাগড়ী করে বাঁধলাম। তারপর ধনুক, তূণীর আর খড়্গ ধারণ করলাম। সদস্যরা অনেকে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। অবশেষে আমরা ওপরে উঠে এলাম। আমার ঘোড়া প্রস্তুতই ছিলো, তার ওপর উঠে বসলাম। অন্যান্য সদস্যরা কেউ রথে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে সকলে সংস্থাগারে পৌঁছালো। আজ সংস্থাগার বিশেষভাবে সজ্জিত। তার চারিদিকে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষে নতুন ফরাস বিছানো হয়েছে।

সদস্যরা সকলে উপবেশন করার পর গণপতি আজ থেকে আমাকে সদস্য বলে ঘোষণা করলেন। তারপর আমার যোগ্যতার প্রশংসা করে তিনি আমার দক্ষিণ-বাহিনীর সেনানায়ক হবার আভাষ দিলেন এবং সেনাপতি রোহণ সেনাগঠনের জন্যে বৈশালীতে থাকবেন বলে জানালেন। তিনি আরো জানালেন—আটাশ বছর বয়সে লিচ্ছবি-সেনানায়ক হওয়া, তাও আবার সবচেয়ে শক্তিশালী দক্ষিণ-বাহিনীর—এ ঘটনা এই প্রথম।

আমি গণপতির আজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—পূজ্য গণ! আপনারা আপনাদের এক তরুণকে যে সম্মান দিয়েছেন, সে তার যোগ্য বলে নিজেকে

মনে করে না। তবে সে একটিমাত্র কথা জানে — দক্ষিণের শত্রুকে বজ্জরী পবিত্র ভূমি অপবিত্র করার অবকাশ না দেওয়াই তার পরম কর্তব্য।

ভাষণের পর সংস্থাগারে গণ-ভোজ অনুষ্ঠিত হলো। সে ভোজে কেবল শিকারে প্রাপ্ত বন্য শূকর, হরিণ আর গবয়ের নির্ধূম অগ্নিতে ঝলসানো মাংস আর মেরয় ব্যবহার করা হয়েছিলো।

অভিষেকের আনন্দ তো ছিলোই, তার ওপর সেনানায়কের পদ লাভের বাড়তি আনন্দের হিল্লোল লাগলো আমার বাড়ীতে। রোহণ কাকা আজ সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। তিনি এ খবর আগেই জানতেন, কাজেই তাঁর আশ্চর্য হবার কিছু ছিলো না। তবে তিনি বললেন—বজ্জী আর মগধের সীমান্তে ভারী গোলমাল চলছে। রাত্রে গঙ্গা পার হয়ে এপারে এসে অনেক গুপ্তচর ধরা পড়েছে। আমাদের সঙ্গে বিরোধে কিছু আসে-যায় বলে মগধরাজ মনে করেন না; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য বলেই মনে হচ্ছে। তিন দিন পরে যুদ্ধ-পরিষদের বৈঠক হবে, তাই আমি বৈশালীতে এসেছি।

পনেরো

কর্মান্ত

সৎ-পিতার মৃত্যুর পর ঘর-সংসারের একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েছিলো। মাকে বলেছিলাম যে তাঁর সম্পত্তি সোমারই, সুতরাং সোমাই তা পাবে। আমার নিজের বাড়ীর মেরামত শেষ হয়ে গেছে। রোহিণীর পরামর্শ-মতো তার খিড়কী প্রভৃতির কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে উল্কাচলে [হাজীপুর] চলে যেতে হবে। তাই রোহিণীর ইচ্ছা, যাবার আগে যেন অন্তত একটা রাত নিজের ঘরে বাস করি। আমার নিজের কর্মান্তও [ক্ষেত] দেখতে হবে।

কর্মান্তে দেখলাম গম-যবের সবুজ ফসল ফলেছে। কর্মান্তে কর্মকররা ভালো আছে, আমার ক্ষেতে আবাদও ভালো হয়েছে আর গাই-বলদগুলোও বেশ সতেজ স্বাস্থ্যবানই আছে। কেবল অভাব একটা বাঁধের। এতো অল্প সময়ে তার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গোষ্ঠের দেওয়ালের কাঠগুলো আরো উঁচু করতে, ছাদের নীচে কাঠের টাটগুলো আরো দৃঢ় এবং ঘন করতে বলে দিলাম। আমবাগান দেখে রোহিণী খুব খুশী হলো, তখন অবশ্য তাতে কোনো ফল ছিলো না। কুল আর পেয়ারা ফল ধরেছে প্রচুর, তাও এখনো পাকার সময় হয়নি।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করলো আমরা আঙুর গাছ লাগাতে পারি না ?

এখানের লোকেরা মনে করে, এ মাটি আঙুরের উপযুক্ত নয়।

কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

—তাহলে আমার মালী কৃষ্ণকে বলে দেখো।

বুড়ো কৃষ্ণ এলে আমি তাকে বললাম —বাবা কৃষ্ণ, তুমি তো দেখছি এখন বড্ড বুড়ো হয়ে গেছো।

—তোমার তিন পুরুষকে দেখলাম পূজ্য মালিক। আর কতোদিন জোয়ান থাকবো বলো ! তোমার দাদু লক্ষ্মণ দুষ্ট মাগধী বণিকের কাছ থেকে আমাকে কিনে নবজন্ম দিয়েছিলেন।

— হ্যাঁ বাবা, তোমার শরীরটাও বড়ো শুকিয়ে গেছে। আমার শূকরের সংখ্যা তো অনেক দেখছি। এ বছর শীতকালে দু'তিনটে শূকরের মাংস নিশ্চয় খেয়ো, আর আমাকেও পাঠিয়ে দিয়ো।

—মালিক, এখন তো তুমি বেশ বড় হয়েছো। আমার মনে পড়ে তোমার ছেলেবেলার কথা। তখন তুমি কহ্নর [কৃষ্ণের] দাড়ি নিয়ে খেলা করতে। সেই ছোট্টবেলায় গরীব কহ্নর ওপর তোমার যেমন দয়া ছিলো, আজও তেমনি আছে।

আমি—তোমার নতুন মালিকানীকে দেখোনি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ—শুনেছি বটে, দেখার ভাগ্য হয়নি।

আমি—ওই কুলগাছতলা থেকে আসছে।

রোহিণী কপিলের সঙ্গে এসে পৌছাতেই আমি বললাম—রোহিণী! এই কহ্ন বাবা আমাদের তিন পুরুষের মানুষ।

—হ্যা মালিকানী। দাদা মালিক আমাকে বণিকের কাছ থেকে দাম দিয়ে কিনে উদ্ধার করেছিলেন। আর আমার মালিকানী ঠিক মালিকের মতোই হয়েছে। তোমাকে দেখেই মল্লিকা-কুমারীর অল্পবয়সের কথা মনে পড়ে। বুড়ো কহ্নর ওপর দয়া রেখো মালিকানী। আমি তোমাদের তিন পুরুষের দাস।

রোহিণী—তোমার ছেলেপুলে ক'টি কৃষ্ণ বাবা?

কৃষ্ণ—দশ বছর হলো বুড়ী মারা গেছে মালিকানী! সেই থেকে আমার মন বড়ো উদাস হয়ে গেছে। যখন সে জোয়ান ছিলো, তখন ৫০ কার্ষাপন দিয়ে দাদা মালিক তাকে কিনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কহ্ন, এই দেখ্, তোর জন্যে বৌ এনেছি। আর মালিকানী, সে একেবারে ঠিক বৌয়ের মতোই ছিলো। সে আমার মতো কালো নয়, বড়ো সুন্দর, পরিষ্কার তার ভেতর বাইরে দুই-ই সাফ ছিলো। মালিকানী মল্লিকাকে সে পঁচিশ বছর সেবা করে গেছে—

রোহিণী—আর ছেলেপুলে?

কৃষ্ণ—একটা গ্রাম বসাবার মতো হবে মালিকানী। নাতিপুতি পর্যন্ত আছে। মালিক যদি বেচে দিতেন, তাঁর কতো যে ঘোড়া কেনার টাকা হয়ে যেতো, তার ঠিক নেই।

রোহিণী—কিন্তু তাতে তোমার কি বিষম দুঃখই না হতো!

কৃষ্ণ—আমাদের দাসের দুঃখ আর কতোক্ষণের মালিকানী। সেই রাক্ষস বণিকদের শাসনের কথা আর বলো না! পিঠের ওপর তার পাঁচটা দাগ এখনো আছে।

কালো চামড়ার ওপর সাদা চিহ্নগুলো দেখিয়ে সে আবার বললো লোহা পুড়িয়ে লাল করে দাগ দিয়েছিলো।

রোহিণী সহানুভূতি প্রকাশ করে বললো—লোকটা নিশ্চয় খুব নির্দয় ছিলো। এমন কি অপরাধ আছে যার জন্যে মানুষের ওপর এই অত্যাচার করতে পারা যায়?

কৃষ্ণ —মালিকানী! দাসের ওপর কে আর দয়া দেখায়! বৎস [অন্তর্বেদের নিম্নাঞ্চল] দেশের কৌশাম্বীতে জন্মেছি, মায়ের সঙ্গে কাশীতে বিক্রী হয়েছি, একটু বড়ো হতেই মগধের সেই বণিকটা কিনে নিয়েছিলো। মার সব জায়গাতেই খেতে হয়; কিন্তু ঐ বণিকটা ছিলো একেবারে রাক্ষস প্রকৃতির।

রোহিণী – কিজন্যে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিলো বাবা ?

কৃষ্ণ —ছ'মাসের পুরোনো মাটির ঘড়া ছিলো মালিকানী! ছ'মাসে খুব ভালো ঘড়াও কমজোর হয়ে যায়, কিন্তু বণিকটা ছিলো বড়ো কঞ্জুস। সবচেয়ে সস্তা ঘড়াই কিনতো। তার সংসারে আর কেউ ছিলো না। কে জানে কেন —মগধের রাজার জন্যে না কার জন্যে সে ধন সঞ্চয় করতো! একদিন আমি জল ভরতে গেছি, ঘড়ার মেখলা [ঊর্ধাংশ] হাতের মধ্যে রয়ে গেলো, আর নীচের অংশটা কুয়োয় ডুবে গেলো। ব্যস্, এই আমার অপরাধ।

রোহিণী —এই সামান্য কারণে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলো ?

কৃষ্ণ —হ্যাঁ মালিকানী। আমি ছটফট করছিলাম, কিন্তু পিশাচ আমাকে বেঁধে রেখেছিলো। এমন করে দাগিয়েও খুশী না হয়ে সে আমাকে গালমন্দ করছিলো। এমন সময় দাদা মালিক সেই বণিকের কাছে কিসব জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলেন। তিনি বণিককে জিজ্ঞাসা করলেন —এই দাসকে বেচবে ? বণিক উত্তর দিলো —হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাও। দাদা মালিক বললেন —কতো দাম নেবে ? তাতে বণিকটা জানালো —তিন কুড়িতে একে কিনেছিলাম। কিন্তু কথাটা মিথ্যা, সে আমাকে দু'কুড়িতে কিনেছিলো। আমি দাদা মালিককে সে কথা বলে দিতাম, কিন্তু আবার লোহা দিয়ে দাগাবার ভয়ে চুপ করেই রইলাম। সত্যি মালিকানী, রাজাদের রাজত্বে দাসকে খুন করলেও কেউ কিছু বলবে না। লিচ্ছবি-গণের কথা আলাদা। এখানে মনেই হয় না যে, আমরা দাস। এমন করে লোহা দিয়ে দাগানো এখানে কারো কাছে কখনো শুনিনি। তাছাড়া যে দাস একবার বজ্জীতে এসেছে, তাকে আর বাইরে কোথাও বেচতে পারা যায় না। এখানে দাস নেই —দাস দেখতে হলে মগধে দেখো, কাশীতে দেখো। ওসব জায়গায় দাসকে আর বুড়ো বয়েস অবধি বাঁচতে হয় না।

রোহিণী —কি বলছো বাবা!

কৃষ্ণ —তোমাদের দেশে দাস কেমন হয় মালিকানী ?

রোহিণী —আমাদের দেশে দাস নেই বাবা।

কৃষ্ণ —দাস নেই! আছে নিশ্চয়, তবে হয়তো এখানের চেয়েও ভালো ব্যবহার করা হয়।

রোহিণী —না বাবা। আমাদের দেশে মানুষ বেচা-কেনা চলে না। কোনো দাস আমাদের গান্ধার-ভূমিতে পা রাখলেই অদাস হয়ে যায়।

কৃষ্ণ —ঠিক ধরেছি মালিকানী! তাইতো আমার সন্দেহ হচ্ছিলো, এতো রূপ মনুষ্যলোকে কোথায় পাওয়া যায়? তাহলে ছোট মালিক ওখান পর্যন্ত গিয়েছিলো! আমরা তো ভেবে অস্থির, এতো বছর হয়ে গেলো, তবু ছোটো মালিক ফিরে এলো না।

রোহিণী —কোথায় চলে গিয়েছিলো কৃষ্ণ বাবা?

কৃষ্ণ —ঐ তোমাদের লোকে, যেখানে দাস অদাস হয়ে যায়। এ রূপ সেই লোকেরই যোগ্য বটে! আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিলো।

রোহিণী —কি সন্দেহ হয়েছিলো?

কৃষ্ণ —ঐ, যেখানে দাস অদাস হয়ে যায়। আজ বুড়ো মালিক বেঁচে নেই, নাহলে এমন বৌ —বলতে বলতে চোখের জলে ভেসে কৃষ্ণ প্রশ্ন করে বসলো —কিন্তু মালিকানী! তুমি তো আমার ছোট মালিককে ছেড়ে আবার নিজের লোকে চলে যাবে না?

রোহিণী —এসব কি বলছো বাবা! এই আমার স্বামী, বজ্জী আমার দেশ —আমি এদের ছেড়ে কোথায় যাবো?

কৃষ্ণ —তোমার লোকের কথা যা শুনেছি মালিকানী, তাতে বড়ো ভয় হয়। তবে তুমি যখন বলছো এখান ছেড়ে যাবে না, তখন বিশ্বাস করছি। সত্যিই চলে যাবে না তো মালিকানী?

—স্বামীকে ছেড়ে যাবো কোথায়?

-সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না মালিকানী। তোমার মুখ থেকে শুধু এই কথাই শুনতে চাই, তুমি বরাবর ছোট মালিকের কাছে থাকবে।

—বরাবরই থাকবো।

অত্যন্ত খুশী হয়ে কৃষ্ণ বললো —আমার বড্ড ভয় হয়েছিলো মালিকানী।

- কেন?

—তোমাদের সেই লোকের কথা শুনে, যেখানে দাস অদাস হয়ে যায়।

—কি ভয় হয়েছিলো?

—ওখানের প্রেম চিরস্থায়ী হয় না।

—ছিঃ কৃষ্ণ! তুমি এসব কি বলছো? আমার কথায় তোমার বিশ্বাস নেই?

—এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে মালিকানী। বুড়ো কহ্নর ওপর রাগ করো না। সে আর ক'দিন বাঁচবে! আমি শুধু আমার মালিকের জন্যে তোমার কাছে এই কথা আদায় করলাম।

—নাহলে কি তুমি ভেবেছিলে আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবো ?

—কি জানি ! সেই লোকের কথা তো এইরকমই শুনি।

রোহিণী বুড়োর কথা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তাই আর একবার ভালো করে বোঝবার জন্যে প্রশ্ন করলো —বাবা ! আমি কোথা থেকে এসেছি বলে তোমার মনে হয়।

—আমাকে কেন ভোলাতে চাইছো মালিকানী। বুড়ো কর সে কথা ভালো করেই জানে।

—তাহলে বলো তুমি আমাকে কি ভেবেছো ?

—বলতে আর বাধা কি ! তুমি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছো মালিকানী যে, সেখানে গেলে দাস অদাস হয়ে যায়। সে লোক দেবলোক ছাড়া আর কী হতে পারে ?

—তাহলে তোমার বিশ্বাস, আমি দেবলোক থেকে এসেছি ? আমি দেবলোকের অপ্সরা ? হ্যাঁ বাবা ?

—ঠিক বলেছো মালিকানী।

—তাহলে এখন আর আমি চলে যাবো বলে তোমার ভয় নেই তো ?

—না। দেবকন্যারা কক্ষনো মিথ্যা কথা বলে না। যদি না থাকতে, তাহলে কথাই দিতে না।

—তুমি তো তোমার ছেলেপুলের কথা কিছু বললে না।

—এক কুড়ি ছেলে নাতি, তার চেয়ে বেশী মেয়ে নাতনী, বৌ। সকলেই মালিকের কম্মন্ত [ক্ষেত] দেখাশোনা করে। বড়ো মালিক বেঁচে থাকতে থাকতে বেশীর ভাগকেই অদাস করে দিয়ে গেছেন। আমাকেও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম —মালিক, এ জন্মে আর আমাকে অদাস করো না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তবে তাঁকে রাজী করিয়েছিলাম।

—তাহলে এখন তোমার বংশে দাস-দাসী কতোজন ?

—দশ জন। পাঁচ জন পুরুষ, পাঁচ জন মেয়ে। বড়ো মালিকানীর সেবা করতে এক নাতনীকে দেখেছেন। আর ঐ রাধা —বাগানে বোধ হয় ওকে দেখেছেন, আঠারো বছর বয়েস, কিন্তু আমার মতো এতো কালো নয়। ওর ঠাকুমা তো কালো ছিলো না। মেয়েটা ভারী চালাক-চতুর। আমি যেদিনই মালিকানীর আসার খবর শুনেছি, সেইদিনই বলেছি —রাধা, তুই মালিকানীর দাসী হবি।

—আমার দাসী ?

—হ্যাঁ মালিকানী। রাধা বড়ো চালাক মেয়ে। বড়ো মালিকানী

এখানে এলে ও-ই তাঁর সেবা করে। তিনিও বলেছেন রাধা, তোকে বৌয়ের দাসী হতে হবে।

—দাসী !

—সে তো দাসীই বটে। আমার সারা পরিবারই দাস। বড়ো মালিক আমাদের বেশীর ভাগকেই অদাস করে দিলেও আমরা তো নিজেদের মালিকের বাড়ীর দাস বলেই মনে করি।

—কিন্তু বড়ো মালিক তো আর তোমাদের বেচা-কেনার অধিকার রাখেননি কৃষ্ণ বাবা।

—তা ঠিক। তিনিও অদাস করে দিয়েছেন, সারা দুনিয়াও অদাস বলবে। কিন্তু আমি আমার ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিয়েছি। তারা সকলেই নিজেকে মালিকের দাস বলে মনে করে।

—তাহলে তুমি কি মনে করো কৃষ্ণ বাবা যে দরকার হলে আমি তোমার পরিবারের কাউকে বেচতে পারি ?

—তুমি কাউকে বেচবে না মালিকানী, সে আমি ভালো করেই জানি। আর ভগবান্ তেমন দুর্দিন কখনও এমন সংসারে দেবেনও না। তবে যদি দরকার হয়, আমার বংশের সবাই মালিকের জন্যে বিক্রী হতে প্রস্তুত।

—না কৃষ্ণ বাবা ! আমি অদাস না করে কাউকে আমার সংসারে রাখবো না। কি বলো প্রিয় সিংহ ?

আমি এতোক্ষণ চুপ করে তাদের কথাবার্তা শুনছিলাম আর দেখছিলাম, অপ্সরা মালিকানীর কথা কৃষ্ণের কাছে কেমন অথৈ সমুদ্রের সঙ্গীতের মতো মনে হচ্ছে।

আমি বললাম —নিশ্চয় প্রিয়ে। যারা আমাদের কাছে কাজ করতে চাইবে তাদের কর্মকরের মতো ভাতা, বেতন নিয়ে কাজ করতে হবে।

—কাজ করতে দেবে তো মালিক ?

আমি —কাজ তো নিশ্চয়ই দেবো কৃষ্ণ। কিন্তু আমি তাদের বেচবো না. আর বিক্রীর অধিকারও আমার বংশে রাখবো না।

বুড়ো স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললো—দেবকন্যা মালিকানী, এ দেশটাকেও তুমি ঠিক তোমার লোকের মতো করতে চাও, তাই না ? আমাদের মালিকের দাসেরা তো দাসের মতো নেই, বরং তারা খাঁটি কর্মকরের মতোই কাজ করে।

—দাস আর কর্মকরের কাজে কি খুব বেশী তফাৎ হয় বাবা ?

—অনেক তফাৎ হয় মালিকানী। কর্মকর [কর্মচারী] ভালো কাজের জন্যে ভালো মাইনে, খারাপ কাজের জন্যে কম মাইনে পায়, ভালো করে কাজ না করলে, তাকে কেউ কাজে রাখে না। কিন্তু দাস তো ঘরের বলদ। তাকে মারপিট করা যায়, গালিগালাজ দেওয়া যায়। তবু দাস যদি ঠিক মতো কাজ

না করতে চায়, তবে মারপিট করে তাকে দিয়ে কাজ আদায় করা যায় না। সে যদি কাজ কেবল খারাপ করতেই থাকে, তাহলে কতো আর মারবে? একেবারে মেরে ফেললে তো নিজের পুঁজিই নষ্ট হবে। ভালো কোনো কাজ দাস দিয়ে করানো হয় না মালিকানী। সে তো জিনিসটাকেই নষ্ট করে দেবে। সে যে একটা বড়ো কাজ করবে, তাতে তার তো আর কিছু বেশী মিলবে না। অবশ্য এসব কথা তোমার দাসের বেলা খাটে না।

—আমার দাস আর দাস থাকবে না বাবা। আজ আমি সকলকে, এমন কি তোমাকেও অদাস করে দিয়ে যাবো।

—আমাকে বাদ দাও মালিকানী। বড়ো মালিকও আমাকে বাদ দিয়েছিলেন।

সজল চোখে, ধরা গলায় সে বলতে লাগলো —আমাকে অদাস করো না। আমি এ বাড়ীর দাস থেকেই মরতে চাই।

আমি —কৃষ্ণ বাবা। অদাস হবার মানে এই নয় যে, তোমার কাছ থেকে আমার সংসারের কাজ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার মালিকানী যে দেশ থেকে এসেছেন, সেখানে দাস নেই জানো তো!

—হ্যাঁ মালিক, এ কথা আমি খুব জানি। আর একটা কথা, মালিকানী তোমার কাছে চিরকালই থাকবেন।

আমি —তাহলে বাবা দেখো, মালিকানী তোমার কথা মেনে নিয়ে আমার কাছে চিরকাল থাকবে কথা দিলো। এখন তারও একটা কথা তো তোমায় মানতে হবে। দাসের সঙ্গে থাকা তোমার মালিকানীর অভ্যাস নেই। সুতরাং ও যা বলছে, তাই করো। তুমি ঠিক এখনকার মতোই কাজ করবে, তুমি সারা জীবন আমাদের কাছেই থাকবে কৃষ্ণ বাবা। কিন্তু মালিকানীর প্রাণে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আজই দুপুরবেলা তোমার পরিবারের ছোট-বড়ো যতো দাস-দাসী আছে, সকলকে নদীতে স্নান করে আসতে বলবে, তুমিও স্নান করে আসবে। এবার তোমার মালিকানীর কাছে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করো।

কৃষ্ণ —তাহলে মালিক তোমার ঘরে আমি এখনকার মতোই থাকতে পাবো তো?

আমি ও রোহিণী —হ্যাঁ, ঠিক এমনি বিশ্বাসের পাত্র, কিন্তু কর্মকরের মতো —দাসের মতো নয়।

'আচ্ছা' বলে কৃষ্ণ মাথা নীচু করলো।

রোহিণী বললো —প্রিয়, তোমার কর্মান্তের সর্বার্থককে বলে দাও, সব দাস যেন আজ দুপুরে নদীতে স্নান করে আমাদের কাছে আসে।

আমি সর্বার্থককে ডেকে মালিকানীর আদেশ শুনিয়ে দিলাম।

রোহিণী বৃষ্ণকে বললো—বৃষ্ণ বাবা, তোমার বাগানটা তো বেশ সুন্দর দেখছি।

—হ্যাঁ মালিকানী। তোমাদের কাছে আমাকে বিক্রীর আগে বণিকটা আমাকে কাশীরাজের বাগানে কাজ করতে পাঠাতো।

—পরের কাজ করতে?

—হ্যাঁ, দাসের কাজের মজুরীটা মালিকই পায় কি-না, তাই।

—তাহলে তো বাগানের কাজ তোমার আগে থেকেই জানা আছে।

—আরো কয়েক বছর থাকলে আরো শিখতে পারতাম। আমি তোমার বাগানে আম, জাম, জামরুল, কুল, আমলকী ঠিক বারাণসীর মতো করে লাগিয়েছি। এই যে কুল দেখছো, এ কুল বারাণসীর। একটা কুল একবারে মুখে পোরা যায় না, এতো বড়ো। আর তেমনি মিষ্টি। পেয়ারাও বারাণসীর মতো—যেমন বড়ো, তেমনি মিষ্টি, বীজ খুব কম। আমের কথা আর কি বলবো, পাকলে দেখতেই পাবে।

—তাহলে তো বাবা তুমি খুব ভালো ভালো ফলের গাছই লাগিয়েছো।

-হ্যাঁ মালিকানী। বড়ো মালিকের ফলের খুব শখ ছিলো, আমাকে নৌকা করে বারাণসীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিথ্যে কথা কেন বলবো, অনেক কষ্টে, রাজার মালীকে অনেক ভেট-টেট দিয়ে তবে ওখান থেকে বেছে বেছে ভালো ভালো চারা আনতে পেরেছি। রাজা চায় না যে তার বাগানের মতো ফল অন্য কোথাও থাকুক। কিন্তু মালিকানী, আমার বড়ো মালিক আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন, নিজের বাগানের জন্যে যে কেউ চারা বা বীজ চাইবে, তাকে দিয়ে দেবে।

—আর তুমিও দিয়েছো, না বাবা?

—দিয়েছি তো মালিকানী, কিন্তু ওরা যত্ন করতে জানে না। বৃক্ষও সেবা চায়, আর সেই সেবা কোনো অভিজ্ঞ লোকের কাছে শিখে নিতে হয়।

—তুমি কি বাবা কাউকে মালীদের এ বিদ্যা শেখাওনি?

—শেখাতে তো চেয়েছি, কিন্তু অসংখ্য লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'জনের শেখার মতো যোগ্যতা ছিলো। তার মধ্যে আবার তিন জন আমারই ছেলে, নাতি। আমার মৃত্যুর পর তারাই বাগান ঠিক দেখাশোনা করতে পারবে।

—আচ্ছা বাবা, এইবার তোমাকে কতকগুলো ফলের কথা জিজ্ঞাসা করবো। সেগুলো এখানে দেখাই যায় না।

—কি ফল মালিকানী?

—আঙুর, কমলা লেবু, ডুমুর, আপেল, আখরোট, এইসব আর কি।

—এর মধ্যে তো কতকগুলোর নামও শুনিনি মালিকানী। তাছাড়া আর একটা কথা হলো, প্রত্যেক গাছই নিজের মতো মাটি, জল, হাওয়া চায়।

অতোটা ভালো না হোক, বীজ পেলে গাছ তৈরী করতে পারবো না কেন ? আমি তোমার কথা বুঝেছি মালিকানী, চারা পেলে লাগিয়ে দেখতে পারি।

—চারা তো বাবা এখানে আনা সম্ভব নয়। আমার কাছে বীজ আছে।

—দাও মালিকানী। আমি লাগিয়ে দেখবো। আমি যখন প্রথমে ডালিম, নাশপাতি লাগাই, তখন অনেকে হেসে বলেছিলো —কহ্ন পাগল। ও গাছ এখানে হবে না। কিন্তু ঐ পূবদিকের বাগানে দেখো, কি ফলটাই না দিচ্ছে। অনেকে বলে —ততো মিষ্টি নয়। কিন্তু আমার তো মনে হয় খুব মিষ্টি।

—একটু কম মিষ্টি হলেও ক্ষতি নেই বাবা। নতুন নতুন ফল তো নিজের দেশে জন্মাবে।

—দাও, আমাকে বীজ দাও মালিকানী। আমি চুন, নুন, মাটি বদলে বদলে দেখবো কিসে চারা ঠিকমতো বাড়ে। যখন থেকে বড়ো মালিক নেই, তখন থেকেই কহ্ন অনাথ হয়ে গেছে।

—অনাথ ?

—অনাথ হয়েছি বলছি এইজন্যে যে, নতুন নতুন ফল, চারা, ফুল করাবার আর কেউ নেই। নতুন কাজে, নতুন পরীক্ষায় কহ্নর মন খুব আনন্দ পায়। তাহলে কবে বীজ পাঠাবে ?

—পরশু। কিন্তু শীতের শেষে লাগাবে তো ?

—আমি অল্প অল্প করে লাগিয়ে দেখবো। তবে গ্রীষ্মের শেষেই ভালো হবে।

আঙুর কিন্তু লতা বাবা।

—বড়ো হলে ঠাণ্ডার ব্যবস্থা করবো।

ওদের কথা শেষ হয়েছে দেখে এবার আমি বললাম —এবার আমাদের দুপুরের খাওয়াটা সারতে হবে রোহিণী। শূকর-মার্দব গরম থাকতে থাকতেই খেতে ভালো লাগে, না বাবা ?

—হ্যাঁ মালিক, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ওর অর্ধেক স্বাদই নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে পোষা বাচ্চার মাংস।

—তাহলে কৃষ্ণ বাবা, আমরা খেতে যাচ্ছি। তোমার পরিবারের সকলে নদীতে নেয়ে আসছে, তুমিও তাদের সঙ্গে নেয়ে এসো।

—আমাকে কি বাদ দেবে না মালিক ?

—আবার তুমি তোমার দেবকন্যা বৌকে দুঃখ দিতে চাইছো বাবা ?

—না মালিক। আমি মালিকানীর কথা নিশ্চয় শুনবো। এখনি নেয়ে আসছি।

আমরা দু'জনে কর্মান্ত ঘরে গেলাম। খাদ্য প্রস্তুতই ছিলো। ভিজে

কালো চুলগুলো শুকোবার জন্যে পিঠের ওপর ছড়িয়ে ধূসরবর্ণা এক তরুণী আসন ঠিক করছিলো। রোহিণী তাকে জিজ্ঞাসা করলো —তোমার নাম কি ?

—রাধা, মালিকানী। বলেই সে তাড়াতাড়ি নিজের চুলগুলোকে সাপটে বেঁধে ফেললো।

—রাধা তোমার নাম। মাংস রাঁধতে জানো তো ?

—বড়ো মালিকানী যখন আসেন, তখন সূপকারের [রাঁধুনী] কাজ আমিই করি। আজকের শূকর-মার্দব রান্নাতেও আমার একটু হাত আছে মালিকানী।

—তাহলে তাড়াতাড়ি খাওয়াও দেখি। আমাদের দু'জনেরই খুব খিদে পেয়েছে।

—সব তৈরী আছে মালিকানী।

ভোজন শেষ হলে বৈশালী থেকে আনা কাপড়ের গাঁটরিটা খুলে ফেললাম। তারপর সর্বার্থককে ডেকে দাস-দাসীদের সংখ্যা জেনে নিয়ে প্রত্যেকের জন্যে দু'খানা করে কাপড় বার করলাম। কিছুক্ষণ পর সপরিবারে কৃষ্ণ এসে পৌঁছালো। তাকে কাছে ডেকে রোহিণী বললো —আজ তোমাদের সকলকে আমরা অদাস করে দিচ্ছি। এখন থেকে আর তোমরা দাস-দাসী রইলে না। যদি ইচ্ছা হয় আমার এখানে কাজ করো, নাহলে অন্য জায়গায় কাজ করতে পারো। কাজ করলে কাজের অনুপাতে ভাতা [ভাত] আর বেতন পাবে। এখন এসো, তোমাদের পরার জন্যে আর গায়ে দেবার জন্যে দু'খানা করে কাপড় দিচ্ছি। আজ সারা কর্মান্তের কর্মকর মালিকের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজন করবে।

প্রথমে কৃষ্ণ বাবাকে দু'খানা কাপড় দেওয়া হলো। তার দু'চোখ দিয়ে তখন জল ঝরছে। তারপর অপর সকলকেও কাপড় দেওয়া হলো। রাধা সলজ্জভাবে সকলের শেষে এসে দাঁড়ালো।

রোহিণী কাপড় দিতে দিতে বললো —রাধা, তুমি আমার কাছে কাজ করবে ?

—কাজ যদি করতে দেন তো নিশ্চয়ই করবো মালিকানী।

—তাহলে তুমি আজ থেকেই আমার কাছে কাজ করো। আমার সঙ্গে বৈশালীতে চলো।

রাধা খুশী হয়ে উঠলো —আচ্ছা মালিকানী।

ষোলো

যুদ্ধ পরিষদ

যুদ্ধ-পরিষদে যোগ দেবার জন্যে মাত্র সেদিন কর্মান্তে থেকে আমাকে বৈশালীতে চলে আসতে হলো। কর্মান্তের সকলেই তাদের দেবকন্যা মালিকানীর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, বিশেষ করে বুড়ো কৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। যদি কেউ বলে যে তার মালিকানী দেবকন্যা নয়, মানবী, তাহলে আর রক্ষা নেই। সে জোর গলায় বলে —আমি তার নিজের মুখ থেকে শুনেছি, সেটা এমন লোক যেখানে দাস অদাস হয়ে যায়।

বৈশালীতে ফিরে আমি আমার পৈতৃক বাড়ীতে উঠলাম। রোহণ কাকা যুদ্ধ-প্রস্তুতি বিষয়ে আগে অনেক কথা শোনালেন এবং এ কথাও বললেন যে, শুধু বিম্বিসার হলে হয়তো এ যুদ্ধই বাধতো না। কিন্তু তাঁর ছেলে অজাতশত্রু তাঁকে অনবরত উস্কানি দিচ্ছে, আর সেইজন্যেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হবে। কাকা আরো বললেন, বিম্বিসারের মহামন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষাকার একজন বড়ো কূটনীতিজ্ঞ। এখানের সব কিছুর খবর জানবার জন্যে তিনি অসংখ্য লোকের ব্যবস্থা করেছেন। মগধের তেমন ভালো সৈনিক বা সেনাপতি নেই, কিন্তু বর্ষকারের মতো কূটনীতিজ্ঞ আছে। আর এইটাই আমাদের সবচেয়ে ভয়ের কথা।

সেনাপতির অধিকরণ-এ [কার্যালয়ে] যুদ্ধ-পরিষদ বসলো। তাতে সেনাপতি সুমন, চারজন লিচ্ছবি সেনানায়ক —আমি এবং অপর তিন জন উপস্থিত ছিলাম। এর মধ্যে একজন ছিলেন সামরিক গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ।

সেনাপতি সুমন পরিষদের কাজ আরম্ভ করে বললেন —লিচ্ছবি সেনানায়কগণ! বজ্জীর বিরুদ্ধে মগধের যুদ্ধ-প্রস্তুতি যেভাবে চলছে, তার এক মাস পূর্বের সমস্ত সংবাদই গত পরিষদে আপনারা অবগত হয়েছেন। এখন চর-বিভাগ থেকে মগধের যুদ্ধ-প্রস্তুতি বিষয়ে আর যা কিছু জানা গেছে, সে কথা আমাদের জানাবার জন্যে সেনানায়ক পুষ্পকে অনুরোধ করছি।

সেনানায়ক পুষ্প হৃষ্টপুষ্ট পঞ্চান্ন বছরের বীর সৈনিক। তাঁর মুখমণ্ডল মাংসল নয়, মাথাও কেশহীন —মুখ দেখলেই মনে হয় তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। স্বগতোক্তি করার মতো ধীর স্বরে তিনি বলতে আরম্ভ

করলেন —বিম্বিসার মগধ আর অঙ্গের সমগ্র আয়ের বেশীর ভাগই গত পাঁচ বছরধরে যুদ্ধ কোষে জমা করেছেন। তিনি গঙ্গা, শোন আর বাগমতীর তীরে পুরানো দুর্গের সংস্কার করা ছাড়াও ষোলোটি নতুন দুর্গ তৈরী করিয়েছেন। সেইসব দুর্গে তেরোটা করে শালের মোটা থামের দৃঢ় প্রাকার দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দুর্গে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী, গজারোহী এই চতুর্বিধ সৈন্য মিলে তিন হাজার থেকে সাত হাজার পর্যন্ত সুশিক্ষিত যোদ্ধার সমাবেশ হয়েছে। দুর্গমধ্যে এতো খাদ্য জমা করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে এক বছর কোনো খাদ্য না পেলেও অসুবিধা হবে না। এছাড়া আমাদের দেখাদেখি বিম্বিসার আর একপ্রকার সৈন্যদলও গড়ে তুলেছেন তা হলো নৌসেনা। তিনটি নদীর তীরেই দুর্গের কাছে নৌসেনার শক্তিশালী বাহিনীও আছে। প্রত্যেকটি নৌকায় আট থেকে ষোলো জন নাবিক আর কুড়ি থেকে পঞ্চাশ জন পর্যন্ত ধনু-শল্য-খড়্গধারী সৈন্য আছে। আপনাদের এ কথা জানানো বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি যে, বিম্বিসার এবার এই নৌবাহিনী দ্বারা যুদ্ধজয়ে একটা মস্ত সাহায্যের আশা পোষণ করেন। সৈন্যদের ভাতা, বেতন প্রভৃতি দেবার জন্যে বিম্বিসারের কোষ যেমন পরিপূর্ণ আছে, তেমনি সবরকম অস্ত্রের সংখ্যাও ওদের বেশী। আমাদের যুদ্ধায়োজন সম্পর্কে ওদের জ্ঞান যথেষ্ট আর এ বিষয়ে মগধের শ্রমণ ব্রাহ্মণরা ওদের যথেষ্ট সাহায্য করছে। অঙ্গের বিদ্রোহীদের বিম্বিসার সম্পূর্ণ দমন করেছেন। অঙ্গের প্রজারা বেশ বুঝতে পেরেছে যে, বিম্বিসারের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করার অর্থই হলো মগধের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করা। কূটদন্তের মতো বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ মহাশালদের জায়গীর এবং সম্মান দিয়ে বিম্বিসার যেমন একদিকে স্বপক্ষে এনেছেন, তেমনি ভদ্দিয়ার [অঙ্গ] ভেকের মতো অঙ্গের বণিকরাও বিম্বি-সারের যশোগান করছে। তার ওপর তাঁর তরবারির শক্তিতে অঙ্গ-মগধে চোর-ডাকাতের ভয় দূর হয়েছে। এই সব কিছুরই প্রভাব পড়েছে প্রজাদের ওপর। আর সেই সঙ্গে বিম্বিসার নিজেকে শ্রমণ গৌতমের [বুদ্ধ] শিষ্য বলে প্রচার করছেন। শ্রমণ গৌতমের যশ আজ শুধু প্রাচীতে নয়, তার বাইরেও বিস্তৃত এ কথা আপনারা জানেন। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত জনগণের ওপর গৌতমের মতো প্রভাব অন্য কোনো ধর্মাচার্যেরই নেই। শাক্য, কোলিয়, মল্ল, লিচ্ছবি —সব গণই ক্ষত্রিয় গৌতমকে যথেষ্ট সম্মান করে। প্রসেনজিৎ, বিম্বিসারই শুধু নয়, বৎস, অবন্তী [মালব], কুরু, শূরসেন [মথুরা] প্রভৃতির রাজারাও গৌতমকে মহামানব বলে মনে করেন। আমি ভালো করেই জানি যে গৌতম আমাদের গণ-এর যথেষ্ট প্রশংসা করে থাকেন। তিনি ত্রয়াধিশ [ইন্দ্রলোক]-এর দেবতাদের সঙ্গে লিচ্ছবিদের তুলনা করেন। অথচ আমরা গৌতমকে কোনো উদ্যান প্রদান করিনি, তাঁর জন্যে কোনো বিহার বা

প্রাসাদও তৈরী করিয়ে দিইনি। কিন্তু বিম্বিসার নিজেকে গোতমের শিষ্য বলে প্রচার করে নিজের প্রজাদের মধ্যে ধর্মরাজা বলে প্রসিদ্ধ হবার পথ প্রশস্ত করেছেন। তিনি রাজগৃহে তাঁর রাজোদ্যান, বেণুবন, গোতমকে দান করে যশোলাভ করেছেন। গোতম যখন গৃধ্রকূট পর্বতে থাকেন, তখন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বিম্বিসার পদব্রজে তাঁকে দর্শন করতে যান। এসবই সাধারণ ব্যাপার, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে। কিন্তু এইজন্যেই বিম্বিসার প্রজারঞ্জনে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, এইভাবে বিম্বিসারের রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে শান্তি আর সন্তোষ দুই-ই বিরাজ করছে।

সর্বদিক চিন্তা করে দেখলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে —আজ মগধরাজ যতোখানি দৃঢ় এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম, এমন আর কখনও ছিলেন না।

তাঁর দুর্বলতাও আছে। কিন্তু তা মগধের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলে বোঝা যাবে না। যখন লিচ্ছবি গণ-এর সঙ্গে তুলনা করা হবে, তখনই বোঝা যাবে। আমাদের সেনাপতি এবং দক্ষিণ সেনানায়ক রোহণ সে কথা আপনাদের বলবেন। আমি সে বিষয়ে কেবল এইটুকু বলতে পারি, লিচ্ছবিদের প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত যেখানে যুদ্ধকে নিজের মনে করে লড়াই করে, সেখানে অঙ্গ-মগধের সৈনিকরা যুদ্ধকে ভাবে রাজা বিম্বিসারের যুদ্ধ।

সেনাপতি সুমন নিজের সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন —আয়ুষ্মানগণ। আমি আপনাদের কাছে গণ-এর প্রস্তুতি বিষয়ে বলবো। এর মধ্যে কতকগুলি কথা আমি আগের বৈঠকেই বলেছি, সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। কারণ আয়ুষ্মান সিংহ সে কথা জানে না। মগধের প্রত্যেকটি নদী-দুর্গের বিরুদ্ধে আমরা দুটি করে কাষ্ঠ-দুর্গ তৈরী করেছি। বিশেষ করে মহীর [গণ্ডক] তটে আমরা দুর্গের বেড়া দিয়ে রেখেছি। মহীর অপর পারে মল্লের সীমানা। তারা জানে, আমাদের কাছ থেকে তাদের কোনো ভয় নেই —আমরা এইসব দুর্গ মগধের জন্যেই তৈরী করেছি। আপনারা জানেন, মহীর স্রোত খুব প্রবল। সুতরাং নিম্নভাগ থেকে উপরিভাগে যেতে হলে নৌকা খুব মন্দগতিতেই অগ্রসর হতে পারে। অতএব আমাদের সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র-বোঝাই এইসব দুর্গ আক্রমণ করা শত্রুর পক্ষে সম্ভব নয়। মল্ল এবং তার অধিষ্ঠাতা রাজ্য কোশলের জন্যে মগধ মল্ল-ভূমিকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে না, এটা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। আর সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মহীর বুকে আমাদের বাহিনী নৌকায় করে তীরের মতো দ্রুত মগধ-বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এখন আমাদের রণতরীর সংখ্যা দু'হাজার

—তাতে করে একবারে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ করতে পারে। গত দু'বছরে আমরা আমাদের তরীর সংখ্যা পাঁচ গুণ বাড়িয়েছি। বজ্জীকে আক্রমণ করার জন্যে মগধকে বড়ো বড়ো নদী পার হতে হবে। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের নৌকার প্রয়োজন কতোখানি। আমাদের আরো একটা সুবিধা আছে, যা মগধের নেই। আমাদের এখানে মল্লাহ্‌দের সংখ্যা অনেক। অসহ্য দাসত্ব আর অপমানের ভয়ে শত শত মল্লাহ্‌-পরিবার মগধ ত্যাগ করে বজ্জী-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের এখানে ধীবর [মল্লাহ্‌] দাস খুব বেশী নেই। এখানকার ধীবররা খুব সুখী এবং বজ্জী-ভূমিকে তারা ভালোবাসে। সমগ্র ধীবর-জ্যেষ্ঠরা [মুখিয়া বা মোড়ল] গণ-এর কাছে স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, অতএব আমাদের নাবিকের কোনো অভাব হবে না। এবার আমরা আমাদের নৌকাগুলিকে আরো দৃঢ় করে গড়েছি এবং তাতে লৌহ-কীলক লাগিয়েছি। বসবার জায়গা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যার ফলে নাবিক ও সৈনিকদের বাইরে থেকে দেখা যাবে না। অশ্ব আর রথ পার করার জন্যে আমাদের আলাদা ঘাট আর নৌকা প্রস্তুত করা আছে।

দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমান্তে আমাদের পদাতিক সৈন্যদলের সংখ্যা মগধের চেয়ে বিশেষ কম নয়। সংখ্যার স্বল্পতাটুকু ক্ষমতার আধিক্য দিয়ে আমাদের সৈন্যরা পূরণ করে নেবে। বিম্বিসার অঙ্গ-মগধের প্রজাদের ধনরত্ন শোষণ করেছেন —সুতরাং অশ্ব, রথ আর গজ-সৈন্যের সংখ্যা তাঁর আমাদের চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখবেন, বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষার জন্যে তাঁর অনেক সৈন্য প্রয়োজন। পশ্চিম দিকে অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ মগধের শক্তিবৃদ্ধি পছন্দ করেন না, বৎসও তাই। প্রসেনজিতের মতো অযোগ্য শাসক যদি কোশলের সিংহাসনে না বসতেন, তাহলে বিম্বিসারের লম্ফঝম্প কবে বন্ধ হয়ে যেতো। তবুও ঐ সীমান্ত রক্ষার জন্যে বিম্বিসারকে যথেষ্ট সৈন্য রাখতে হয়। আর তাদের খড়্গের ধার এখনো এতো কমে যায়নি যে, বিম্বিসার সব সৈন্য সেখান থেকে সরিয়ে আনতে ভরসা পাবেন। অথচ আমাদের উত্তর আর পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যের কোনো প্রয়োজনই নেই।

—আমাদের যতো সৈন্য আছে, তা ছাড়াও অ-লিচ্ছবি প্রজারা এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে মনে করে। কারণ তারা মগধ প্রভৃতি রাজতন্ত্র আর বজ্জীর গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদটা ভালো করেই অনুভব করে। যদিও শাসনকার্যে তাদের লিচ্ছবিদের মতো ততোটা হাত নেই, কিন্তু লিচ্ছবি-গণ তাদের ওপর রাজাদের মতো যথেচ্ছাচার করতে পারে না। এখানে তাদের সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করে শ্রমনিবাসে কেউ পাঠাবে না। কেউ তাদের ভালো ভালো ঘোড়া বা রথগুলো নিয়ে নেবে না। এই তো সেদিনের কথা, মণিভদ্র

শেঠ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবার পর কি হলো দেখলেন তো। বজ্জীর ধর্ম [আইন] অনুযায়ী যখন তার সম্পত্তি গণকোষে নিয়ে নেবার কথা উঠলো, তখন অনেক গণ-সদস্যই মণিভদ্রের এক দূর সম্পর্কীয় সম্বন্ধীকে উত্তরাধিকার দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য যা গণ-এর সম্পত্তি, তা অপরকে দেবার প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এর দ্বারা তো অন্তত এই কথাটা প্রমাণ হয় যে, এখানে কোনো লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে কারো ওপর অন্যায় করতে পারে না। আরো একটা কথা —আমাদের কাছে বজ্জীর ব্রাহ্মণ-জ্যেষ্ঠ [মুখিয়া বা মোড়ল] এবং গৃহপতির পক্ষ থেকে সংবাদ এসেছে যে, বজ্জীর স্বাধীনতার জন্যে যেন তাদের যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা তাদের ভেতরে ভেতরে সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত করেছি এবং করছি।

—আমাদের কর্মকর মগধ থেকে পালিয়ে আসা কর্মকরদের কাছে তাদের করুণ কাহিনী প্রতিনিয়তই শোনে। সেই তুলনায় বজ্জীর কর্মকররা সহস্র গুণে ভালো আছে এবং তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে পটু, তাদের আমাদের সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধা বলেই মনে করতে পারেন।

—আর আমাদের দাস? আমাদের প্রতিবেশী মগধ যে আমাদের ওপর এতোখানি বিরূপ, তার অন্যতম কারণ বজ্জীর ধর্ম [আইন] অনুযায়ী কোনো প্রভু তার দাসের ওপর ইচ্ছামতো অত্যাচার করতে পারে না! বস্তুত লিচ্ছবিরা যে অবস্থায় আছে, তাতে তারা দাসদের মুক্ত করে দিয়ে শুধু কর্মকর দিয়েই কাজ চালাতে পারে। কিন্তু অ-লিচ্ছবি প্রজাদের কথাও তো আমাদের চিন্তা করতে হয়। আমাদের দাসের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; তবু যা আছে তারা আমাদের জন্যেই খড়্গ-চালনা করতে পারে।

—এইভাবে আমাদের বর্তমানে প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে প্রস্তুত হতে পারে এমন সৈন্যের সংখ্যা মগধের চেয়ে কম বলতে পারি না। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় লিচ্ছবি-নারীদের কথা। তাদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। লিচ্ছবি-নারীরা আজ দেশরক্ষার কাজে অংশগ্রহণের অধিকার-প্রার্থিনী। আমাদের বর্তমান কালের নর-নারীরা ভুলে গেছে যে, পূর্বকালে কোনো সময় লিচ্ছবি-নারীরা নিজেদের পতি-পুত্রের মতো হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রাম করেছে। দেশরক্ষার কাজে আমাদের লিচ্ছবি-নারীদেরও শিক্ষাদান করতে হবে।

সেনাপতির ভাষণের পর অন্যান্য সেনানায়করা নিজের নিজের সীমান্ত পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। সকলের বক্তব্য শেষ হলে সেনাপতি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে বললেন।

আমি বললাম —সেনাপতি ও আদরণীয় সেনানায়কগণ! আমি আপনাদের কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। সর্বদিক বিচার করে

বজ্জীর আভ্যন্তরীণ ও বাইরের অবস্থা মগধের চেয়ে অনেক ভালো বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু লিচ্ছবি-নারীদের কাছ থেকে আর একটা কাজ গ্রহণ করার অনুরোধ করবো। সে কাজ হলো আহতদের রণক্ষেত্র থেকে অপসারণ, তাদের সেবা শুশ্রূষা করা। এ কাজে পুরুষদের নিযুক্ত রাখা উচিত নয়। যতোগুলি রণাঙ্গনেই যুদ্ধ হোক না কেন, আমার মনে হয় দক্ষিণের রণক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আর আমাদের শত্রুর মধ্যে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবে। আর সেখানেও মহীর দুর্গে সুরক্ষিত তরীগুলি আমাদের জয়ের পক্ষে মস্ত বড়ো সহায়ক হবে। কারণ আমাদের আর সব কিছুর মুখোমুখি হবার শক্তি মগধের আছে, কিন্তু সেখানে রক্ষিত ঐ পাঁচশো তরীর সমকক্ষতা করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমি মহাসিন্ধুর রণতরীও দেখেছি এবং আমাদের তরীগুলিতেও তার কিছু কিছু কৌশল গ্রহণ করা দরকার মনে করি। লৌহ-কীলকগুলিকে আমাদের এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যেন সেগুলি ইচ্ছামতো লাগানো এবং খুলে ফেলা যায়। এখানে আমি আপনাদের কাছে আর একটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই। গতকাল তক্ষশীলা থেকে আগত নাগরিকদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। তাঁরা জানেন যে মগধ আমাদের আক্রমণ করতে চায়। সুতরাং তাঁরা কাল আমাকে অনুরোধ করছিলেন যে, বজ্জীর জন্যে যুদ্ধ করার সুযোগ যেন তাঁদের দেওয়া হয়। আমি আপনাদের আরো জানাতে চাই যে, আমার মিত্র কপিল গান্ধারের একজন দক্ষ সেনানায়ক। পার্শবদের সঙ্গে যুদ্ধে সে আমার উপ-নায়ক ছিলো। মহাসিন্ধু পার হয়ে পুষ্কলাবতী পর্যন্ত পার্শববাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করে বিধ্বস্ত করা তারই কীর্তি। সে এবং তার সঙ্গীরা নৌ-যুদ্ধে নিপুণ এবং অভিজ্ঞ সৈনিক। আমার প্রার্থনা, আপনারা তাদের আমার মহীদুর্গের রণতরী সঞ্চালনের অধিকার প্রদান করুন।

—মহীর এইসব তরীর গুরুত্ব এতেই বোঝা যাবে যে, মহী দীর্ঘওয়ারের [দিঘওয়ারা] কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, কিন্তু শোন তার থেকে অনেক নীচে, পাটিলগ্রাম [পাটনা]-এর সামনে। এর অর্থ হলো, আমাদের এই নৌবহর মগধের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, তাদের নৌবহর তেমনি আমাদের কোনো অসুবিধাই সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

—আর একটি কথা আমি বলতে চাই। মগধের পক্ষ থেকে আক্রমণের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে বসে থাকা আমাদের উচিত নয়। সুবিধা পেলেই আমরা আক্রমণ শুরু করে দেবো এবং সেইভাবেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমার মনে হয়, প্রথমে আক্রমণ করার জন্যে আমাদের তটভাগের নৌ, হস্তী, পদাতিক, অশ্বারোহী আর রথী সৈন্যদের কাজে লাগাতে হবে। মহীর

রক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে তখন, যখন শত্রুরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।

আমি এইভাবে অনেক প্রকার যুদ্ধকৌশলের কথা বললাম। যুদ্ধ পরিষদ দক্ষিণ যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে আমার পরামর্শগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। তাঁরা কপিল এবং তার সঙ্গীদের সেবা গ্রহণেও সম্মত হয়ে কপিলকে আমার উপ-নায়ক নিয়োগ করলেন। স্ত্রীলোকদের অস্ত্রসজ্জিত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো, আমার অনুরোধে ভামা এবং রোহিণীকে এই কাজের ভার দেওয়া হলো।

সেদিন যখন গভীর রাত্রে পরিষদ থেকে বাড়ীতে ফিরে এলাম, তখন ভামা, রোহিণী, ক্ষেমা প্রভৃতি অনেক লিচ্ছবি-তরুণীকে গম্ভীরভাবে আলাপ আলোচনা করতে দেখলাম। আমি তাদের কথাবার্তায় মগ্ন দেখে বললাম —আমি কি আসতে পারি ভামা বৌদি ?

ভামা —নিশ্চয় দেবর। তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছো, আর এদিকে আমার চোখ তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল দেখবার জন্যে সকাল থেকে তৃষিত হয়ে আছে।

আমি —তোমার অপার করুণা বৌদি ! আরে, আমাদের জনপদ-কল্যাণী ক্ষেমাও যে এখানে আছে দেখছি ! স্বাগত ক্ষেমা।

ক্ষেমা —ধন্যবাদ সিংহ ভাই।

ভামা —আর আমার জন্যে বুঝি দেবর ধন্যবাদের নামে কানাকড়িও নেই ? একেই বলে সুন্দর মুখের জয়।

আমি —কিন্তু বৌদি ! তোমার মুখকমলও তো আমার কাছে কম আকর্ষক মনে হয় না।

ভামা —সে একসময় ছিল অবশ্য ! তুমি তখন এই মুখের জন্যেই প্রাণ দিতে পারতে আর আমাকে ঘাড়ে তুলে নিতে।

আমি —ঘাড়ে তুলে নিতে আমি এখনো রাজী বৌদি। কিন্তু তার আগে তুমি সেই সাত বছরের ভামাটি হও তো আবার।

ভামা —আমি কি এতোই ভারী হয়ে গেছি দেবর ?

আমি —গুণের দিক দিয়ে তো বটেই।

ভামা —তুমিও তো সেদিক থেকে সেই হিসেবেই বেড়েছো। বেশী কথা বাড়িয়ো না। তার চেয়ে বলো, ক্ষেমার সৌন্দর্য, তার আঠারো বছর বয়সের আদর আছে।

আমি —তা বলে কি তোমার আদর কমে গেছে বৌদি !

ভামা —এ বুড়ীকে আর কে চায় ? কিন্তু সিংহ তোমার কাছে এটা আশা করিনি —এতো নিষ্ঠুরতা ! রোহিণী, তুমিই বিচার করো।

রোহিণী —আমি তো তোমাদের সারা মোকদ্দমাটা জানি না বোন, কি বিচার করবো বলো !

ভামা —তুমিও ওর দিকে হলে রোহিণী ! মেয়েদের অন্তত মেয়েদের দিকে থাকা দরকার। যদি আমরা এক হতে না পারি, তাহলে পুরুষদের কাছে আমাদের কোনো কথাই আর খাটবে না।

আমি —আমি কিন্তু তোমাদের জন্যে সম্মিলিতভাবে একটা ফল এনেছি।

ভামা —সেটা কী দেবর, বলো না।

আমি —বলবো তখন, যখন কিছু পুরস্কার পাবো।

ভামা —কার কাছ থেকে ?

আমি —তোমাদের সবার কাছ থেকে।

ভামা —বলার আগে না পরে ?

আমি —প্রথমে সওদাটা ভালো করে দেখে নাও, জিনিস ভালো হলে দাম দেবে বৌদি।

ভামা —সকলের পক্ষ থেকে আমিই বলবো, না সকলে আলাদা আলাদা করে দাম দিতে স্বীকার করবে ?

আমি —তোমার বলাই যথেষ্ট বৌদি।

ভামা —তাহলে স্বীকার করছি। এবার তোমার জিনিস সামনে রাখো।

আমি —যুদ্ধ-প-রি-ষ ······

ভামা —একটা কথা বলতে এক যুগ লাগিয়ে ভামা আর তার সখীদের কি কৌতূহলে মেরে ফেলতে চাও দেবর ?

আমি —তুমিই তো মাঝখানে কথা বলে দেরী করিয়ে দিচ্ছো বৌদি। আচ্ছা, আবার গোড়া থেকে শোনো। যু-দ্ধ-প-রি-ষ-দ অ-স্ত্র-ধা-র-ণে-র অ-ধি-কা-র দে-বা-র সি-দ্ধা-ন্ত ক-রে-ছে লি-চ্ছ-বি —আচ্ছা, এইবার বলো তো এর পরে কি বলতে চাই ?

ভামা —কি বলতে চাও দেবর ? মিছে কৌতূহল বাড়াও কেন ?

আমি —এটুকু যদি বুঝতে না পেরে থাকো, তবে তুমি মিথ্যেই আমার ভামা বৌদি !

ক্ষেমা —আমি বলবো, সিংহ ভাই ?

আমি —হ্যাঁ, বলো ক্ষেমা।

ক্ষেমা —কিন্তু আমি রোহিণীর কানে কানে বলবো।

আমি —আর আমার কানে কানে বলবে না ? এ কান দুটো কি পাপ করেছে ক্ষেমা ?

ক্ষেমা —তুমি আমার কথা পরে জানতে পারবে।

আমি —তাহলে তো দেখছি সিংহের ওপর তোমার বিশ্বাস খুব !

ভামা —তুই কার পাল্লায় পড়েছিস্ ক্ষেমা, তা তো জানিস্ না। এ সিংহ রে, সিংহ ! একবার বাজিতে হেরে সিংহ ভামাকে জল পার করে দেবে বলে ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়েছিলো। তারপর মাঝ বরাবর গিয়ে ভামাকে শুদ্ধ আছাড় খেয়ে পড়ে সে কী কান্না —'ওরে বাবা, আমাকে বিছে কামড়েছে।' আমার কাপড়-চোপড় একেবারে ভিজে গিয়েছিলো ক্ষেমা।

আমি —আর সিংহের কাপড় একেবারেই ভেজেনি, কেমন ?

—সে তো জেনেশুনেই ভিজিয়েছিলো।

—আর জেনেশুনেই সে নিজের গাল দুটিকে ভিজিয়েছিলো।

ভামা —মিথ্যে অছিলা করছিলে। জলে কখনো বিছে থাকে ? বলো তো ক্ষেমা।

ক্ষেমা —জলের মধ্যে বিছে কামড়ানোর কথা তো নিশ্চয়ই মিথ্যে বোন।

ভামা —এই হলো সেই সিংহ ক্ষেমা। তুই এখনো এর কলাকৌশল জানিস্ না।

আমি —তাহলে আমি ঘণ্টাখানেক ধরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিলাম সে শুধু মিছিমিছি ; আমার চোখ জল পড়তে পড়তে ফুলে গিয়েছিলো, সেও মিছিমিছি ; ভামা তার উত্তরীয় [দোপাট্টা] নিঙড়ে তাই দিয়ে সিংহের মুখ মুছিয়ে দিয়েছিলো সেও শুধু শুধু, আর নিজেও কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখের জলে ভিজে মুখে বারবার চুম্বন করেছিলো, সেও মিথ্যে ; তারপর জলের মধ্যে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে নিজের ছোট ছোট হাতে তুমি যে আমাকে তোলার চেষ্টা করেছিলে, সেও মিথ্যে।

ভামা —তুমি যে অভিনয়কুশলী ছিলে।

আমি —ও কথা বলো না ভামা ! আমার পায়ের আঙুল থেকে যে রক্ত পড়ছিলো, সেটা নিশ্চয় অভিনয় নয়।

ভামার চোখ দুটো জলে ভরে আসছিলো। সে নিজের বাহু আর গণ্ডের মধ্যে আমার মাথাটা চেপে ধরে বললো —সে কথা আর মনে পড়িয়ে দিয়ো না সিংহ। সে রক্ত মনে পড়লে আবার কেঁদে ফেলবো। আমি আর তুমি দু'জনেই মনে করেছিলাম বিছে কামড়েছে। কিন্তু মল্লিকা মাসী বললো বিছে নয়, শিঙ্গি মাছ।

আমি —তাহলে আমার কান্নাটা মিছিমিছি নয় তো ?

ভামা —না সিংহ।

আমি —কিন্তু আজ সত্যি বলছি ভামা, ইচ্ছে করলে তোমাকে জলটা পার করে দেওয়া পর্যন্ত কান্নাটা থামিয়ে রাখতে পারতাম।

ভামা —আরে রাখো তো ! আবার কথা বাড়ায়। যুদ্ধ-পরিষদের কি খবর বলো।

আমি —আচ্ছা ক্ষেমা, তুমি যা বুঝেছো আমার কানে কানে বলো।

ক্ষেমা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললো —যুদ্ধ-পরিষদ অস্ত্রধারণের অধিকার দেবার সিদ্ধান্ত করেছে লিচ্ছবি-নারীদের।

আমি আলতোভাবে আমার কানটা ক্ষেমার রক্তিম অধরে ছুঁইয়ে বললাম —আর একবার পুনরাবৃত্তি করো তো ক্ষেমা।

ভামা বলে উঠলো —চালাকি রাখো তো সিংহ। তুমি বেচারী ক্ষেমার চুম্বন পেতে চাও।

ভামার কথায় কান না দিয়ে ক্ষেমা আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন আমি বললাম —ভামা বৌদি, ক্ষেমা ঠিক ধরেছে। ক্ষেমা, তুমি এদের কথাটা শুনিয়ে দাও তো।

ক্ষেমা আবার কথাটা বললো। ভামা আর রোহিণী তো খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, আমার পুরস্কারের কথাটা আর কারো মনেই পড়লো না।

আমি বললাম —কি বৌদি! জিনিস তো সাচ্চা, এবার পুরস্কার বা দাম যাই বলো, পাওয়া দরকার।

ভামা —কিন্তু দেবর! তুমি তো শুধু এর সন্দেশবাহক [সংবাদবাহী] মাত্র নও, এই স্বীকৃতির মধ্যে তোমার হাত আছে।

আমি —আর সেইজন্যে বুঝি আমার আর পুরস্কার পাওয়ার অধিকার নেই ?

ভামা —শুধু পুরস্কার নয়, আরো কিছু।

আমি —আরো কিছু আর এক সময়ের জন্যে তোলা থাক বৌদি, আমাকে প্রথমে পুরস্কারটাই উশুল করতে দাও। আর সে পুরস্কার হলো রোহিণীর ওষ্ঠে আর তোমাদের সকলের গালে দুটি করে চুম্বন। মঞ্জুর তো ?

ভামা —এটা বুঝি খুব দুর্লভ বস্তু ছিলো ?

আমি —আমি তো এটাকে দুর্লভ বলেই ভেবেছিলাম। এখন বলো কাকে দিয়ে শুরু করবো ?

ভামা —যাকে খুশী।

আমি —তবে বৌদি, তোমার থেকেই শুরু হোক।

সকলকে চুম্বন করা শেষ হলে ভামা বললো —এবার বলো তো দেবর, এতো সহজে এ কাজ হলো কেমন করে ?

আমি —আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আর সকলে একমত হয়ে মঞ্জুর করে দিয়েছিলো।

ভামা —তোমাকে নিশ্চয়ই খুব বোঝাতে হয়েছিলো দেবর ?

আমি —কেবল এই কথা নিয়েই নয় বৌদি ; অন্যান্য কথার ফাঁকে আমি

কথাটা তুলেছিলাম। আর একটা কথা—তোমাকে আর রোহিণীকে লিচ্ছবি নারীদের প্রস্তুত করতে হবে, তাদের হাত বড়ো কোমল হয়ে গেছে।

কথাটা আমি ক্ষেমার দিকে চেয়েই বলেছিলাম। ক্ষেমা উচ্ছ্বসিতভাবে তাড়াতাড়ি নিজের হাত দুটি আমার সামনে ধরে বললো—এই দেখো সিংহ ভাই, আমার হাত কোমল নয়।

দেখলাম, তার এক-একটা হাতে অন্তত আটটা করে ফোস্কা পড়ে গলে গেছে। তার ধারে ধারে এখনো শুকনো পাণ্ডুবর্ণ চামড়া লেগে আছে। দেখেই প্রথমে আমার প্রাণ শিউরে উঠেছিলো, তারপর খুশীর আতিশয্যে তার হাত দুটি ধরে আমার চোখে স্পর্শ করে চুম্বন করলাম। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—ক্ষেমা, তোমার এই হাত দেখে আমার যে কী গর্ব হচ্ছে! লিচ্ছবি-কন্যার উপযুক্ত কাজই তুমি করেছো। তোমার মতো কন্যা থাকতে বৈশালী অজেয়ই থাকবে।

ভামা আর রোহিণী তখনো ক্ষেমার হাত দেখেনি। যেই দেখলো, ভামা ক্ষেমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগলো। রোহিণী তো ক্ষেমার হাত দুখানি ধরে কখনো নিজের গালে স্পর্শ আর কখনো চুম্বন করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর ভামা বললো—ক্ষেমা, এ পর্যন্ত তুমি ছিলে সাধারণ জনপদ-কল্যাণী। কিন্তু এখন তুমি লিচ্ছবি-জনপদ-কল্যাণী। তুমি হাত দুটোকে কি করে এমন করলে?

—ভামা বোন। তোমার সেদিনের উপদেশ শুনে আমার নিজের হাত দুটোর ওপর ঘৃণা ধরে গিয়েছিলো। সেইদিন থেকেই মা বারণ করলেও আমি দাসীর সঙ্গে চাল কুটতে শুরু করলাম। যতোক্ষণ না দু'হাতে চারটে করে ফোস্কা পড়েছে আর অসহ্য ক্লান্তিতে কাজ করা অসম্ভব হয়েছে, ততোক্ষণ আমি থামিনি।

ভামা তাকে চুম্বন করে বললো—তোমার কষ্ট হলো না?

—আমি নিজের মনকে বলতাম, যদি এই ফোস্কাতেই কষ্ট হয়, তাহলে তরবারি ধরবে কেমন করে?

—কিন্তু তুমি তো একবারও আমাদের দেখাওনি ভাই!

—আজও সিংহ ভাই ঐ-রকম কথা না বললে দেখাতাম না।

—তাহলে সবার কাছেই কথাটা গোপন রেখেছিলে?

ক্ষেমা—কেবল একজন ছাড়া।

রোহিণী ক্ষেমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো—বলো না ক্ষেমা। আচ্ছা ভামা বোন, বলো তো কোন লোকটিকে ছাড়া?

ভামা—ও, তুমি ভেবেছো আমি বলতে পারবো না রোহিণী?

রোহিণী—জানো যদি, তবে বলো।

ভামা —ক্ষেমা রোহিণীকে নিজের এই রহস্য কারো কাছে প্রকাশ না করার জন্যে দিব্যি করিয়ে নিয়ে নিজের হাত দুটি তাকে দেখিয়েছে।

রোহিণী —না বোন! বলতে পারলে না।

ভামা —তাহলে তোমরা দু'জনে মিলে আমার মান-সম্মান ভাঙবে ঠিক করেছো! আচ্ছা এবার বলো কাকে ছাড়া।

রোহিণী —কপিল। আমার তক্ষশীলার ভাইটিকে ছাড়া।

ক্ষেমার গাল দুটিতে লালের আভা ফুটে উঠলো। কিন্তু সে নীরব রইলো। সে মুখ নীচু করার আগে ভামা চকিতে তাকে দেখে নিলো। তারপর সে আবার রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করলো —তুমি কি করে জানলে রোহিণী?

রোহিণী —এর জন্যে অন্তর্যামী হবার তো কোনো দরকার হয় না বোন। দেখোনি, সেই প্রথম নৃত্য-রাত্রির পর থেকে ক্ষেমা, কপিল ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচেনি!

ভামা —আমি অতো খেয়াল করিনি রোহিণী।

আর কোনো প্রশ্ন ওঠার আগেই ক্ষেমা বলে উঠলো —শুধু হাতই নয়, ভামা বোন, আমি ঢাল-তরোয়াল চালাতেও শিখছি।

ভামা —সেই একই গুরুর কাছ থেকে না-কি!

ক্ষেমা চুপ করে গেলো। ভামা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললো —না রে পাগলী। আমি সিংহের কাছে শুনেছি, কপিল তরবারি চালনায় একজন ওস্তাদ! আর তুই কপিলের দেবলোক যাত্রার খবর শুনেছিস্ তো?

ক্ষেমা —দেবলোক?

ভামা —হ্যাঁ রে। সিংহ একদিন আমাকে বলেছে যে কপিল কেমন করে দেবলোকে দেবতাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। দেব বলতে আবার মেরু পর্বতের শিখরে বসবাসকারী ত্রয়োস্ত্রিংশ দেব আর তাদের রাজা শক্তিধর দেবেন্দ্রকে বুঝিস্নি যেন।

ক্ষেমা —তবে আবার কোন দেবলোক বোন?

ভামা —এই পৃথিবীতেই উত্তর কুরুর দেবলোক ক্ষেমা।

ক্ষেমা —আমি তো শুনিনি!

ভামা —তাহলে তো তুই মিথ্যেই কপিলের সঙ্গে নাচছিস্।

আমি ক্ষেমার জান বাঁচাতে বললাম —জিজ্ঞাসা না করলে কপিল খুব কম কথাই বলে ক্ষেমা। সে পৃথিবীর যতোটা দেখেছে, এতোটা কম লোকই দেখেছে। আর ভামা বৌদি, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কপিল আর তার সঙ্গীরা বৈশালীর পক্ষ হয়ে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে নিজেদের সেবা অর্পণ করেছে।

রোহিণী আমার পাশ ঘেঁষে আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো — সেবা অর্পণ করেছে আর্যপুত্র!

আমি তার মসৃণ নেত্র চুম্বন করে বললাম —যুদ্ধ-পরিষদও তাদের সেবা গ্রহণ করবে বলে স্বীকার করেছে। কপিল আমার উপ-নায়ক নিযুক্ত হয়েছে।

আমাকে করপাশে বেঁধে নিয়ে রোহিণী বললো —তাহলে মহাগঙ্গার তীরেও সেই মহাসিন্ধুর দৃশ্য!

আমি রোহিণীকে জড়িয়ে ধরে বললাম —কিন্তু সে-রকম বিনা সংবাদে আক্রমণ নয় রোহিণী! তুমি আর ভামা বৌদি মিলে লিচ্ছবি-নারীদের উত্তর কুরুর মতো খড়্গধারিণী করে গড়ে তোলো। আমি তোমাদের যোগ্য কাজ খুঁজে বার করবো।

ভামা রোহিণীর হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিজের হাতে নিয়ে বললো —দেবর! আজ বড়ো খুশীর খবর শোনালে।

মনোরথকে আসতে আমিই প্রথমে দেখেছিলাম। ভামার কথার মাঝখানে তাই বাধা দিয়ে বলে উঠলাম —আর একটা খোশখবর শোনো, ঐ মনোরথ ভাই আসছে।

ততোক্ষণে মনোরথ সকলের সামনে পেঁৗছে গেছে। সকলে সমস্বরে বললো —স্বাগত লিচ্ছবি-পুত্র মনোরথ!

ভামা মনোরথের গললগ্ন হয়ে বললো —আমার মনোরু! তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

মনোরথ —এতোক্ষণ কোথায় ছিলাম? কপিল আর তার সঙ্গীদের নিয়ে গিয়েছিলাম ব্রাহ্মণদের যজ্ঞবাট দেখাতে।

ভামা —ভারী জিনিসই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে!

মনোরথ —প্রিয়ে, ওদের দেশে এমন ব্রাহ্মণও নেই আর তাদের যজ্ঞবাটও নেই।

ভামা —কিন্তু যুদ্ধ-পরিষদ যে লিচ্ছবি-নারীদের অস্ত্রধারণের অনুমতি দিয়েছে, এ কথা জানো কি?

মনোরথ —সে তো খুশীর কথা।

ভামা —আর তোমার ভাত-রাঁধুনীকেই তা সংগঠনের ভার দিয়েছে।

মনোরথ ভামার মুখচুম্বন করে বললো —তোমাকে?

ভামা উদাস স্বরে বললো —হ্যাঁ, তাই। নিজের ঘরে কে কার আদর করে? মনোরথের কাছে আমি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ঘরকুণো ভামা ছাড়া তো আর কিছু নই। আজ সিংহ দেবর না এলে ভামা রান্না-বান্না করতে করতেই মরতো।

মনোরথ —বা রে দেবর !

ভামা —নিশ্চয়। কেন নয় মনোরথ ? কিছু মিথ্যে বলছি ?

মনোরথ —ছিঃ। ভামাকে কেউ কখনো মিথ্যে হাসি-তামাসা করতে দেখেছে !

ভামা —বেশ তুমি আমার সব কথাই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চাইছো দেখছি ! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না মনোরথ।

মনোরথ —বলি আমাকে কি কিনারায় ভিড়তে দেবে, না মাঝদরিয়ায় আটকে রাখবে ?

ভামা —যে মাঝদরিয়ায় থাকতে চায়, তাকে কে আর কিনারায় নিয়ে যাবে বলো !

মনোরথ —না ভামা, তোমার মনোরথ মাঝদরিয়ায় ভাসার পাত্র নয়, সে আগেই কিনারায় ভিড়েছে।

ঔৎসুক্য সহকারে তার হাতখানি ধরে ভামা জিজ্ঞাসা করলো —সত্যি না-কি ? আজ দেখছি কেবল সুন্দর সুন্দর খবর আসছে।

মনোরথ —আজ যখন এখানে বৈশালীর সুন্দর মুখগুলি একত্র হয়েছে, তখন সুন্দর সুন্দর খবর আসবে না কেন ? আচ্ছা শোনো —আমি বৈশালীর দক্ষিণ-দ্বারের উপ-নগর-রক্ষক নিযুক্ত হয়েছি।

ভামা মুখ ভার করে বললো —অর্থাৎ যার অর্থ হলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চার যোজন দূরে, আর দেহ থেকে সামান্য মাত্র রক্তপাতেরও সম্ভাবনার অভাব —এই তো ?

মনোরথ—তাহলে তুমি মনোরথকে খামোকা লড়াই করতে বলছো ? এমন স্ত্রী তো ভাই আর কোথাও দেখিনি !

আমি —বৌদি ! যুদ্ধের জন্যে শস্ত্রধারণ করা ছাড়া লিচ্ছবিরা এখন তাদের দুটি হাতকে অন্য সব কাজ থেকে বিরত রাখুক, এই কি তুমি চাইছো ! কিন্তু এমন করে যুদ্ধ জয় করা যায় না। যুদ্ধ করতে হবে নিশ্চয়। তবে যুদ্ধের মতোই আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষা, ঘর-সংসারের কাজ, তরি-তরকারী উৎপাদন, কাপড় বোনা, বৈশালীকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানো —সবগুলোই সমান প্রয়োজন।

ভামা —বটে ! তা তুমি যে একজন বাচস্পতি, এ কথা আমার জানা ছিলো না দেবর !

আমি —আমাকে যদি বাচস্পতি হিসেবে দেখতে না-ই চাও, তাহলে মনোরথকে দুঃখ দিচ্ছো কেন ?

ভামা —নিজের স্বামীকে কিছু বলা এখনো অবধি লিচ্ছবিরা অপরাধ বলে মনে করে না। অবশ্য এখন তুমি হলে সেনানায়ক, আর তোমার

মনোরথ ভাই নগর-রক্ষক ; অতএব লিচ্ছবি-নারীদের মুখে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করো।

মনোরথ ভামার সামনে হাত জোড় করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বললো — দেবী! বাচস্পতি পদবী তুমি কাউকে দিতে চাও না, স্বয়ং ব্রহ্মাকেও নয়, বেচারা সিংহ তো কোন ক্ষেতের মুলো! বেশ, নগর-রক্ষকের কাজ করবো না, তুমি যে কাজ দিতে চাও তাই করতে আমি প্রস্তুত। নিজের ইচ্ছামতো কাজ নিতে পারা গেলে তোমার পছন্দমতো কাজই মনোরথ নিতো।

ভামা নরম হয়ে বললো —সেবক মনোরথ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। বরং ব্রুহি।

মনোরথ—যথেষ্ট দেবী! এই সেবক যেন সর্বদা তোমার কৃপার অধিকারী থাকে।

ভামা —এবমস্তু! আর কিছু?

মনোরথ —তোমার তরুণী লিচ্ছবি-নারীরা যেন একটু শান্ত ভাব ধারণ করে।

ভামা —তার জন্যে একটা শর্ত আছে। তোমাকেও ঠিক দেবর সিংহ, ঠিক, কি বলবো —কপিলের মতো তরুণী লিচ্ছবি-নারীদের অস্ত্র শিক্ষায় উৎসাহ দিতে হবে।

মনোরথ —এ সেবকটি তো সব সময় চরণ-সেবার জন্যে হাজির, কিন্তু কপিল আবার দেবীর কৃপাপাত্র হলো কি করে?

ভামা —কপিল আমাদের ক্ষেমাকে ঢাল-তরোয়াল শেখাচ্ছে —বলেই ক্ষেমার মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হতে দেখে মুহূর্তে কথা পালটে বললো —আর তুমি তো ক্ষেমার হাত দেখোনি মনোরু! দেখিয়ে দে তো ক্ষেমা।

মনোরথ ক্ষেমার ছাল-ওঠা হাত দু'খানি দেখে বললো —তাহলে ভামা আম্রপালীর ভরাডুবি করিয়ে ছাড়বে দেখছি।

ভামা —তোমার পছন্দ হয়েছে তো মনোরু?

মনোরথ —নিশ্চয়, প্রিয়ে।

সতেরো

বৈশালীর বণিক ও শিল্পী

আজ মধ্যাহ্নে হাতে কোনো কাজ ছিলো না। ভাবলাম, এই সময়টুকু কপিলের বাসস্থানেই কাটাবো। আমি রোহিণীকে বললাম, রোহিণী ভামাকে, ভামা বললো ক্ষেমাকে। এমনি করে তিন-তিনটি অপ্সরাকে নিয়ে সিংহকে রথ হাঁকিয়ে বৈশালীর পথ দিয়ে যেতে হলো। লোকে হয়তো বলবে —সিংহ ভাই বড়ো ভাগ্যবান! দেখলাম, যে পরিচিত তরুণের দৃষ্টি আমার ওপর পড়ছিলো, সে-ই কিছু বলার আগে একটু মুচকে হাসছিলো। আবার মুখের ওপর স্পষ্ট বলেও দিচ্ছিলো —সিংহ ভাই, আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্যে অন্তত কিছুটাও ছেড়ে দাও।

ভামা কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি চাবুকের শব্দ করতেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। যেতে যেতে ভামাকে সেই গল্পটা বললাম। হংসদল উড়ে যাবার সময় তাদের বন্ধু কচ্ছপকেও সঙ্গে নিলো। কচ্ছপ একটা কাঠের টুকরো কামড়ে ধরে রইলো। আর সেই কাঠটা কামড়ে নিয়ে হাঁসেরা উড়তে লাগলো। এক্ষেত্রে কথা বলার অর্থই পতন আর মৃত্যু। আমার কথা শুনে ভামা বললো —ও! তুমি নিজেকে হংসমধ্যে কচ্ছপ মনে করো, তাই ওদের টিপ্পনীর জবাব দিলে না। এদিকে রথও গন্তব্য স্থলে পোঁছে গেলো। আমি বললাম—এই তো শেঠের প্রাসাদে এসে গেছি বৌদি। এবার বাকী কথাগুলো কপিলের জন্যে মুলতুবী রাখো।

ভামা —কেন এসেছো জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে দেবর?

—আমার বেলা এ কথা খাটে না! আমি তো প্রায়ই আসি।

—তুমি তো বড়ো স্বার্থপর দেবর! সেই বিছে কামড়ানোর মতো আজ আবার ভামাকে মাঝপথে আছড়াতে চাও?

—ভামা শুধু নিজেকে নয়, তার সঙ্গী-সাথীদেরও রক্ষা করতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

—সে তো করতেই হবে।

রথ থামিয়ে, ঘোড়াকে সহিসের জিম্মায় রেখে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাবার জন্যে এক কামরা থেকে অপর কামরায় চক্কর দিচ্ছি, এমন সময় ভামা আমার হাত ধরে বললো —একটা উপায় ঠাউরেছি দেবর। তারপর ক্ষেমাকে

বাঁ হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললো —বলবো, বৈশালীর সুন্দরীদের ঢাল-তরোয়াল শিখিয়ে আজকাল কপিল বড়ো প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তাই আমরা তার শিষ্যা হতে এসেছি ।

ক্ষেমা রুষ্ট হয়ে বললো—তাহলে আমি ফিরে যাবো বলছি !

ভামা আরো জোরে তার হাত চেপে ধরে বললো —আমি তো তোমার নামও উচ্চারণ করিনি ভাই।

—হুঁ ! নাম করোনি ? কে এমন অবুঝ আছে বলতে পারো ?

ভামা —আচ্ছা, কপিলের কাছে ঢাল-তরোয়াল শেখা কি এমন অন্যায় কাজ ? বিদ্যা তো যে-কোনো গুরুর কাছ থেকেই শেখা যেতে পারে ।

ক্ষেমা —যদি তুমি এই কথাই বলতে এসে থাকো, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।

ভামা —তার অর্থ হলো, তিনটি হংসীর মধ্যে একটি পলাতকা। দুটি হংসী আর একটা কচ্ছপ —হিসেবটা খুব খারাপ নয়। তোমার গল্পেও তো দুটি হংসীই ছিলো, না দেবর ?

রোহিণী ক্ষেমাকে নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে বললো —ভামা বোনের ভারী চিমটি কাটা স্বভাব !

মুখখানি অপরাধিনীর মতো করে ভামা বললো —আচ্ছা ভাই ক্ষেমা ! দোষ নিও না, আমি তোমার নাম পর্যন্ত মুখে আনবো না।

আমি —ভামা বৌদি, নাম তুমি হাজার বার নিও, কিন্তু ঢাল-তরোয়াল শেখার কথাটা আর তুলো না।

ভামা —বেশ, এই কান মলছি।

তারপর তিনটি সুন্দরীকে আগে আগে নিয়ে, যেখানে কপিল আর তার সঙ্গীরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন, তিনমহলার সেই মহলে এসে পেঁছালাম ।

—স্বাগত দেবীগণ !

—অপ্সরাগণ বলো, কপিল ভাই। দেবীদের বাজার-দর আজকাল বড্ড পড়ে গেছে ।

কপিল মুচকি হেসে বললো —তাহলে অপ্সরাদের এই মানবগণের কাছ পর্যন্ত পেঁছে দিতে স্বয়ং দেবদূত সিংহও এসেছেন। দেবীগণ ! না, না, অপ্সরাগণ ! আজ কি কারণে এই গরীবের নিবাসস্থান আপনাদের চরণ-ধূলিতে পূত করলেন ?

ভামাই প্রথমে উত্তর দিলো —আমাদের চরণে ধূলি তো পাওয়া যাবে না সখা কপিল। কারণ এইমাত্র আমরা ফরাসের ওপর আমাদের জুতো খুলে এসেছি ।

কপিল —তোমার কথার জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই ভামা।

ভামা —তাহলে সে বিদ্যা আমিই তোমাকে শিখিয়ে দেবো।

কপিল —ধন্যবাদ ! কিন্তু দু-দু'জন জনপদ-কল্যাণী যার গৃহে উপস্থিত হয়েছে, সে যে কতো বড়ো সৌভাগ্যশালী তা কি তুমি বুঝতে পারছো ভামা ?

ভামা —না, সেনানায়ক। একই সময় একটা জনপদে [দেশে] একজনের বেশী জনপদ-কল্যাণী থাকতে পারে না।

কপিল —বেশ ! একজন ভূতপূর্ব'ই না হয় ধরলাম ।

ভামা —ভূতপূর্ব জনপদ-কল্যাণীর সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। অমন কতো জনপদ-কল্যাণী এখন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে।

কপিল —মাত্র এক বছর আগেও যে জনপদ-কল্যাণী ছিলো, তার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

ভামা —কিন্তু তার বাজার-দর কমে গেছে। জনপদ-কল্যাণী একজনই হয়। একটা খাপে দুটো তরবারি থাকে না। সুতরাং আমাদের মধ্যে একমাত্র জনপদ-কল্যাণী ক্ষেমাই আছে। যাক্, আমরা তো আপনাদের দুপুরের নিদ্রার ব্যাঘাত করলাম না !

কপিল —আমি তো চাই, তোমরা রোজ রোজ আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করো।

ভামা —তখন সে বাধা আর মিষ্টি লাগবে না। আচ্ছা দেবর সিংহ, এবার তোমরা কথা বলো। আমি শুধু একাই কথা বলছি।

আমি —কিন্তু তোমার কথা যে মিষ্টি লাগে বৌদি।

ভামা —দেখো দেবর, আমার প্রশংসা করে করে আমাদের দুই জায়ের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ো না যেন !

রোহিণী —আমাদের মধ্যে কেউ ঝগড়া বাধাতে পারবে না বোন।

ভামা —পুরুষদের কথা কিছু বলা যায় না রোহিণী। নিজেরা ঝগড়া করে, তারপর বলে জায়ে-জায়ে বনে না, শাশুড়ী-বৌয়ে ঝগড়া হয়।

রোহিণী —পুরুষের কথায় জায়ে-জায়ে লড়াই করার পাত্রীই আমরা নই বোন।

ভামা—ঠিক বলেছো। আমরা যদি বাইরের লড়াইয়ে শক্তি দেখাতে সুযোগ পাই, তাহলে ঘরোয়া মুখের লড়াইয়ে কি প্রয়োজন ? সেনানায়ক কপিল, আমরাও যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছি।

কপিল ভীতস্বরে বললো —বলো কী দেবী ! ত্রিলোক যে ভস্ম হয়ে যাবে। শান্তিই তোমাদের শোভা পায়।

ভামা—তাহলে খড়্গ আমাদের হাতে শোভা পায় না, এই তোমার মত ?

কপিল —সে কথা কে বলছে! সেদিন সিন্ধুতটে যদি রোহিণীকে দেখতে ভামা, তাহলে বুঝতে।

ভামা —মহাসিন্ধুর তটে দেখিনি বটে, তবে এবার মহাগঙ্গার তটে দেখবো।

কপিল —তাই না-কি! তোমরা এ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছো শুনে আমার মনে হচ্ছে কপিল আর সিংহের কপাল ভাঙলো বুঝি।

ভামা —না, তোমাদের কপাল ভাঙেনি, কপাল ভেঙেছে মগধরাজ বিম্বিসারের।

কপিল —এ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি বড়ো আনন্দের কথা। আর এ যুদ্ধে গণ তক্ষশীলাবাসী আমাদের ক'জনের সেবা গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। গতকালই আমরা এ খবর পেয়েছি।

আমি —আর তোমারও এ সংবাদটা জানা দরকার কপিল ভাই, গণ লিচ্ছবি নারীদের সেবা গ্রহণেও রাজী হয়েছে। আরো সুখের কথা যে, বৌদি লিচ্ছবি-নারীদের সেনানায়ক নির্বাচিত হয়েছে।

কপিল —চমৎকার!

আমি —আর তোমার বোন রোহিণী উপ-নায়ক।

কপিল —রোহিণী! আরে, তুই এদিকে আয় তো!

রোহিণীর লাজেভরা রক্তিম কপাল চুম্বন করে কপিল আবার বললো—খুব খুশী হলাম। খুব খুশী!

আমি —আর আমার মনে হয় বৌদি, এটা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে লিচ্ছবি-নারীসেনার মধ্যে ক্ষেমাই প্রথমা!

ভামা —কিন্তু দেবর, দু'জন সেনানায়কের মাত্র একজন সেপাই, এটা কি একটা পরিহাস নয়?

আমি —না বৌদি, কপিল জানে যে মাত্র গতকাল এই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সুতরাং প্রথমে একজনকে দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।

কপিল —এবং সেনানায়ক ভামা, আমি বলে রাখছি তোমার প্রথম সেপাই একদিন তোমার বাহিনীর নাম উজ্জ্বল করবে।

আমি —নাম উজ্জ্বল করার খবর তোমার চেয়ে ভামার কম জানা নেই কপিল ভাই।

কপিল —তবুও—

আমি —তবুও কি শুনি?

কপিল—ভামা যদি ক্ষেমার তরবারি-চালনা একবার দেখতো!

আমি —তাহলে তুমি দেখেছো, কেমন?

কপিল—আরে, ও তো সবেমাত্র আমার কাছে শিখতে শুরু করেছে, কিন্তু ওর তরবারির হাত খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে।

আমি —তবে তো ক্ষেমাকে শীগ্‌গিরই সেনানীর পদ দিতে হবে। কিন্তু তুমি তাকে যে শিক্ষা দেবে, এ সবই তার ওপর নির্ভর করে।

কপিল —আমার মনে হয় খড়্গ-চর্মে [ঢাল-তরোয়াল] দক্ষতা জন্মাতে আরো দিন পনেরো লাগবে। আর অশ্বারোহণ তো ক্ষেমা জানেই। কিন্তু শল্য, তীর-ধনুক প্রভৃতির কৌশল এখনো শিখতে হবে।

ক্ষেমা —তীর-ধনুক আমি ভালোরকমই চালাতে পারি।

কপিল —লক্ষ্যবেধ পর্যন্ত তোমার দক্ষতা আছে। কিন্তু তীরের শক্তি আরো অনেক দূর বাড়ানো দরকার। তবে যে লক্ষ্য বেধ করতে পারে, তার পক্ষে পরের কাজগুলো শেখা সহজ। মোটের ওপর ক্ষেমার শিক্ষার জন্যে আরো দেড়মাস সময় দরকার সিংহ।

—কিন্তু দেড়মাস অবধি তুমি যে ক্ষেমাকে শিক্ষা দিতে পারবে, আমার তো তা মনে হয় না কপিল।

—কাল তোমার সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছিলো, তাতে আমারও তো তাই মনে হয়। তাহলে তুমি উল্কাচলে কবে যাচ্ছো সিংহ ?

—এই সপ্তাহেই।

মাঝখানে ভামা হঠাৎ "আমি শেঠদের বাড়ীটা একবার দেখবো" বলে উঠে গান্ধার-পুত্র শান্তনুকে নিয়ে তিন জনেই চলে গেলো।

কপিল তার কথার জের টেনে বললো —তাহলে সেই সময় আমাকেও সেখানে যেতে হবে তো ?

আমি —নিশ্চয়। সেখানে এক সপ্তাহ থেকে গঙ্গাতটের সমরসজ্জা দেখে-শুনে তারপর মহীর গুপ্ত দুর্গ দেখতে হবে। আমার মনে হয়, আমাদের যুদ্ধতরীকে দৃঢ় করবার জন্যে আরো কিছু করা দরকার। প্রথমে আমরা এগারো জন গিয়ে সেগুলো দেখবো। তারপর এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা যাবে। আমাদের এই কাজে লৌহশিল্পীদেরও সাহায্য আর সম্মতি নিতে হবে। বৈশালীর পশ্চিম দিকের সরোবরকেই তরীগুলির পরীক্ষাস্থান করলে কি ভালো হয় না কপিল ?

কপিল একটু চিন্তা করে বললো —আমার মনে হয় এটা উচিতও বটে। কারণ তোমার মুখে শুনেছি, মহীর একদিকের তটভাগ লিচ্ছবিদের অধিকারে আছে। তার অর্থ হলো, অপর পার থেকে এ পারের সব দেখা যায়।

—আর আমার প্রস্তাবিত স্থানে আমরা বেশ খানিকটা গুপ্তভাবেই কাজ করতে পারবো।

—তাহলে তাই করো সিংহ। নৌকাগুলি দেখে আমরা রদবদলের কথা চিন্তা করবো, আর সেই সঙ্গে নাবিকদের শিক্ষা এবং পরীক্ষার কাজও চলবে। নৌবাহিনী সংগঠনের পর আমরা আমাদের সঙ্গীদের স্থায়িভাবে মহীতে

পাঠাতে পারবো। তাছাড়া ওখানে শিল্পীদের সাহায্যে নৌবাহিনীর তরীগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং যে ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে হবে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে শিল্পীদের অধিক সংখ্যায় মহীতটে নিয়ে গিয়ে কাজ শীগ্‌গির শেষ করতে হবে।

—তাড়াতাড়ি শেষ করবার কথাটা তো সব কাজেই মনে রাখতে হবে, কারণ আর মাত্র দেড়মাস শীতকাল আছে। ঠাণ্ডাতেই ভালোভাবে যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু বিম্বিসার ক্রমাগত কালক্ষেপ করছে, এখনো তার প্রস্তুতি শেষ হয়নি। আর আমার তো মনে হয়, আমাদেরও প্রস্তুত হতে খুব কম করে এক মাস সময় লাগবে।

—তাহলে এ কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যুদ্ধ যদি করতেই হয় তো একমাস পরে করবো। কিন্তু গ্রীষ্মকাল আহতদের পক্ষে বড়ো কষ্টকর।

—কিন্তু রাজা বিম্বিসার কিংবা এ যুদ্ধের সত্যিকার উদ্যোক্তা অজাত-শত্রুর আহতদের সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথাই নেই। একটার জায়গায় দশটা মরলে ওদের পক্ষে আরো ভালো। তবে বিম্বিসারকে আক্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে না। যুদ্ধারম্ভ কবে করতে হবে, সব পরিস্থিতি দেখে পরে আমরা তা স্থির করবো।

—তাহলে কুমার অজাতশত্রুকেই তুমি এ যুদ্ধের মূল বলে মনে করো?

—হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বৃদ্ধ বিম্বিসার লিচ্ছবিদের খড়্গের সঙ্গে সুপরিচিত। যদি তাঁর কথামতো কাজ হতো, তাহলে নিশ্চয় তিনি লিচ্ছবিদের ঘাঁটাতেন না।

—কিন্তু এই ঘাঁটানোর কারণটা কি?

—বিজয়, প্রভুত্ব।

—আর অপর জাতিকে পরাধীন করা।

—মিত্র কপিল, এই রাজাগুলোর সবচেয়ে বড়ো লোভ হলো চক্রবর্তী অর্থাৎ সারা পৃথিবীর একমাত্র রাজা হওয়ার।

—পার্শব শাসানুশাস [শাহানশাহ্‌] কুরু আর দরায়ুর মতো ?

—ওঁদের চেয়েও বড়ো। চক্রবর্তী হতে হলে শত শত জাতি আর দেশকে পরাধীন করা দরকার।

—অথচ আমাদের, গণতন্ত্রীদের লক্ষ্যটা একেবারে উল্টো। আমরা নিজেরাও পরাধীন হতে চাই না, অপরকেও পরাধীন করতে চাই না।

—চাইলেও আমরা পারি না। কারণ আমাদের রাজ্যসীমা রক্তের সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। যেখানে লিচ্ছবি নেই সেখানে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করা আমাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো, আমরা গণতন্ত্রীরা কখনও বিশাল ভূমির ওপর আধিপত্য করতে পারবো না।

—যদি করিও, তাহলে গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করা হবে। তখন গণ-এর হাত থেকে গণ-এর সেনাপতির হাতে শাসনক্ষমতা চলে যাবে। আর সেই সেনাপতির অধীনে স্বজাতীয় বিজাতীয় সবরকম সৈন্যই থাকবে।

—বিজাতীয় কেন?

—বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের বিভিন্ন জাতিকে শুধু অস্ত্রবলের সাহায্যেই পরাধীন রাখা যায়। আর তার জন্যে একটা জাতি যথেষ্ট নয়।

—তাহলে তো সেই সেনাপতিই পরে রাজা হয়ে বসবে।

—রাজতন্ত্রের আরম্ভও হয়েছিলো ঠিক এইভাবে।

—তাহলে গণ-এর আর ভরসা কোথায়?

—গণতন্ত্রীদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত স্বাধীনতার অগ্নি এবং রাজাদের বহু-সংখ্যক সমৃদ্ধ জনপদে একাধিপত্য করার অসাফল্যের মধ্যেই গণতন্ত্রের আশার বীজ সুপ্ত আছে।

—ধরো, যদি অঙ্গ-মগধ আর কাশী-কোশল, দুটো রাজ্যই অজাতশত্রুর হাতে চলে যায়?

—তাহলে কি হবে, সে কথা চিন্তা করতেও বুক কেঁপে ওঠে।

—এর দ্বারা এই কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, রাজতন্ত্র নিজের সীমা বিস্তার না করে বেঁচে থাকতে পারে না।

—বড়ো মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়ে নিজে বড়ো হয়।

—এবং গণতন্ত্র একমাত্র নিজের সীমার মধ্যেই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

—কিংবা নিজের সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অপরের দেশ দখল করতে পারে।

—কিন্তু সে কেবল নিজের সন্তানদের দ্বারাই?

—নিশ্চয়। কারণ এখানে রক্তের সম্বন্ধই সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

—তাহলে গণ-এব ভবিষ্যৎ কি?

আমি—সে কথা ভবিষ্যৎই বলতে পারে কপিল ভাই। এখন আমরা শুধু এইটুকুই জানি—গণ-এর জীবন বেশী সুন্দর, স্বচ্ছন্দ আর মানবোচিত। আর রাজতন্ত্রে মানুষের জীবন, দাসত্বে ভরা। আমি বা আমার সহ-নাগরিকরা প্রাণ থাকতে এই জীবনযাত্রার সঙ্গে তার বিনিময় করতে পারি না।

এমন সময় শান্তনুর সঙ্গে অপ্সরা তিনটি ফিরে এলো। রোহিণী বললো—আমি অবশ্য রাজপ্রাসাদ কখনও দেখিনি। তবে শেঠের বাড়ীটার মতো এমন সুন্দর বাড়ীও আর কখনও দেখিনি, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি।

আমি —কিন্তু এই শেঠ লিচ্ছবি ছিলেন না।

কপিল —ইনি যে-কোনো লিচ্ছবি-পরিবারের চেয়ে ধনী ছিলেন।

আমি —বরং বলো যে, দশ-বিশটা মহাধনী লিচ্ছবিকে কিনতে পারতেন।

কপিল —তাঁর এতো টাকা হলো কি করে?

আমি —ব্যবসা করে। তিনি প্রাচীর একজন মস্ত বড়ো সার্থবাহী ছিলেন। তাঁর একজন পূর্বপুরুষ কোশলরাজের ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে বৈশালীতে চলে আসেন।

কপিল —কিন্তু ঐ বাড়ীটা খালি কেন?

আমি —কারণ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। নিঃসন্তান লোকের সম্পত্তি লিচ্ছবি গণ-এরই অধিকারে আসে।

কপিল —আচ্ছা, তুমি যে বললে বজ্জীর শাসন-সূত্র লিচ্ছবিদের হাতে, তাহলে শেঠের মতো অ-লিচ্ছবিদের ভ্রম বা অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

আমি —গৃহপতিদের [বণিক] নিজেদের শক্তিশালী শ্রেণী বা বণিক সভা আছে। কোনোরকম অন্যায় হলে শ্রেণী গণ-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। গণ সব সময় ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে গণ-এর স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখে। সুতরাং তারা শ্রেণীর আবেদনে মনোযোগী না হয়ে থাকতে পারে না। রাজতন্ত্রেও অবশ্য এমনি শ্রেণী আছে, কিন্তু সেখানে রাজা যা করবেন বলে স্থির করেন, প্রায়শই তাতে সফল হয়ে থাকেন। সুতরাং রাজার ওপর শ্রেণীর প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় না। তবে সেখানে শ্রেণী নিজের অন্তর্ভুক্ত লোকদের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী। কিন্তু আমাদের এখানে শ্রেণীকে গণ-এর মধ্যে ছোট একটা গণ বলতে পারো। সে কেবল শ্রেষ্ঠী ব্যাপারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক ঝগড়া-বিবাদই দেখাশোনা করে না, অন্য জনপদে বজ্জীর ব্যবসায়ীদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করে। আর সেই সঙ্গে এতে আমাদেরও একটা উপকার হয়। সার্থবাহদের ব্যবসা হয় আন্তর্জাতিক—অনেক রাজ্যেই তার ব্যবসায়গত স্বার্থ থাকে। তাই বজ্জীর বাইরেও বহু দূর-দূরান্তে তাদের কুঠী আছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা বজ্জীর বিরুদ্ধাচরণও করতে পারে। কিন্তু শ্রেণী আন্তর্জাতিক হয় না। তারা শুধু বজ্জীরই, এবং সেই জন্যেই এ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও সহ্য করতে পারে না।

কপিল —কিন্তু যদি কতকগুলো স্বার্থপর লোক শ্রেণীর সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে নেয়?

আমি —অসম্ভব। তা কিছুতেই পারে না। অধিকাংশ বণিকের ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু বজ্জীর মধ্যেই আছে। তাছাড়া শ্রেণী বড়ো বড়ো ধনী

বণিকের প্রভাবমুক্ত। কারণ তার নিজেরই প্রচুর অর্থ আছে। পুরুষানুক্রমে শ্রেণীর ধন জমা হয়ে আসছে।

কপিল —শ্রেণীর অর্থ ?

আমি —হ্যাঁ, শ্রেণীর জন্যে প্রত্যেক বণিক নিজের আয়ের কিছু অংশ পৃথক করে রাখে। শ্রেণীর তো নিজেরও খরচ আছে। সেই খরচ বাদে অবশিষ্ট অর্থ তারা সুদে খাটায়। শ্রেণীর অর্থ তো আর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বণ্টন করা হয় না! সুতরাং কালক্রমে তার অর্থ বেড়েই চলেছে।

কপিল —আমাদের ওখানে তো শ্রেণী নেই ভাই। তাই এটা আমার কাছে কিছুটা বিচিত্র মনে হয়।

—বিচিত্রই বটে! এই দেখো না কেন, শেঠজী যদি বেঁচে থাকতে থাকতে তাঁর প্রাসাদটি নিজের শ্রেণীকে দান করে যেতেন, তাহলে এটা গণ-এর অধিকারে আসতো না। তাহলে এখন এর ভাড়াটাও শ্রেণীই পেতো। আমাদের এখানের বহুপুত্রক-চৈত্য প্রভৃতি অনেক দেবস্থানের ধনসম্পত্তি শ্রেণীর কাছে গচ্ছিত আছে। প্রতি বছর তার সুদ থেকে সেখানের পূজো উৎসব প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হয়।

—সারা বজ্জীতে তাহলে অনেকগুলো শ্রেণী ?

—তা আছে বৈকি। বণিক—শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের একটা শ্রেণী, শিল্পীদের এক-এক শিল্পের এক-একটা পৃথক শ্রেণী—যেমন দন্তকারদের শ্রেণী, লৌহকারদের শ্রেণী ইত্যাদি।

—আর তোমার মতে তারা গণ-এর মধ্যেই এক-একটা গণ ?

—আর রাজ্যের মধ্যে রাজ্যও বটে। কারণ এমনি শ্রেণী মগধ, কোশল, বৎসের মতো রাজ্যেও আছে। তবে সেখানকার শ্রেণীগুলো এখানকার তুলনায় অনেক কম সুদৃঢ়। গণ-এর শ্রেণীগুলোর গঠন অনেকটা গণ-এর মতোই।

আমরা দু'জনেই কেবল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে যাচ্ছি, তাই অপ্সরারা কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলো। সুতরাং আমিই ভামাকে বললাম —বৌদি, তুমি চুপ করে আছো কেন ?

ভামা —সাধ করে কি আর চুপ করে আছি দেবর ? আমি তো ভাবছিলাম —হতভাগা শ্রেণীর মরণও যদি হয়, তবুও আমাদের বুঝি খালি হাতেই ফিরতে হবে।

আমি —খালি হাতে ?

ভামা —তাছাড়া কি! তুমি ভাবছো, এই তিন অপ্সরাকে তুমি বাণিজ্য গ্রামে [বৈশালীর একটি পল্লী] বেড়াতে নিয়ে এসেছো। কিন্তু আমরা একটা মতলব নিয়ে এসেছি। লিচ্ছবি-নারীদের শিক্ষা বিষয়ে আমরা কপিল ভাইয়ের পরামর্শ চাই।

আমি —অস্ত্র-শিক্ষার ব্যাপারে তো ?

ভামা —তাছাড়া কি ? সেনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে যাদের, এমন সমস্ত লিচ্ছবি-নারীদের বিষয়েই পরামর্শ চাই।

আমি —তাহলে ভাই কপিল, তোমরা কথাবার্তা বলো। লিচ্ছবি-নারীরা তোমার দিকেই ঝুঁকেছে দেখছি।

ভামা —এটা তোমার ঈর্ষার কথা হলো দেবর !

আমি—এর মধ্যেই ঈর্ষা করলে চলবে কেন ?

ভামা —তাহলে তোমার ওপরও লিচ্ছবি-নারীরা ঝুঁকতে রাজী আছে। তুমি যেভাবে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছো, তাতে এটাই তো স্বাভাবিক। আচ্ছা, এখন একটা কথা বলো তো কপিল ভাই। আমাদের বাহিনীতে কতো বছর পর্যন্ত বয়সের মেয়েদের গ্রহণ করা হবে ? আর তাদের কি কি শিখতে হবে ?

কপিল —আমার মনে হয় ভামা, লিচ্ছবি-নারীসেনা দুটো অংশে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক দলে থাকবে শস্ত্রধারিণীরা, অপর দলে ঔষধ-পথ্য দেবার মতো শুশ্রূষাকারিণীরা। অর্থাৎ প্রথম দল শত্রুকে আঘাত হানবে। দ্বিতীয় দল শত্রুর আঘাতে আহতদের সুস্থ করে তুলবে। আহতদের অপসারণ প্রভৃতি কাজগুলো সৈনিকরাই করে থাকে, তাতে যুদ্ধের কাজে খানিকটা বাধারও সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমার মতে আহতদের অপসারণ, সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজগুলো করবার অন্য একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

ভামা —তাহলে এর জন্যে আমাদের পৃথক শল্য-চিকিৎসক, চিকিৎসা শিবির, ঔষধপত্রের প্রচুর ব্যবস্থা করতে হবে।

কপিল —আর খাদ্য তৈরী করা, পরিবেষন করা ইত্যাদি কাজগুলোও লিচ্ছবি-নারীরা করতে পারে।

ভামা —কিন্তু একে কি সৈনিক-বৃত্তি বলা চলে ?

কপিল —যে মুহূর্তে শল্য [ভল্ল], খড়্গ আর বাণ-বৃষ্টির মধ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই তারা সৈন্যবাহিনীর একটা অঙ্গ বলে গণ্য হবে।

ভামা —বেশ, এটা আমরা মেনে নিলাম।

কপিল —এইসব মেয়েদেরও কিছু অস্ত্র-শিক্ষা দিতে হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন হবে। অপর লিচ্ছবি-নারীসেনা কেবল অস্ত্র-শিক্ষা করবে। সাধারণ একজন সৈনিকের শিক্ষণীয় সব কিছুই তাকে শিখতে হবে।

ভামা —এ শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকবে না।

কপিল —নিশ্চয়। একালের মেয়েদের প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের খড়্গ পুরুষের চেয়ে কম তীক্ষ্ণ নয়।

ভামা —কিন্তু কপিল ভাই আর লিচ্ছবি-নারীদের কুলদেব সিংহ, তোমরা দু'জনেই বলো —প্রথমোক্ত সেনাদলে কি আমরা অ-লিচ্ছবি নারীদের নিতে পারি না ? আমার আশা আছে, আমাদের ব্রাহ্মণীরা, গৃহপত্নীরা এর জন্যে প্রস্তুত হতে পারে।

আমি —এতে রাজী হওয়া-না-হওয়া যাঁদের ওপর নির্ভর করে, সেই সেনাপতি আর গণপতি এ বিষয়ে অরাজী হবেন না বলেই আমার মনে হয়।

কপিল —আমারও তাই মনে হয়।

ভামা —আর লিচ্ছবি-নারীদের যুদ্ধ-গুরু, বৈশালীতে অবস্থানকালে তুমি আমাদের অস্ত্র-শিক্ষা দেবে বলেই আমরা আশা করি।

কপিল —নিশ্চয়।

ভামা—তাহলে দেবর, তুমি অ-লিচ্ছবি নারীদের জন্যে সেনাপতি আর গণপতির স্বীকৃতিটা আদায় করে দাও। তারপর একমাসের মধ্যেই লিচ্ছবি-নারীরা ভামার নীতি অনুসরণ করে, কি আম্রপালীর পথ অনুসরণ করে, সেটা দেখে নিও। সত্যি দেবর, আম্রপালীর নাম শুনলেই কেমন যেন রাগ হয়। সে শুধু অনেক লিচ্ছবি-পরিবার, লিচ্ছবি-তরুণকেই নষ্ট করেনি ; লিচ্ছবি-মেয়েদেরও যেন লিচ্ছবি-মেয়ে থাকতে না দেবার জন্যে পণ করেছে।

আমি —তাহলে ভামা, সন্ধ্যার সময় তুমি আর রোহিণী আমার সঙ্গে সেই বুড়োর বাড়ীতে চলো না কেন ? সন্ধ্যার সময় পেয়ালা সামনে রেখে গল্প করা বুড়োদের একটা রোগ বলতে পারো ।

ভামা —ঠিক বলেছো দেবর। তারপর আমরা আমাদের তরুণী-পরিষদে যাবো।

আমি —পরিষদ ?

ভামা —হ্যাঁ। সোমা তার পিতৃগৃহটি আমাদের কাজের জন্যে দান করেছে। আমাদের দলের তরুণীরা আজ সেখানে একত্রিত হবে।

আমি —বটে ! মামলা এতোদূর গড়িয়েছে ! আমি ভাবছিলাম ভামা বৌদি বুঝি এখনো বাতাসে উড়ছে।

ভামা —দেবর ! তোমার বৌদি জমির ওপর দিয়েও কতোটা দৌড়োতে পারে, তা দেখবে। আর একটা কথা। লিচ্ছবি নারী-সেনাদের কি স্ত্রী বেশেই থাকতে হবে ?

আমি —কেবল সৈনিক-বেশে।

ভামা —যা স্ত্রী-বেশ হতে পারে না। আর ?

আমি —আর পার্থক্য কি রইলো ? আমাদের পুরুষদেরও অমনি লম্বা লম্বা চুল হয়। পাগড়ী বেঁধে দিলে তোমাদের পুরানো পাগড়ী পুরুষের মতোই হয়ে যাবে। কিন্তু বক্ষ ?

ভামা —লজ্জা করো না দেবর। কিন্তু তাও আমরা ঠুকেপিটে ঠিক করে নেবো।

কপিল —আর যাদের ঠুকেপিটেও ঠিক করা যাবে না, তাদের চিকিৎসা বিভাগে কাজ দিও ভামা।

ভামা —ঠিক বলেছো। আমি বুঝেছি। শত্রু যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্ত্রী কি পুরুষ, তা বুঝতে না পারে।

কপিল —এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমি —আর আমিও।

ভামা —তাহলে আমাদের বেশের সমস্যাও মিটলো।

কথাবার্তা শেষ হলো। আমরাও রথে করে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার সময় দুটি অপ্সরার রক্তিম অধর থেকে কথা বার হতে না হতে সেনাপতি আর গণপতি তা মঞ্জুর করলেন।

আঠারো

বনভোজ

উল্কাচলে যাত্রা করার দু'দিন আগে লিচ্ছবিদের বনভোজ মহোৎসবের দিন ছিলো। সারা বৎসরে মাত্র একবার শীতকালে এই উৎসব হয়। নামে এটা ভোজ বটে; কিন্তু লিচ্ছবি স্ত্রী-পুরুষরা সেদিন খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল লবণ আর কাঁচা মদ ছাড়া অন্য কিছু সঙ্গে নিয়ে যায় না। তারা সেদিন তাদের পূর্ব-পুরুষদের মতো অস্ত্রবলে খাদ্যদ্রব্য জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে। যুদ্ধের আশংকা প্রবল, তাই এবারের বনভোজে বহু সৈনিককেই যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া গেলো না। যারা যাবার অনুমতি পেলো, তারাও কাছাকাছি কোনো মহাবনে গেলো। মহাবন তো প্রায় সর্বত্রই ছিলো। হিমবান্ [হিমালয়] থেকে পূর্ব সমুদ্র [বঙ্গোপসাগর] পর্যন্ত প্রায় সমস্তটাই মহাবন। যদিও বসতি বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই গভীর জঙ্গলের তুলনায় তা অতি নগণ্য।

বৈশালীর লিচ্ছবিদের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব দিকে যাত্রা করতে হয়। এক যোজন পরে আমরা মহাবনে পেঁছালাম। সকলেই ছোট-বড়ো বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। আমার দলে মনোরথ, অজিত প্রভৃতি অনেক লিচ্ছবি এবং শান্তনু, কপিল প্রভৃতি তক্ষশীলা থেকে আগত তরুণ আর রোহিণী, ভামা, ক্ষেমা প্রভৃতি অনেক তরুণী ছিলো।

মহাবনে গবয় [নীলগাই], হরিণ, শূকর, গণ্ডার, মহিষ, গোধা, [গোসাপ] প্রভৃতি শিকারের উপযোগী পশু প্রচুর আছে। কিন্তু সারা লিচ্ছবি জাতিটাই পূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে যখন শিকার করতে বেরিয়েছে, তখন সকলের শিকার জুটবে কি-না সন্দেহ। আমরা আমাদের নিকটবর্তী শবরদের [বন্য জাতি] কিছুটা মেরয় আর কিছু তীরের ফলা উপহার দিলাম। এইভাবে ঘনিষ্ঠতা হলে অজিত যখন জিজ্ঞাসা করলো, তখন তারা শিকারের সন্ধান দিতে রাজী হলো। তাদের কথায় বুঝলাম, এখানে সবচেয়ে সুলভ হলো গণ্ডার। সুলভ অর্থে অবশ্য খুব সহজেই তাদের দেখা মিলবে। কিন্তু তাদের চামড়া বাণ দিয়ে ভালো করে বিন্ধ করাও যায় না, তরবারির আঘাতে ছিন্নও করা যায় না। আর তাদের নাকের ডগায় যে শিং থাকে তার আঘাত থেকে বাঁচা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে গণ্ডারকে তাড়িয়ে নিয়ে

ফেলতে পারলে কিংবা কোনো চতুর সুদক্ষ ধনুর্ধর তার দুটো চোখ একসঙ্গে বাণবিদ্ধ করতে পারলে তবেই গণ্ডারকে বধ করা যায়। শবররা গণ্ডারের আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজী হলো। আমাদের দলে অনেকেই গণ্ডার শিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেও চার জনের বেশী যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি, অজিত, মনোরথ আর রোহিণী গণ্ডার শিকারে যাবো বলে স্থির হলো। কপিলের দল —যাতে ভামা আর ক্ষেমাও ছিলো, ওরা শূকর শিকার করবে আর অপর কয়েকটি দলের কোনোটি হরিণ, কোনোটি ময়ূর, কোনোটি মহিষ, কোনোটি বা নীলগাই শিকারে গেলো।

আমরা অবশ্য তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইছিলাম। কিন্তু তবুও যখন শিকারে রওনা হলাম, তখন দিনের অর্ধেকটাই চলে গেছে। আমাদের পায়ে নরম জুতা থাকায় চলার সময় কোনো শব্দ হচ্ছিলো না। আড়াই মাইল পর্যন্ত আমরা খুব জোরেজোরেই হাঁটতে লাগলাম। তারপর শবর একটা পল্বলের [ডোবা] ধারে গিয়ে আমাদের দেখালো —সেখানে হাতীর পায়ের মতো গণ্ডারের পায়ের ছাপ পড়েছে। তাদের শিং দিয়ে খোঁড়া মাটিও দেখতে পেলাম। শবর কান পেতে একবার পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করে, অতঃপর নাকের ডগা ফুলিয়ে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকতে থাকে। খানিকটা চিন্তা করে সে বলে —গণ্ডার এখান থেকে বেশী দূরে নেই। অর্থাৎ আপনারা খুব বিপজ্জনক জায়গাতেই আছেন। ঐ যে পাখীর ডাক শুনতে পাচ্ছেন, ওরই আশপাশে গণ্ডার আছে। ঐ পাখীকে গণ্ডারী পাখী বলে। বাতাস ওদিক থেকে এদিকে বইছে তাই রক্ষে! চোখের দিক দিয়ে গণ্ডাররা যেমন দুর্বল, তাদের ঘ্রাণশক্তি ঠিক তেমনি প্রবল। এখন যদি বাতাসের গতি পালটে যায়, তাহলে আমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো কি-না সন্দেহ। তবে এখন বাতাসের উলটো দিকে বইবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি এখন আপনাদের ওদিকে নিয়ে যাচ্ছি। যেখানে বলবো, ঠিক সেখানে দু'জন গাছে উঠে পড়বেন। নিজের নিজের ধনুকও তৈরী রাখবেন। অপর দু'জনকে আমি গণ্ডারের কাছে নিয়ে যাবো। খুব সাবধান, যেন একটুও পায়ের শব্দ না হয়। গণ্ডারের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। তারপর আমি যেমন করে এক গাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়ালে সরে যাবো, আপনাদেরও ঠিক তেমনি করে যেতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের তিন জনকে একই সময় গণ্ডারের চোখে তীরবিদ্ধ করতে হবে। যেমন গণ্ডারটা মাথা তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকবে আর চোখ তুলে দেখবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুঁড়তে হবে।

আমরা শবরের পিছু পিছু চললাম। আমরা যতোই এগিয়ে চলেছি, পাখীর ডাক ততোই কাছে শুনতে পাচ্ছি। অবশেষে একটা শুকনো ডোবার ধারের আগাছা আর ঘাসের মধ্যে মাটির ওপর মেটে মেটে রঙের একটা কি

নড়ছে দেখতে পেলাম। শবর ইঙ্গিত করতেই রোহিণী আর মনোরথ একটা গাছে উঠে পড়লো। এবার আমরা তিন জন এগিয়ে চললাম। লক্ষ্য করলাম সেই ধীরে ধীরে দোল-খাওয়া দেহটির কাছে যতোই এগিয়ে চলেছি, ততোই আমার হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে চলেছে। তবে ভয় নয়, যেন খুব উল্লাসই বোধ হচ্ছে। গণ্ডারটা এখন আমাদের কাছ থেকে তিরিশ হাত দূরে আছে। শবর আমাদের দুটো করে নতুন তীর দিয়ে দুটো গাছ ইশারা করে দেখিয়ে দিলো। তারপর নিজে তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে পড়লো। আমি আর অজিতও তার নির্দেশমতো গাছ দুটোতে উঠলাম। শবর ধনুকে তীর যোজনা করলো দেখে আমরাও তাই করলাম।

গণ্ডারটা মাঝে মাঝে শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, শুকনো কাঠ চর্বণ করছে, আবার মাঝে মাঝে বাতাসে কান খাড়া করে কিসের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে আর বাতাসে কি যেন শুঁকছে। তারপর আবার মাটি খুঁড়ছে। হঠাৎ শবর একটা ডাল ভেঙে নীচে শুকনো পাতার ওপর ফেললো। তার ফলে একটা মর্মরধ্বনি উঠলো পাতাগুলি থেকে। সেই শব্দ শুনে গণ্ডারটা মাটি থেকে মুখ তুলে নিজের ছোট ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত করে আমাদের দিকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। সেই সময় শবরকে তার ধনুকের গুণ টেনে তীরটাকে ছোঁড়বার উদ্যোগ করতে দেখে আমরাও তীর ছোঁড়ার উদ্যোগ করলাম এবং তার তীর ছোঁড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডারের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলাম। ডান চোখটা আমার লক্ষ্য ছিলো, বাঁ চোখ ছিলো অজিতের। দেখলাম, দুটো তীর গণ্ডারের চোখে বিঁধেছে। তৃতীয় তীরটি তার শিঙে লেগে নীচে পড়ে গেছে। বোধ হয় এ তীরটা আমার।

গণ্ডারটা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তীরটাকে বার করে ফেলবার জন্যে মাটিতে মুখ ঘষতে লাগলো। ফলে তীরটা আরো ভেতরে ঢুকে গেলো। আমরা বুঝতে পারলাম, এখন গণ্ডারটা অন্ধ এবং যন্ত্রণায় তার দেহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো বিকলপ্রায়। তাই তিন জনেই গাছ থেকে নেমে এসে যার যার বর্শাগুলো তুলে নিলাম। প্রথমে আমিই তার বাঁ পাঁজরের নীচে কলিজা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে আমার বর্শা নিক্ষেপ করলাম। বর্শা ঠিক জায়গাতেই লেগেছিলো; কিন্তু আমি আর সেটা বার করতে পারলাম না। গণ্ডারটা আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন আমার দু'জন সঙ্গীই নিজের নিজের বর্শা নিক্ষেপ করলো। ততোক্ষণে রোহিণী আর মনোরথও এসে পড়েছিলো। আমি রোহিণীকে বললাম—প্রিয়ে, তুমি তোমার বর্শা দিয়ে এর জীবনের সমাপ্তি ঘটাও।

রোহিণী প্রচণ্ড জোরে গণ্ডারটার পেটে বর্শাটাকে প্রবেশ করিয়ে সেটা টেনে বার করবার সময় তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলো। তবুও তার প্রাণবায়ু

বহির্গত হলো না। রোহিণী সেটাকে দেখার জন্যে কাছে যাবার উপক্রম করতেই শবর তাকে বাধা দিয়ে বললে —একটা বড়ো মহিষকে বধ করতে ওর ঐ একটা শিঙের এক আঘাতই যথেষ্ট।

আরো কিছুটা আঘাত করার পর গণ্ডারটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো। তার পা শিথিল হয়ে গেলো। শবর তখন তাকে একটা ঢেলা ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু গণ্ডারটা একটুও নড়লো না।

বাঁশ আর দড়ি থাকলেও এতো বড়ো দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমাদের কাছে একটা করে খড়্গ আর ছোরা ছিলো। শবরের কাছে ছিলো কাঠ-কাটা একটা ভোজালি। আমরা গণ্ডারের পেট চিরে তার কলিজাটা বার করলাম। সেটাকে ডেরায় পাঠাতে হলে দড়ি, বাঁশ আর লোকজন আনাতে হবে। তাই ঠিক হলো, আমি আর শবর সেই-খানেই থাকবো, বাকী তিন জন যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে যাবে। ওরা চলে গেলে আমি গণ্ডারের দেহটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তার শিংটা এক হাতের চেয়ে বড়ো। পিঠ আর পাশের চামড়া পরতের ওপর পরত জমাট হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে মনোরথ কয়েকজন লিচ্ছবি এবং শবর তরুণকে নিয়ে ফিরে এলো। গণ্ডারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য আমাদের ছিলো না। আমরা তো মনে করলাম —চামড়া ছাড়াতেই রাত হয়ে যাবে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ জন শবর চামড়াটা দেহ থেকে পৃথক করে ফেললো। বড়ো বড়ো টুকরো করে মাংসটাকে কেটে ফেলতে আমরাও সাহায্য করলাম। সেখান থেকে মাংস, চামড়া, শিং প্রভৃতি মাথায় নিয়ে যখন আমরা রওনা হলাম, তখনো দিনের এক প্রহর বাকী আছে। সফল শিকারীর আনন্দ, বিশেষভাবে সবচেয়ে কঠিন শিকারে সাফল্যের আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

আমাদের অন্যান্য দলের মধ্যে মাত্র দুটির সফলতা লাভ হয়েছিলো। একটি দল পেয়েছিলো একটা ছোট মহিষ, আর ভামা-ক্ষেমা-কপিলের দল শিকার করেছিল তিনটে শূকর।

সূর্য তখন ডোবে-ডোবে। যাত্রার সময় বৈশালীতে যা কিছু খেয়েছিলাম, তাছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। সুতরাং এখন প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। কপিলের দল অনেকখানি বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে এসেছিলো বলে আগুন জেলে মাংস ঝলসাতে শুরু করে দিয়েছিলো। সেই ঝলসানো মাংস আর আগুনে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা চর্বির সুগন্ধ চারিদিক এমন আমোদিত করছিলো যে, মানুষ তো তুচ্ছ, দেবতাদেরও লালা ঝরবে। আমাদের মণ্ডলীতে তিনশোর কাছাকাছি নর-নারী ছিলো।

কিন্তু এতো মাংস ছিলো যে তিন দিনেও তা শেষ হবার নয়। তাই গণ্ডার আর মহিষের মাংস আশপাশের শবরদের বণ্টন করে দেওয়া হলো।

কোথাও মাংস আগুনের ওপর রেখে, আবার কোথাও শিকে বিঁধে ঝলসানো হচ্ছিলো। ভামা কয়েকটি শিক আগুনের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাংস তৈরী করছিলো। আমি বললাম —বৌদি, মনে হচ্ছে এখন পেটে কিছু না পড়লে প্রাণে বাঁচবো না।

ভামা —এসো দেবর। আমার এই হাতে অনেকগুলো উদর পূর্তির কাজ করেছি। এখানে বসো। এই দেখো, এই শিকটায় কেবল পিছলি রাং এর মাংস আছে, সেদ্ধও প্রায় হয়ে এসেছে।

আমাকে সেদিকে অগ্রসর হতে দেখে অজিত বলে উঠলো —তাহলে বৌদি আমি এখন কোন ঘাটে যাবো ?

ভামা —তুমিও এসো না।

রোহিণী —আর আমি ?

ভামা —এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছো রোহিণী ?

মনোরথ —তাহলে সত্যিকার কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করার লোক কেউ যদি থাকে, তবে সে শুধু আমি। এই দেখো এখানে বসে পড়লাম। —বলে মনোরথ ভামার পাশে গিয়ে বসলো।

ক্ষেমা সবুজ পাতার তৈরী পাত্র সামনে পেতে দিলো এবং ভামা তাড়াতাড়ি একটা শিকের মাংস তাতে ঢেলে দিলো। আমরা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নুন দিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম।

অজিত জিজ্ঞাসা করলো —বৌদি, ক্ষেমা অল্পের জন্যে কেমন করে বেঁচে গেছে, সে কথাটা এবার বলো।

ভামা —ক্ষেমা যে সশরীরে বিদ্যমান, সে তো দেখতেই পাচ্ছো। আমি কথা বলবো, না মাংস তৈরী করবো বলো দেখি !

অজিত —দুটো কাজ একই সঙ্গে করলে ভালো হয়।

কপিল —আর ভামা যেমন সুন্দর করে বলতে পারে, এমন আর কেউ পারে না।

ভামা —কিন্তু তুমি তো জানো কপিল ভাই, শিকটা ঘুরিয়ে না দিলে একদিকের মাংস পুড়ে যাবে, অন্যদিকের মাংস কাঁচা থেকে যাবে।

ক্ষেমা —আমিও কি একটু সাহায্য করবো বোন ?

ভামা —এসো না ভাই। আমি আঁচটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি, তুমি কাঠ জ্বালিয়ে কয়লা তৈরী করো। তাহলে দেবর সিংহ, তুমিও আমাদের শিকার যাত্রার কাহিনী শুনতে চাও ?

—হ্যাঁ বৌদি ! তুমি যখন কথা বলো, মনে হয় ফুল ঝরছে।

—তাহলে সে ফুল কুড়িয়ে দেখো সেগুলো ধুতরো না বকুল।

—বোধ হয় দেবকুসুম, বৌদি।

—পারিজাত! সে তো কখনও চোখেও দেখিনি দেবর! তবে তুমি যখন আমাদের অপ্সরা বানিয়েছো, তখন আমাদের মুখ থেকে ঝরা ফুল পারিজাত তো হবেই। তবে শোনো, কাহিনী শুরু করছি। আর মনোরথ তোমার বড়ো বড়ো দাঁতগুলো দিয়ে মাংস চিবোতে চিবোতে এক একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ো, যাতে আমি বুঝতে পারি তুমি আমার কথা শুনছো, না সারা দুনিয়াকে বোঝাতে চাইছো যে নিজের পত্নীকে তুমি গ্রাহ্যই করো না।

মনোরথ —কিন্তু এ মাংসখণ্ডও তোমারই হাতে তৈরী ভামা।

ভামা —তাহলে আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি এক শিক মাংস নিয়ে ঐ বড়ো শাল গাছটার কাছে চলে যাও।

মনোরথ —অর্থাৎ বনের কোল ঘেঁষে!

ভামা —হ্যাঁ, তাই।

—তোমার মতলব ভালো নয় ভামা! গরীব মনোরথের ওপর তোমার এতোটুকু দয়ামায়া নেই। তোমার এই দাস এতো মন্দ নয় যে তাকে তুমি ঐ বড়ো শাল গাছটার নীচে পাঠাচ্ছো।

—আজ ওখানে সিংহ, বাঘ বা হাতী আসতে পারে না মনোরথ। জঙ্গলের মধ্যে এই এতোখানি খালি জায়গা, এ সবই বনের পশুরা বসে বসেই সমতল করে তুলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাদের জায়গা আজ আমরা দখল করেছি। ঐ দেখো, কিছু দূর অন্তর কাঠের স্তূপ জমা করা আছে, একটু পরেই ওতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। জ্বলন্ত আগুনের সামনে কোনো জানোয়ার আসতে পারে না।

—কিন্তু যদি শাল-বৃক্ষবাসী নেমে আসে?

—বাঁদর! তাহলে মনোরথ, বাঁদরকেও তুমি ভয় করো! যাক, এ কথাটা জানতাম না।

—বাঁদর নয় ভামা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদররা গাছের ডাল ধরে, তারপর সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত একটু নড়তে-চড়তেও তারা ভয় পায়।

—তাহলে শাল গাছে আবার অন্য কে বাস করে?

—ঐ যে, যার লম্বা লম্বা কালো চুল।

—ভল্লুক। মানুষের শব্দ আর আগুনের গন্ধ যতোদূর পেঁছাবে ততোদূর পর্যন্ত কোনো বন্য জন্তু থাকবে না।

—ভল্লুক নয়, যার হাত দুটো খুব লম্বা লম্বা।

—ও, বনমানুষ। সে-ও আসতে পারে না।

—বনমানুষ কে বলছে! আমি বলছি লাল-হলদে চোখ হয় যাদের, তাদের কথা।

—নেকড়ে? না মনোরু, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো।

—নেকড়েও নয়। নেকড়ে কখনও শাল গাছে চড়তে পারে! আরে বাবা, যারা মানুষের মতো!

—তাই বলো, শবর! তা এখানকার শবররা তো আমাদের বন্ধু। তাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। দেখলে না, কতো মাংস আর কতো মেরয়-ভাণ্ড আমরা ওদের দিয়ে দিলাম: ওরা এখন পানাহার সেরে নাচের জোগাড় করছে। আর তুমি অকর্মা মনোরু, কেবল মিথ্যে বক্‌বক করে সময় নষ্ট করছো।

—ভামা, আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এই জঙ্গলের এক-একটা গাছে সাত-সাতটা করে ভূত আছে। এ কথা জেনেও তুমি যদি তোমার মনোরুকে ঐ শাল গাছের কাছে পাঠাতে চাও, তাহলে আমি যেতে প্রস্তুত।

ভামার ভূত-প্রেতের ভয়টা কিছু বেশীই ছিলো। সুতরাং ভূতের কথা শুনে সে ধরা গলায় বললো—তবে থাক মনোরু, তোমাকে যেতে হবে না। সত্যিই এই বনে ভূত আছে না-কি?

মনোরথ মাংসের বড়ো বড়ো টুক্‌রো মুখে পুরে বললো—তোমার দিব্যি ভামা। শবর-তরুণ বলছিলো। সে তো দু'একজনের নাম পর্যন্ত বললো। কিন্তু তুমি তো জানো আমার স্মরণশক্তি তেমন—

ভামা শুষ্কস্বরে বললো—ভুলে যাওয়া তোমার স্বভাব। কিন্তু এতো বড়ো মহাবনের এক-একটা গাছে সাত-সাতটা ভূত!

মনোরথ—তা আর এমন বেশী কি? মানুষের যতো পুরুষ কাটলো পৃথিবীতে, তার প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা হিসেব করে দেখো না। তাদের সংখ্যা কি গাছের চেয়ে বেশী নয়?

আমি—ঠিক বলেছো ভাই মনোরথ। আমিও শবরের কথাটা খুব মন দিয়েই শুনেছি।

ভামা—তাহলে তো আজ আমরা বড়ো বিপদের মধ্যেই আছি।

মনোরথ—বিপদ বলে বিপদ। যা-তা বিপদ নয় ভামা। শবর-তরুণ বলছিলো, এই জঙ্গলের ভূতের সর্দার কখনো হাতীতে চড়ে, আবার কখনো বাঘ বা সিংহে চড়ে বেরোয়। সে যদি সঙ্গে করে আনে তো আগুনের সামনে কি বলছো, বাঘ সিংহরা আগুনের ওপর দিয়ে চলে আসতে পারে।

ভামা মনোরথের গা ঘেঁষে বসে বললো—কিন্তু আমরা প্রায় তিনশো জন আছি মনোরু।

মনোরথ —সুতরাং চল্লিশ-পঞ্চাশটা গাছের ভূতই এর জন্যে যথেষ্ট। আর মহাবনে কেবল এই ক'টি গাছ আছে বলেই কি তোমার ধারণা ?

ভামা —ঠাট্টা করছো না তো মনোরু ?

মনোরথ —ঠাট্টা করার জন্যে ভামা ছাড়া আমার আর কেউ জুটলো না, তাই না ? আমি শুধু বিপদের কথাটা আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা চাইছিলাম। কি, এখনো এই গরীব মনোরুকে ঐ শাল বৃক্ষের তলায় পাঠাতে চাও না-কি ?

ভামা —না মনোরু। আমি তোমাকে আজ আর এক হাত দূরেও পাঠাবো না। তুমি আমার সঙ্গেই শোবে।

মনোরথ —যেন আমি তোমার কাছ থেকে রোজ আলাদা শুয়ে থাকি ! কি বলছো ভামা ! লোকেই বা বলবে কি ? আর এই বন্ধু বেশধারীদের মধ্যে থেকেই যে শত্রু বেরিয়ে আসবে না, তাই বা কে বলতে পারে !

অজিত —ভাই মনোরথ, আমি সেই দলে আছি। সত্যি সত্যি বলছি, আমি চাই ভামা তোমাকে ঐ শাল গাছটার তলায় পাঠাক আর মহাভূতে তোমার হাড়গোড়শুদ্ধ শেষ করুক। তাহলে শেষ পর্যন্ত থাকবে শুধু ভামা আর তার দেবর অজিত।

ভামা আরক্ত মুখে বললো —মুখ দিয়ে এসব কি উচ্চারণ করছো অজিত ! আমার মনোরুকে আমি এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল করবো না। কিন্তু দেবর সিংহ, তুমিও বলছো, ওখানে ভূত আছে ?

—হ্যাঁ বৌদি ! কিন্তু আমাদের কাছে খড়্গ আছে। ভূত লোহা থাকলে কাছে আসতে পারে না।

—সত্যি ?

—খুব সত্যি। কেন, বৃদ্ধা ধাত্রীর কাছে এ কথা শোনোনি ?

—শুনেছি তো, কিন্তু কথাটা পরীক্ষা করতে সাহস হয় না।

—আচ্ছা বৌদি, তুমি চিন্তা করো না। আমরা সকলে তোমাকে আর মনোরুকে সঙ্গে নিয়ে শোবো। শুধু একটা রাতের ব্যাপার বৈ তো নয়।

—বেশ, এখন খেয়ে নাও দেবর। এই শিকটা কী সুন্দর ঝল্‌সানো হয়েছে দেখো। কোথাও পুড়ে যায়নি, খেতে বেশ মচ্‌মচে হয়েছে। দাঁতালো শূকরটা খুব বড়োই ছিল —ওর মাংসটা খুব যত্ন করেই রেখেছিলাম।

—কিন্তু ঐ দাঁতালো শূকরটার শিকার-কাহিনীটা তো এখনো বললে না ?

—আমার যে কেবল শাল-গাছবাসী দাঁতালো ভূতের কথাই মনে পড়ছে ভাই !

—এখন ও কথা ভুলে যাও। ক্ষেমা এক চুলের জন্যে কেমন করে বেঁচে গেলো, সে কথা বলো।

—দুপুরে যে বড়ো ডোবার ধারে শূকরের পাল আসে, শবর আমাদের সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। সে একটা গাছের ওপর উঠে দূর থেকে দেখিয়ে দিলো। আমিও একটা গাছের ওপর উঠলাম।

—এইরকমভাবে অন্তর্বাসক পরে?

—না, পুরুষদের মতো মালকোচা করে পরেছিলাম।

অজিত —বটে!

ভামা —বটে কি! তুমি চাইছো যে গাছকোমর বেঁধে ওপরে উঠি আর যদি কোথাও কাপড় আটকে যায় তো না ওপরে, না নীচে —একেবারে শূন্যে ঝুলতে থাকি?

আমি —যেতে দাও, তুমি শিকারের কথা বলো বৌদি।

ভামা —শূকরের দলটা বেশ বড়োই ছিলো। বাচ্চা, শূকরী — সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা হবে। পল্বলে [ডোবায়] জল ছিলো। তার তিন দিকে জঙ্গল, শুধু একদিকে খালি জায়গা খানিকটা। আমাদের দলেও প্রায় পঞ্চাশ জন নর-নারী ছিলো। সকলের হাতেই বর্শা, কারো কারো কাছে তীর-ধনুক বা খড়্গও ছিলো। ঠিক করা হলো, চারিদিক থেকে ডোবাটাকে ঘিরে রাখতে হবে। খালি জায়গাটাতেই থাকতে হবে বেশী লোককে —কারণ এইখান দিয়েই শূকরদলের পালাবার আশংকা বেশী।

অজিত —তোমাকে কোথায় থাকতে দিলো বৌদি?

ভামা —আমাকে পেছন দিকে থাকতে বলেছিলো। কিন্তু আমি আর ক্ষেমা নিজেরাই আগ্রহ করে খোলা জায়গার দিকে থাকাটা বেছে নিয়েছিলাম।

আমি —সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায়! শূকর জলে সাঁতার কাটে আর তাড়া খেয়ে অন্যদিকে পালাবার চেষ্টা করে। সে সময়ে তার মন্দগতির জন্যে সহজেই তীরের লক্ষ্যস্থল হতে পারে।

ভামা —কিন্তু যেদিকে শূকরের দল ছিলো, সেইদিকের খোলা জায়গাটাই আমি আর ক্ষেমা পছন্দ করেছিলাম। তখনো চারিদিকটা আমরা ঘিরে ফেলতে পারিনি, এমন সময় দেখলাম শূকরগুলো মুখ ওপর দিকে তুলে কি যেন গন্ধ শুঁকছে। যে দাঁতালো বড়ো শূকরটার চমৎকার মাংস এখন তোমরা খাচ্ছো, সেটাই ছিলো দলের সর্দার আর বেশী চালাক। সে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। শূকরগুলো পালাবার চেষ্টা করার আগেই আমরা চারি-ধার থেকে ঘিরে ফেললাম। ক্ষেমার, আমার আর আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কপিলের হাতেও বর্শা ছিলো। বলতে যতোক্ষণ দেরী

হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে, চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে আমরা প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলাম। দাঁতালো শূকরটা যেই দেখলো যে এতোগুলো লোক তাদের ঘিরে ধরেছে, অমনি একটু থমকে সে তীরবেগে খোলা জায়গাটার দিকে ছুটে আসতে লাগলো আর সারা দলটাই তাকে অনুসরণ করলো। আমরা সকলে চিৎকার করে উঠলাম, তার ফলে কতকগুলো শূকর পেছন দিকে ঘুরলো। কিন্তু দাঁতালো সর্দারটা ক্ষেমা যেদিকে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সোজা সেদিকে ছুটলো। এখন কি করা উচিত, তা ভাববার সময় আমি বা ক্ষেমা কেউই পেলাম না। বরং এ কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে পড়লো। মনে হলো, আমাদের জনপদ-কল্যাণী ক্ষেমাকে শূকরের কবল থেকে বোধ হয় আর রক্ষা করা যাবে না।

ক্ষেমা ভামাকে জড়িয়ে ধরে বললো —সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির কথা আর মনে করো না বোন।

ভামা —দূর বোকা মেয়ে! এখন আর ভয় কিসের? দেখছিস্ না, তোর সেই যমকে খেতে এখন কেমন মিষ্টি লাগছে! এই দুটোতে খানিকটা মেরয় ঢাল্ দেখি। তেষ্টায় সিংহ আর কপিলের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে! তারপর দেবর সিংহ, কি হলো শোনো। মনে হলো, আমি মূর্ছিত হইনি — যেন স্বপ্ন দেখছি। যন্ত্রের মতো সব কিছু ঘটে গেলো। দাঁতালো শূকরটা কাছে এসে পেঁছাবার আগেই কপিল এসে ক্ষেমাকে বুকে তুলে নিয়ে দু'হাত দূরে নিক্ষেপ করলো। তারপর নিজের ভল্ল দিয়ে সজোরে শূকরটার কোমরে আঘাত করলো। কিন্তু সেটা যে-রকম বেগে দৌড়ে আসছিলো তাতে বর্শার নিশানা ঠিক করাই কঠিন; বর্শা প্রহার করে টেনে বার করা তো একেবারেই অসম্ভব। বর্শাটা কপিলের হাত থেকে ঝট্কা লেগে ছিটকে পড়ে গেলো। শূকরটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে কপিল সাত হাত দূরে গিয়ে পড়লো। তখন আমার মনে হলো, বুঝি সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলাম, তখনি উঠে ক্ষেমার বর্শাটা ছিনিয়ে নিলো। মর্মস্থানে আঘাত লাগায় আর ধাক্কার ফলে শূকরটা খানিকটা দুর্বল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো —কপিল তাকে আর ওঠার অবকাশ না দিয়ে ক্ষেমার বর্শাটা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো। ততোক্ষণে আমিও সেখানে পৌঁছে গেছি। শূকরটা গর্জন করছিলো তখনো, কিন্তু তার ওঠার শক্তি ছিলো না। কপিলের সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। এমন সময় দেখলাম —কার দু'খানি গৌরবর্ণ হাত কপিলের পিঠের ওপর —বুকের সঙ্গে বুক আর লাল অধর কপিলের অধরে মিলিত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত দু'জনে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলো —তারপর অশ্রুপূর্ণ চার নেত্রের দৃষ্টি-বিনিময় দেখলাম। তখন কপিলের শরীর প্রকৃতিস্থ —বীররসের সেই সাকার মূর্তি অন্তর্হিত। সে বললো —ক্ষেমা,

এই দয়াভিষেকের জন্যে কোটি কোটি ধন্যবাদ। বলো তো দেবর সিংহ, শিকার কাহিনী কেমন লাগলো?

আমি উঠে কপিলকে জড়িয়ে ধরলাম—দেখলাম, রোহিণীও ক্ষেমাকে কোলে টেনে নিয়ে তাকে চুম্বন করছে। আবার আমি আমার জায়গায় এসে বসলাম। ভামা আর একটা মাংসের শিক এনে সামনে ধরলো। আমি এক টুকরো মাংস মুখে পুরে বললাম—বৌদি, এই শিকটাই খুব ভালো হয়েছে।

ভামা—কিন্তু আমাদের শিকারটা কেমন হয়েছে বললে না তো দেবর!

আমি—আমাদের বলতে কপিল ভাইয়ের তো? খুব চমৎকার হয়েছে। রোজ রোজ যদি এমন শিকার মিলতো আর বৌদিকে যদি সেই মাংস রেঁধে রোজ রোজ খাওয়াবার জন্যে পাওয়া যেতো, তাহলে দেবলোক, পিতৃলোক সব মিথ্যে হয়ে যেতো!

ভামা—তুমি যে তোমার বৌদিকে আকাশে তুলবে, সে কথা আমার অজানা নয়। এবার রোহিণী বোন, তোমাদের শিকারের কাহিনীটা শোনাও!

রোহিণী মুখ ভার করে বললো—আমাকে শিকারের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বোন। মনোরথকে আর আমাকে দূরে একটা গাছের ওপর চড়িয়ে ওরা শিকার করতে গিয়েছিলো।

আমি—কিন্তু তুমি জ্যান্ত গণ্ডারের ওপর বর্শা চালনা করেছিলে রোহিণী!

ভামা খুশী হয়ে বললো—সত্যি! আমার তো সে সুযোগটুকুও মেলেনি। ডোবাটার অন্য পাড়ের লোকেরা তবু দুটো বাচা শূকর মেরেছিলো।

রোহিণী—তার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই বোন। আমিও যখন বর্শা চালাবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন গণ্ডারটার আর ওঠার ক্ষমতা ছিলো না।

আমি—কিন্তু রোহিণীর ভয়-ডর কিছু নেই বৌদি! ও সেই আহত গণ্ডারটার কাছে যাচ্ছিলো।

রোহিণী—আর সেই কালো-কেলটেটা আমার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো।

—গণ্ডার আর শূকরে অনেক তফাৎ রোহিণী! আমি রোহিণীর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম—গণ্ডারকে শক্তি দিয়ে মারা যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন কৌশল। সুতরাং মিথ্যে দুঃখ করো না।

ভামা—ঠিক বলেছো দেবর! আমি তো এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে, কপিল একটি মুহূর্তের মধ্যেই চিন্তা করলো কখন, কখন ক্ষেমাকে সরিয়ে দিলো আর কখনই-বা শূকরটার ওপর বর্শার আঘাত করলো! সময়

এতো অল্প যে কি করা কর্তব্য তা ভাববারই অবকাশ ছিলো না, লক্ষ্য স্হির করে বর্শা ছোঁড়া তো দূরের কথা !

কপিল —না ভামা, অভ্যাস করলে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই চিন্তা করা আর বর্শা চালানো, দুটো কাজই করা যায় ।

ভামা —আমার কাছে কিন্তু অসম্ভবই মনে হয় ।

কপিল —অভ্যাস না থাকলে তাই মনে হবে । তুমি তো ঢাল-তরোয়াল চালাতে জানো । শেখার সময় ঢালটা কি খুব তাড়াতাড়ি বাধা দেবার জন্যে জায়গামতো নড়াচড়া করতে পারতে ? তার কারণ চিন্তা করতে গিয়ে লোকের দেরী হয়ে যায় বা তারা আত্মভোলা হয়ে যায়, অতএব বাঁ হাতকে চালনা করতে পারে না । এখন অভ্যাস করার পর মুহূর্তের মধ্যে বাঁ হাত কেমন নিজের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে চালনা করতে পারো দেখছো তো ! এখন বিনা চিন্তায়, বিনা আদেশেই এ কাজ করতে পারো । অভ্যাসের ফলে এখন আর দেরী হয় না ।

ভামা —সে তো বুঝতেই পারছি । তুমি কোনো যাদু করোনি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করেছো ।

কপিল —এই ত্বরিৎগতি কাজ করার জন্যেই অভ্যাস করতে হয়, শস্ত্রশিক্ষা করতে হয় । শিকার বা যুদ্ধ এই অভ্যাসেরই পরীক্ষা ।

ভামা —যাই বলো, ক্ষেমা কিন্তু একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কপিল ভাই । আমি ভাবছিলাম ঐ ক্লান্ত-কম্পিত দেহকে কি করে সুস্হ করা যায় । কিন্তু ক্ষেমা এক পলকের মধ্যে চিন্তা করে এমন ওষুধ প্রয়োগ করলো যে তোমার সব তাপ দূর হয়ে গেলো ।

কপিল —সেজন্যে ক্ষেমার কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ।

ক্ষেমা —আর আমি কৃতজ্ঞ নই বুঝি ?

ভামা —আমি জানি ক্ষেমা । তুমি তোমার প্রাণরক্ষাকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারো না । তোমার নীরব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনটা কপিলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় ।

ক্ষেমা —কিন্তু তুমি অবিচার করছো বোন । সেটা বাচনিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয় ।

ভামা, ক্ষেমার ভিজে চোখের পাতা দুটিতে চুম্বন করে উত্তর দিলো —ঠিক বলেছিস্ ক্ষেমা ! কপিল তোর জন্যে নিজেকে মৃত্যুর মুখে অর্পণ করেছিলো ।

ক্ষেমা —আমি তো তেমন কিছু করতে পারিনি বোন !

ভামা —আমার মনে হয় ক্ষেমা, নীরবে যতোটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, ভাষায় ততোটা যায় না । এখন এসব কথা থাক । অন্ধকার হয়ে আসছে ।

সকলে মাংস খাওয়া, মেরয় পান ইত্যাদি সেরে গান করতে শুরু করেছে। আমাদেরও তাড়াতাড়ি করা দরকার।

কতকগুলো কাঠের স্তূপ জ্বালানো হয়েছে। আমরা তার ওপর গণ্ডার, শূকর আর মহিষের মাংস ঝলসে নিতে লাগলাম। অজিতের মাংস তৈরী সম্পর্কে মতামতটা আবার আলাদা। তার মতে মাংস এমনভাবে ঝলসাতে হবে, যাতে তার ভেতরের লাল আভাটুকু নষ্ট না হয়ে যায়। কতকগুলো টুকরো সে এমনি করেই ঝলসে নিলো। কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই বেশ মচমচে মাংস বেশী পছন্দ করে।

মাংস ঝলসানো শেষ হলে নিয়মিত বনভোজ আরম্ভ হলো। তিনশো নর-নারী এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেলো। পঙ্‌ক্তির মাঝখানের জ্বলন্ত ধুনীটা আরো উজ্জ্বল করে দেওয়া হয়েছিলো। পরিবেষনকারী নর-নারীরা মাঝ-খানে ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। একবার পরিবেষন করে আসতে আসতেই পরিবেষনকারীও বেশ কিছু খেয়ে নিচ্ছে। কারণ সব পাতাই তার পক্ষে নিজের পাতার মতো। অজিত পরিবেষন করতে করতে ভামার কাছে পেঁছে বললো —বৌদি গণ্ডারের মাংসটা কেমন হয়েছে ? অমনি ভামা ছুরি দিয়ে মাংসের একটা টুকরো কেটে বললো —চমৎকার হয়েছে। তুমি মুখটা এদিকে ফেরাও তো একবার।

অজিত আকর্ণবিস্তৃত একটা প্রকাণ্ড হাঁ করলো, আর ভামা তার মুখে মাংসের টুকরোটা পুরে দিয়ে তার গালটা মৃদুভাবে টিপে দিলো। আবার মেরয়ের জন্যে সে মাঝে মাঝে রোহিণীর কাছে এসে বলছিলো —গান্ধারী বৌদি! তোমার উচ্ছিষ্ট ঠোঙাটা একবার একঢোক পানের জন্যে এদিকে বাড়িয়ে দাও। তারপর পান শেষে মন্তব্য করছিলো —গান্ধারী বৌদির অধর খুব মিষ্টি!

মেরয়ের নেশা যে জমে উঠেছিলো, তা বনভোজনকারীদের প্রাণখোলা গানের সুরেই বোঝা গেলো। সিংহ আর কপিলের ষড়যন্ত্রে ভামাও যোগ দিয়েছিলো। মনোরথকে ঠোঙার পর ঠোঙা কড়া মেরয় দেওয়া হচ্ছে! মনোরথের ওপর তার ক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সে ভামার দিকে ঠোঙা বাড়িয়ে বললো —বৌ-দি, তু-মি-ও!

ভামা —আমি তোমার বৌদি ?

মনোরথ —তা-ছা-ড়া আ-র্ কি ? স-ক্-ল-লে-রী বৌ-দি!

ভামা —আচ্ছা আমার মনোরু দেওরটি! এই নাও, বেশ মিষ্টি মেরয় নয় ?

মনোরথ —দে-ও-ও-র নয় বৌ-দি! ম-ন্-ন্-রু তো-মা-র-ই!

ভামা —আচ্ছা, আমারই মনোরু —এখন একটু গান শোনাও তো!

মনোরথের চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে ঢুলছে। কিন্তু ভামার কণ্ঠস্বর তার কানে যাওয়া মাত্রই সে আবার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে জেগে উঠছে। ঠোঙা পেতে দেরী হলে বলছে —মি-স্-টি ঠো-ঙা বৌ-দি ! মি-স্-টি···

এবার ভামা তাকে হালকা মেরয় দিতে আরম্ভ করেছে।

—মনোরু ! বৌদিকে গান শোনাবে না ?

—বৌ-দি-কে ? শো-ন্-না-বো !

জ্-জ-ল্-লে ন্-নে-ম্-মে-ছি রে প্রা-ণ
এ-ই জ্-জ্-ল্-লে-এ নে-ম্-এ-ছি ও প্রা-ণ
তো-ম্-মা-র্-ই আ-শ্-শে···

মনোরথের গান শুনে সকলেই খুব আনন্দ অনুভব করছিলো, বিশেষ করে অজিত। সে মনোরথকে বললে —ভাই মনোরথ, একটু নাচও দরকার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ —না-চ্ হ-বে বৈ-কি ! কি-ন্-তু বা-জ্-না কই ?

—বাজনা বাজবে বৈকি। কিন্তু কার সঙ্গে নাচবে ?

—স-ব্-বা-র্-ই স-ঙ্গ্-এ ! বৌ-দি ! চ-ল্-লো —চ-ল্-লো না-চ্-বে !

ভামা বলে উঠলো —অজিত, তুমি ভারী শয়তান !

অজিত মনোরথের স্খলিত স্বর অনুকরণ করে বলতে লাগলো —ন্-না বৌ-দি ! আ-মি-ও না-চ্-বো ! আর্ ভা-ই ম-নো-র-থ-ও না-চ্-বে।

মনোরথ —হ্যাঁ হ্যাঁ, দু-ই ভা-ই মি-ল্-লে নাচ্‌বো।

আমরা সকলে সমস্বরে বলে উঠলাম —ঠিক ঠিক। নাচো, দুই ভাই মিলে নাচো।

মনোরথ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো এবং অজিতের হাত চেপে ধরলো। তার হাত এড়াবার জন্যে অজিত একবার নেশার ভান করলো, কিন্তু মনোরথ তা বুঝতেও পারলো না। সে কেবলি 'এসো নাচি দুই ভাই' বলে অজিতের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো !

ভামা বললো —অজিত, আগে খানিকটা নাচো, তারপর তোমাকে বাঁচা-বার ব্যবস্থা করবো।

অজিতকেও উঠতে হলো বাধ্য হয়ে। মনোরথ কিন্তু দু'পা চলতে না চলতে পড়ে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও সে আর উঠতে পারলো না।

এদিকে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে। সাজসজ্জা ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নেশায় যারা বেহুঁশ, তারা ছাড়া অপর সব নর-নারীই যূথ নৃত্য শুরু করে দিলো।

উনিশ

স্বীয় সীমান্তে

ভামার সঙ্গে রোহিণীও লিচ্ছবি-নারীসেনা সংগঠনের কাজ করে চলেছে। আমার উল্কাচলে রওনা হবার আগে পর্যন্ত এক হাজার লিচ্ছবি-তরুণী তাদের নারী-সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। অজিত, মনোরথ প্রভৃতি তরুণরা তাদের শস্ত্রশিক্ষার ভার নিয়েছিলো। কাজেই রোহিণীর আমার সঙ্গে উল্কাচলে যাওয়া হলো না।

সেদিন রাত থাকতে থাকতেই ঘোড়ায় চড়ে আমরা বৈশালী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কপিল আর তার সঙ্গীরা এবং কয়েকজন লিচ্ছবি সৈন্য আমার সঙ্গে চললো। পথে সৈন্যদের ছাউনিগুলি পরিদর্শন করে আমরা দ্বিপ্রহরে উল্কাচলে পৌঁছালাম। রোহণ কাকা আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে আলিঙ্গন করে বললেন —এসো বৎস সিংহ। আমার যোগ্য ভাইপো আমার স্থান পূর্ণ করবে, এ যে আমার কী আনন্দ! সৈন্যদের স্থানবিন্যাস বিষয়ে এখানকার সেনানী এবং আমার উপ-নায়ক, এখন থেকে তোমার দ্বিতীয় উপ-নায়ক অমরু, তোমাকে সব কিছু অবহিত করবে। কিন্তু প্রধান স্থানগুলি আমি একবার নিজেই তোমাকে দেখাতে চাই।

আমি কাকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

আহারাদির পর মাটিতে আমাদের ও শত্রুর দুর্গের চিহ্ন অংকন করে রোহণ কাকা বহু বিষয় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আমাদের কতো সৈন্য কোনখানে অবস্থান করছে তাও জানালেন। বেলা এক প্রহর অবশিষ্ট থাকতে থাকতে দক্ষিণ সেনাবাহিনীর বহু সেনানী-উপসেনানীও এসে পড়লেন। কাকা তাদের সঙ্গে আমার ও কপিলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি আর কপিল একটা ঘরে গিয়ে বসলাম এবং এক-এক জায়গার সেনানী ও উপ-সেনানীকে আহ্বান করে তাদের সেনাবল প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তালপত্রে কিছু কিছু লিখে নিতেও হলো। আমার কাজ শেষ হবার আগেই সন্ধ্যা নেমে এলো।

চাঁদনী রাত। কাকা কতকগুলো দুর্গ পরিদর্শনের পরামর্শ দিলেন। তক্ষশীলার সঙ্গীদের সেইখানেই রেখে আমি কপিলকে নিয়ে কাকার সঙ্গে নৌকায় উঠলাম। আমাদের সামনে গঙ্গার অপর পারে পাটলিগ্রামে মগধের

এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ছাউনি করেছে। আমরা গঙ্গার ওপর দিয়ে দীর্ঘ-ওয়াহ [দিঘওয়ারা]-তে গঙ্গা-মহী সঙ্গমের দিকে চললাম। ওপারে কোথাও কোথাও আগুন জ্বলতে দেখা গেলো। কখনো কখনো কোনো ব্যবসায়ীর নৌকায় কাপড়ের আবরণ ভেদ করে দীপালোক প্রকাশিত হতে দেখলাম। এপারে আমাদের দুর্গগুলিতে যেমন কোনো সাড়াশব্দ বা আলোকের চিহ্নমাত্র দেখা গেলো না, ওপারের মগধের দুর্গগুলিতেও ঠিক তেমনি একই অবস্থা।

দীর্ঘওয়াহ পর্যন্ত আমাদের কাঠের প্রাকার-সমন্বিত পাঁচটি দুর্গ ছিলো। সেখানে আমরা পেঁছাতেই প্রহরী সতর্কতামূলক ধ্বনি করলো। কাকা তখনি সাঙ্কেতিক শব্দ করলেন আর প্রহরী তার নায়ককে সে সংবাদ জ্ঞাপন করলো। তারপর আমরা নৌকা থেকে নেমে প্রহরীর সঙ্গে দুর্গ দেখতে গেলাম। জ্যোৎস্নালোক থাকায় পথ চলার কতোকটা সুবিধা হয়েছিলো। নতুবা পথের এখানে-ওখানে এতো গর্ত ছিলো যে, দশ হাতও নিরাপদে চলা অজানা লোকের পক্ষে খুবই শক্ত। রণতরীগুলিকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যে, ওপার থেকে দূরের কথা, এপার থেকেও দেখা যায় না। প্রকাণ্ড একটা পুষ্করিণী খনন করে আঁকাবাঁকা খাল কেটে তাকে গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রণতরীগুলি সেই পুষ্করিণীতে লুক্কায়িত আছে। ঐ আঁকাবাঁকা খালপথ ধরে লোকের চোখের আড়ালে কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলি গঙ্গায় এসে পড়তে পারে। অবশ্য এসবই যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কাজ। তবু এ সময়ে এ ব্যবস্থা আমাদের করতেই হয়েছে।

আমরা যদিও আগে থাকতে কোনো খবর না দিয়ে পরিদর্শনে এসেছিলাম, তবুও দেখলাম সব জায়গাতেই প্রহরী সজাগ আছে। কোথাও কোনোরকমের অব্যবস্থার চিহ্ন দেখলাম না।

রাত তখন এক প্রহর বাকী। আমরা আমাদের দীর্ঘওয়াহের দুর্গে গিয়ে পেঁছালাম। কাকা প্রত্যেকটি দুর্গে জাগ্রত সৈনিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে, এখন থেকে আয়ুষ্মান্ সিংহই তোমাদের সেনানায়ক। আমিও কারো পিঠ চাপড়ে, কারো সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে, আবার কারো আসনে বসে তাদের বুঝিয়ে দিতে চাইলাম যে, তাদের তরুণ সেনানায়ক শুধু নায়কই নয়, তাদের বন্ধুও বটে!

যখন আমরা উল্কাচলে ফিরে এলাম, তখন রাত্রির শেষ প্রহর।

কাকার প্রশংসা করে কপিল বললো —সেনানায়ক! আমরা তরুণ, এ রকম জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু এই বয়সে আপনি যে এখনো এতোটা পরিশ্রম করতে পারেন, এইটাই আশ্চর্য!

না উপ-নায়ক! স্বাস্থ্য আর অভ্যাস বজায় রাখলে মানুষ বার্ধক্যেও শরীরকে কার্যক্ষম রাখতে পারে।

দালানে পেঁছে কাকীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি বললেন—চলো বৎস সিংহ! কিছু খেয়ে নাও।

—তুমি সারা রাত জেগে বসে আছো কাকী!

—না বাবা, আমি কালীর ছেলেকে বলে দিয়েছিলাম, তোমরা এলেই যেন খবর পাই। তার কাছে খবর পেয়েই উঠেছি।

আমি —কিন্তু আমি তো পথে যথেষ্ট খেয়েছি কাকী! এক জায়গায় তো আগুনে ঝলসানো বড়ো বড়ো মাছও ছিলো।

কাকী —যারা গঙ্গার তীরে বাস করে, মাছ তো তাদের কাছে এমন কিছু দুর্লভ বস্তু নয় বৎস! যাই হোক, অন্তত একটু গরম দুধ খাও। আগুনে বসিয়ে গরম রেখেছি।

এতো রাত্রে কাকীর উঠে আসার কথাটা স্মরণ করে সকলে এক-এক পাত্র দুধ পান করতে বাধ্য হলাম। আর দুধ তো লিচ্ছবিদেব কাছে জলেরই মতো।

পরদিন আমরা, কাকা রোহণ এবং তাঁর চার জন নায়ক মিলে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করছিলাম। তাতে জানা গেলো, মগধরাজ বিম্বিসার কবে যুদ্ধ শুরু করবেন তা এখনো স্থির করতে পারেননি।

সেই রাত্রেই আমরা গঙ্গার নিম্নভূমির দুর্গগুলি দেখতে চললাম। বগ্‌গুমুদা [বাগমতী] এবং গঙ্গার সঙ্গম বহু দূরে। তাই এক রাত্রে সেখানে পেঁছানো সম্ভব নয়। রাত্রে আমরা নৌকায় চড়ে যাত্রা করতাম, দিনে নিতাম বিশ্রাম। এমনি করে তৃতীয় দিনে আমরা বগ্‌গুমুদার সঙ্গম-স্থলে পেঁছে গেলাম।

সব কিছু দেখার পর লিচ্ছবি সৈন্য এবং সেনানীদের সতর্কতা ও সুব্যবস্থায় আমি আর কপিল দুজনেই সন্তুষ্ট হলাম।

তক্ষশীলার কতকগুলো নতুন রণচাতুর্য, বিশেষ করে নদী-যুদ্ধের কিছু কিছু নতুন কৌশল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অতএব সেনানীদের উল্কাচেলে আহ্বান করাই আমরা উচিত বলে মনে করলাম। কিন্তু তার আগে একবার মহীর দুর্গটাও দেখা দরকার।

সেনানায়ক রোহণ এখন বৈশালী যাত্রা করবেন। আমি যখন তাঁকে ভামা আর রোহিণীকে উৎসাহদান করতে বললাম, তখন তিনি বললেন —কোনো কাজ আনমনে করার চেয়ে না করাই ভালো। আমি লিচ্ছবি-নারীসেনাদের শুধু উৎসাহই দেবো না, তাদের সবরকম সহায়তা করবো। বৈশালীতে গিয়ে এমন জায়গায় থাকবো, যাতে ভামা ও রোহিণীকে সাহায্য করতে পারি। বৈদ্য অগ্নিবেশকেও চিকিৎসা বিভাগে যোগ দেবার জন্য পাঠাবো। আমার মনে হয় আমরা একাজে নিঃসন্দেহে সফল হবো।

কাকী যাবার সময় বললেন—বৎস! রোহিণী না থাকার জন্যে অসুবিধা হবে না তো? বলো তো ভামাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

—কাকী, সৈনিককে জীবনে নানারকম কষ্ট সহ্য করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। এতো সৈন্য আর সেনানী যেখানে উপস্থিত, সেখানে কী আর এমন কষ্ট হবে! তবে কালীর ছেলে শুককে তুমি রেখে যাও। ছেলেটা বেশ চালাক-চতুর। সে আমার ঘোড়াটা দেখাশোনা আর অন্যান্য কাজকর্ম করবে।

কাকী শুককে রেখে গেলেন।

এখন এতো বড়ো বাড়ীতে আমি, কপিল আর শুক, তিন জন।

পরদিন আমরা নৌকায় করে মহীর দিকে যাত্রা করলাম। মহীর পূর্ব তটে সবুজ তৃণ-সমাচ্ছন্ন মাঠ—সেখানে গো-পালকদের সহস্র সহস্র গাভী চরছে। একদিন আমরা এক গোষ্ঠে [গোচারণ ভূমিতে] গেলাম। মনুষ্যবাসের জন্যে ছোট ছোট কুটীর—সেখানে দুধ জমানো, মাখন তৈরীর ব্যবস্থা রয়েছে। এই গো-পালকদের মধ্যে লিচ্ছবি এবং অ-লিচ্ছবি—দু'রকমের লোকই আছে। তারা সকলেই বজ্জীর সঙ্গে যুদ্ধেচ্ছু মগধরাজকে নিন্দা করতে লাগলো।

মহীতটের দুর্গ দেখাশোনা করতে চার দিন কেটে গেলো। শান্তনু আর তার আট জন সঙ্গীকে আমি এই দুর্গে নিযুক্ত করলাম। তারা নাবিকদের বিশেষ শিক্ষার ভার গ্রহণ করলো। কপিলের সঙ্গে আমি উল্কা-চলে ফিরে এলাম। সৈন্যদের নূতন কৌশলাদি শিক্ষা দেবার জন্যে সে এখান থেকে বৈশালীতে চলে গেলো। আর আমি আমার সেনানীদের নদী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষাদানের জন্যে নিজের কাছে আহ্বান করলাম। এমনি করে আট দিন কাটলো।

শিক্ষা সমাপ্তির দিন সেনাপতি সুমনও এসে পেঁছালেন। আমার দুর্গ নিরীক্ষণ এবং যুদ্ধের নূতন কৌশলের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। পূর্ব সীমান্তের সৈন্যদেরও তিনি এইসব কৌশল শিক্ষা দেবার কথা বললেন। তাই শান্তনুকে সেখানে পাঠাবো বলে স্থির করলাম। সেনাপতির কাছে এ খবরও শুনলাম যে, লিচ্ছবি-নারীসেনাবাহিনীর শিক্ষা-দানের কাজ পুরোদমেই চলছে। এ কাজে সেনানায়ক রোহণ যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। বৈদ্য অগ্নিবেশ এবং তার পঞ্চাশ জনেরও বেশী শিষ্য আমাদের সৈনিক-চিকিৎসা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা ক্ষতস্থানে বন্ধন, ঔষধাদি প্রদান—এইসব বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। সেনাপতির কথায় বুঝতে পারলাম—তিনি গণ-এর যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কার্যকলাপে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

আমি আমাদের চরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। গঙ্গাতটে শত্রুপক্ষের

আর কি কি প্রস্তুতি চলছে, সে সম্পর্কে সব খবর পাওয়া দরকার। পাঁচটি পর্বতের মধ্যে অবস্থিত মগধ-রাজধানী রাজগৃহ এবং তার পথগুলি রক্ষার কি ব্যবস্থা ওরা করেছে, তাও আমাদের জানা চাই। সুতরাং আমি আমাদের কয়েকজন সেনানী আর চতুর ব্যক্তিকে পরিব্রাজক, নিগ্রন্থ [জৈন সাধু], আজীবক, ভিক্ষু প্রভৃতি সাধুর বেশে এবং কয়েক জনকে ব্যবসায়ী আর জ্যোতিষীর বেশে প্রেরণ করেছিলাম। তাদের কাছ থেকে খবর পেলাম, বিম্বিসার রাজধানীর দুর্গ মেরামত করাচ্ছেন। গঙ্গাতট থেকে রাজধানী পর্যন্ত কয়েক স্থানে সৈন্যসমাবেশও করেছেন—বিশেষ করে নালন্দা, অম্বলষ্টিকার [সিলাও] দুযোজন ভূমিখণ্ডে তাঁর প্রস্তুতি সবচেয়ে বেশী। আর তার অর্থ হলো—লিচ্ছবিরা এবার রাজগৃহ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন না করে, বিম্বিসার এই ভয়ই করছেন।

মগধের সেনাবাহিনীর ভেতরের খবর যা পাওয়া গেলো তাতে বুঝলাম—ওদের সেনাপতি আর সেনানায়ক একে অপরকেঅযোগ্য বলেই মনে করে। আর তাদের এই ঘরোয়া ঝগড়া নিবারণ করতে মহামাত্য বর্ষকারকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়। রাজা বিম্বিসার যে নিজের ছেলের কথায় ওঠেন-বসেন, এ কথা বলা যায় না। তবে বজ্জীকে আক্রমণের ব্যাপারে তিনি কুমারের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন—আমি আর কতোদিনই বা বাঁচবো। এর পরে কুমার অজাতশত্রুকেই তো রাজ্য রক্ষা করতে হবে। এতো কিছু আয়োজন সত্ত্বেও বিম্বিসার যুদ্ধজয় সম্পর্কে আশাবাদী নন। অজাতশত্রু চতুর তরুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বড়ো অভিমানী আর জেদী। সে যুদ্ধ, রাজনীতি—সব কিছুতেই নিজেকে সর্বজ্ঞ বলে মনে করে। রাজনীতিতে সে বর্ষকারের যোগ্য শিষ্য। নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ বর্ষকার তাঁর শিষ্যের ওপর যথেষ্ট আশা রাখেন এবং স্পষ্টই বলে থাকেন, এখন মগধের রাজ্য আর শক্তি-বৃদ্ধির জন্যে অস্ত্র-শস্ত্রের চেয়ে কূটনীতির ওপর বেশী নির্ভর করা কর্তব্য। আগেকার দিনে তরবারির জোরেই মগধ অবশ্য সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু বর্ষকার লিচ্ছবিদের শক্তির সঙ্গে পরিচিত। তাই তিনি বলেছিলেন, আগে কোশলকে মগধ রাজ্যের সঙ্গে মিলিত করা হোক। তিনি এ কাজটা সহজ বলেই মনে করেছিলেন। কারণ কাশীবাসীরা এখনো তাদের স্বাধীনতা অপহারক কোশলবাসীদের ঘৃণা করে। সেই ঘৃণা দূর করার জন্যে প্রসেনজিৎ যদিও নিজের সহোদর ভাইকে কাশীরাজ করে বারাণসীতে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে, তবু কাশীবাসীরা এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই উপহাস বলে মনে করে। বর্ষকারের অভিমত হলো, তাঁরা যদি কোশল রাজ্যের কাশী প্রদেশে হামলা করেন, তাহলে সেখানে সাফল্য লাভের ফলে প্রসেনজিৎ সেখানের জনবল তো পাবেই না, উপরন্তু কাশীর অধিবাসীরাও মগধের সাহায্য করবে

আর কাশী জনপদের সম্পত্তিও তাঁদের হাতে এসে যাবে। এইভাবে অঙ্গ, মগধ, কাশীর ধন, জন, বলের সাহায্যে কোশল জনপদকে স্ববশে আনা খুব সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু রাজা বিম্বিসার এ কথা কোনোরকমেই মানতে রাজী নন। তিনি নিজের শ্যালক প্রসেনজিতের প্রতি যথেষ্ট স্নেহপরায়ণ। লিচ্ছবিদের সঙ্গে লড়াই করতে তিনি যে মত দিয়েছেন, তার একটা প্রধান কারণ এই যে, শেষ পর্যন্ত প্রসেনজিতের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ না করতে হয়।

আমাদের নতুন চরেরা যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছিলো। তাদের মধ্যে নন্দক নামে একজন চর নিগ্রন্থ [জৈন] ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলো। সে একদিন নিজের গুরু বর্ধমান মহাবীরের খুবই প্রশংসা করছিলো। আমি এর আগেও দু'চারবার নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু সে সময় তাতে কোনোই গুরুত্ব দিইনি। এবার যখন প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে নন্দক বললো যে বর্তমানে তিনি উল্কাচলের বাইরে এক বাগানে বিহার করছেন, তখন তাঁকে দর্শনের প্রবল ইচ্ছা হলো।

নিজের বিরাট এক শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র যেখানে অবস্থান করছেন, সন্ধ্যাবেলা নন্দককে সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানে গেলাম। আমি তীর্থঙ্করকে দর্শন করতে এসেছি শুনে একজন নিগ্রন্থ আমাকে নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র যে বৃক্ষতলে বসেছিলেন, সেখান পর্যন্ত পেঁছে দিলেন। একটি গাছের তলায় মাথা নীচু করে ভূমিতে বসেছিলেন চিন্তামগ্ন জ্ঞাতৃপুত্র। তাঁর ছোট ছোট শমশ্রু সাদা হয়ে গেছে, দেহেও বার্ধক্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। তবুও তাঁর দেহ দেখে মন আকৃষ্ট হয়। আমার পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে 'এসো, বসো জ্ঞাতৃপুত্র সিংহ!' বলে সম্ভাষণ জানালেন! তখনই বুঝতে পারলাম—তিনি সত্যিই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। নাহলে কিছু বলার আগেই কেমন করে আমার নাম, বংশ প্রভৃতি অবগত হলেন? আমি তাঁকে প্রণাম করে একপাশে বসে বললাম—ভগবন্! আপনি আমাকে চেনেন?

মহাবীর—চিনি! সিংহ, তুমি আমাদের জ্ঞাতৃকুলের যোদ্ধা। তোমার বাবা অর্জুনের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিলো। অবশ্য বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট ছিলো। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী অতি ধীর, অথচ মাধুর্যে ভরা। নানারকম কথা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আমার যে বিরূপ ধারণা জন্মেছিলো, দেখলাম তা ক্রমেই দূর হয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার সঙ্গে খুব অল্প কয়েকটি কথাই বললেন, তাও মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেমে। কিন্তু যখন তাঁর মুখের বাণী নীরব থাকে, তখন তাঁর বিশাল পিঙ্গল চোখ দুটি থেকে করুণাধারা বর্ষিত হতে থাকে। তখনই আমার স্মরণ হলো যে, নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র করুণাধর্মের প্রচারক। সত্যিই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষ

করে তাঁর দেহ থেকে করুণার দীপ্তি ঝরে পড়ছে। আমি ভাবছিলাম —এই মহাপুরুষ যা কিছু বলেন, সবই তাঁর অন্তর থেকে বিনির্গত বাণী।

তিনি বললেন —সিংহ, ঐ গাছের তলায় চলো। তারপর একহাতে পাশে রক্ষিত ময়ূরপুচ্ছ এবং অপর হাতে ছোট বস্ত্রখণ্ড ঝুলিয়ে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে তিনি কোমল ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে ঝেড়ে ভূমি কীটাদিশূন্য করে আমাকে বসতে আজ্ঞা দিলেন, নিজেও বসলেন।

আমি জীবনের পক্ষপাতী। পাষাণময় কূলের মধ্যে দিয়ে সবেগে প্রবাহিত মহাসিন্ধুর ধারার মতো কল্লোল আর কলরবের সঙ্গেই জীবন অগ্রসর হয়ে চলে। তাতে আছে আনন্দ, আছে মান-অভিমান আর আবেগ। কিন্তু এখানে যে জীবন দেখছি —তা গতিশূন্য, প্রশান্ত, অনন্তকালব্যাপী। এই দুই জীবনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তা নির্ণয় করা তখন আমার সাধ্যাতীত ছিলো। তবুও কিছুটা সন্দেহ আমার মনে জন্মেছিলো বৈকি! কিছুক্ষণ তাঁকে নীরবে অবলোকন করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম —আপনি মন-শুদ্ধির শিক্ষা দেন, তবে শরীর-শুদ্ধির বিরোধিতা করেন কেন?

—তুমি আমার দেহের ময়লা দেখে বলছো?

—হ্যাঁ, আপনার এই লিচ্ছবি-শরীরে ময়লার এই পুরু স্তর দেখে।

—শরীর মলময় সিংহ। যতোই পরিষ্কার করো না কেন, তাতে ভেতরে আর বাইরে মল জমবেই। তবে আমি এ কথা বলি না যে, দেহ পরিষ্কার করো না। আমি শুধু এই কথাই বলি —যেখানে ধৌত করা একজনের পক্ষে শখ আর জীবনকে ভালোবাসে এমন হাজার হাজার প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়, সেখানে মনে রাখতে হবে, আমরা নিজেদের শখের জন্যে অপরের মৃত্যুর যেন কারণ না হই।

—হিংসা থেকে নিজেকে কি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখা যায়?

—সাধ্যমতো চেষ্টার দ্বারা যতো দূর পর্যন্ত হিংসা থেকে মুক্ত থাকা যায়, তাই পূর্ণ অহিংসা।

সেই সময় আমার সৈনিক-বৃত্তির কথা স্মরণ হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম —আপনি হিংসা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তোমার সৈনিক-বৃত্তি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছো বোধ হয়?

—ঠিকই বলেছেন ভগবন্।

—কোনো কিছুতেই চূড়ান্তরূপে বিশ্বাস স্থাপন করতে নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র বলেন না। কারণ কোনো কিছুই চূড়ান্তরূপে নয়, মিশ্রিতরূপে পাওয়া যায়। তাই অহিংসাকেও চূড়ান্ত শুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না এবং ব্যাখ্যাও

করা যায় না। অতএব সব নিগ্রন্থ [জৈন] সম্পূর্ণ অহিংস হবেন, এ আশা আমি করি না। কিন্তু প্রাণিজগতের প্রতি করুণা প্রকাশের দিকেই মানুষের সমস্ত চেষ্টা সাধ্যমতো নিয়োগ করতে হবে। তুমি তোমার সৈনিকের কর্তব্য পালন করেও এ-রকম চেষ্টা করতে পারো সিংহ। মাংস ভক্ষণ করা, মৃগয়া করা তোমার সৈনিক-বৃত্তির অবশ্য পালনীয় অঙ্গ নয়। ইচ্ছা করলে তুমি তো এগুলো ত্যাগ করতে পারো। নিগ্রন্থ সাধুদের জীবনচর্যার কথা বাদ দাও। আমি স্বীকার করছি যে তা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু গৃহস্থও তো নিজের আশপাশে জীবে-দয়ারূপ অনেকখানি শ্যামল মেঘসঞ্চার করতে পারে। যেমন করে এই [আমি] জ্ঞাতৃপুত্র পঁচিশ বছর ধরে করে আসছে, জ্ঞাতৃপুত্র সিংহও তেমনিভাবেই পারে।

এই পর্যন্ত বলেই নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নীরব হলেন। আমার চোখ দুটি তাঁর শান্ত মূর্তির দিকে নিবদ্ধ—কিন্তু আমার অন্তরে অশান্ত সমুদ্র তরঙ্গিত হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, আমার মর্মস্থল কে যেন তীরবিদ্ধ করেছে। আমার বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না যে, করুণা প্রসারের জন্যে আমার যতোটুকু করা সম্ভব ছিলো, ততোটুকু চেষ্টা আমি কখনও করিনি। বরং একদিক থেকে দেখতে গেলে করুণাকে আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি। তাছাড়া শ্রমণ মহাবীর আমাকে নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হতে বলেননি। বস্তুত তিনি আমার অন্তরের ভাবধারার সম্পূর্ণ সন্ধান রাখেন। এই সামান্য কয়েকটি কথায় আমার জীবনের পথ তিনি আলোকিত করে তুলেছেন।

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সামনে বসে চিন্তা করে শেষে এই সিদ্ধান্তে পেঁছালাম যে, মনুষ্য-জীবনে যা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, শ্রমণ মহাবীর শুধু সেইটুকুই করতে বলেছেন। অবশ্য এ কথা বলতে পারি না যে আমার হৃদয়ের সব শংকা দূর হয়ে গিয়েছিলো, তবে তার অভাবটাও বেশ অনুভব করছিলাম। অতঃপর করুণা সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, তাকে নিজের বাস্তব জীবনে কার্যকরী করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু তাতে বাধা যে কতো তাও বুঝতে পারলাম। সব দিক চিন্তা করে আরো বুঝলাম, অহিংসা ও করুণাধর্ম পালন করতে আমি শুধু তখনি সক্ষম হবো, যখন প্রতি পদে আমি কোনো-না-কোনো কারণে আমার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করতে পারবো। যদি আমি নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের গৃহী শিষ্য বলে নিজেকে ঘোষণা করি, তবে আমাকে আর লোকে মাংসাহার করতে বা মৃগয়ায় যেতে অনুরোধ করবে না।

শেষে আমি বললাম—ভগবন্! আমি আপনার উপদেশে সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ থেকে আমি আপনার গৃহী শিষ্য হলাম।

শ্রমণ মহাবীর আমাকে সাধুবাদ দিলেন। নন্দকও খুবই খুশী হলো। আমরা দু'জনে সেখান থেকে চলে এলাম।

কপিল চলে যাবার পর বাড়ীতে শুধু আমরা দু'জন—আমি আর শুক। আমি শুককে সেইদিনই বলে দিলাম—সে যেন নিজের হাতে আমার খাদ্য তৈরী করে আর তাতে মাছ-মাংস কিছু না থাকে। চলার সময় উঁচু-নীচু দেখে চলা ছাড়া এতোদিন আর কোনো দিকেই নজর দিতাম না। কিন্তু এখন কেবলই পা ফেলার জায়গায় আমার চোখ পড়তে লাগলো এবং পিঁপড়ে, কীট ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে পথ চলতে লাগলাম। স্নানাদি ছাড়লাম না বটে, তবে তাতে খুব অল্প জল ব্যবহার করতে লাগলাম। এ সময় রোহিণী নেই বলে খুশীই হলাম। সে থাকলে হঠাৎ এই নিগ্রন্থ-ব্রত পালন করা খুবই মুশকিল হতো। আমি শুককে কড়া আদেশ দিয়েছিলাম, সে যেন আমার ব্রতের কথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করে।

আমি শ্রমণ মহাবীরের কাছে আবার যেতাম, কিন্তু পরদিনই তিনি উল্কা-চলে চলে গেলেন। অন্য নিগ্রন্থরা আমার কাছে আসতেন বটে, তবে তাঁরা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি। আমি শুককে বলে দিয়েছিলাম, কোনো নিগ্রন্থ [জৈন সাধু] গৃহে এলে যেন তাঁর আহারাদির সুব্যবস্থা করা হয়।

কুড়ি

মগধের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বিজয়

শীত শেষ হয়েছে। বসন্তও এসে চলে গেলো, এখন গ্রীষ্মকাল। আমাদের তিন মাস অবকাশ দিয়ে বিম্বিসার নিজের পক্ষে ভালো কাজ করেননি। কপিল তার নৌবাহিনীর অর্ধেককে একপ্রকার লৌহ-কবচে সুসজ্জিত করেছে, উপরন্তু আঘাত করার জন্যে তীক্ষ্ন শৃঙ্গ সংযোজন করেছে। তাছাড়া সে নিজে এবং তার সঙ্গীরা নৌসৈন্যদের শিক্ষায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলো।

গুপ্তচররা যে খবর পাঠিয়েছে তাতে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম—মগধের যুদ্ধ-প্রস্তুতি অল্পকালের মধ্যেই শেষ হবে। তারপরই ওরা আক্রমণ করতে ইচ্ছুক। আমাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছে, আর এ বিষয়ে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করেছি যে আক্রমণ চালাবো আমরাই। এখন দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরম পড়ে। কিন্তু এজন্যে যুদ্ধ বন্ধ করা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।

একদিন সেনাপতির লোক এসে আমাকে অবিলম্বে বৈশালীতে যেতে বললো। আমার উপ-নায়ক অমরু আর তিন মাস আগের অমরু নয়। সে তক্ষশীলার যুদ্ধবিদ্যা থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছে। তখন সময়টাই এমন যে প্রতিদিন নয়, প্রতিমুহূর্তে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা দরকার। অমরুর ওপর এখন এজন্যে পুরো আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।

আমি মাত্র দুটি রাত আর একটি দিন বৈশালীতে ছিলাম। তার অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে যুদ্ধ-পরিষদ আর অমাত্য-পরিষদের সঙ্গে মন্ত্রণায়। যুদ্ধ-পরিষদ আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু অমাত্য-পরিষদের কিছু কিছু সদস্যের অভিমত ছিলো—আক্রমণটা আমাদের পক্ষ থেকে হওয়া উচিত নয় এবং গ্রীষ্মকালটা কোনোরকমে পার করে দেওয়া দরকার। কাজেই আমি আর সেনাপতি সমগ্র পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম, আর সেই সঙ্গে এ কথাও বললাম যে বিম্বিসারের সমগ্র আশা-ভরসা গজারোহী বাহিনীর ওপরই এবার নির্ভর করছে। যদি হাতীগুলোকে ওরা কোনোরকমে গঙ্গার এপারে আনতে পারে, তাহলে আমাদের বিপদ আরো বেড়ে যাবে। কারণ আমাদের হাতীর সংখ্যা বেশী নয়। অবশেষে গণ শীঘ্রই যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং দিন-ক্ষণ স্থির করার ভার পড়লো সেনাপতি আর আমার ওপর।

আমার বাড়ীটাকে রোহিণী সেনা-নিবাসে পরিণত করেছে। ভামা আর রোহিণীর সাফল্য সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তারা বজ্জীতে ত্রিশ হাজার আর বৈশালীতে কুড়ি হাজার স্ত্রী-সেনা সংগঠিত করেছে। অবশ্য এখনো তাদের এক-তৃতীয়াংশের অধিককে অস্ত্র-শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তারা অপরাপর শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, তারা নিজেদের লিচ্ছবি-সেনাবাহিনীর অঙ্গ বলেই মনে করে। বৃদ্ধ অগ্নিবেশের বয়স যেন কুড়ি বছর কমে গেছে। তিনি এখন আর সেই বৈদ্য নেই—যিনি অপরের কায়কল্প করেন, আর নিজে পাকা আমটির মতো হন দিন দিন।

আমি যখন তাঁর চিকিৎসা বিভাগ দেখতে গেলাম, তখন তিনি বললেন—সেনানায়ক! যখন আমি কোমলাঙ্গী নারীদের এইরকম কঠিন শ্রম করতে দেখলাম, তখন তো আমার বেশ লজ্জাই হতে লাগলো। আমিও ঘোড়ায় চড়ে আট-দশ যোজন দূর থেকে ঔষধ এনে সঞ্চয় করতে লাগলাম। শিষ্য এবং স্ত্রীলোকদের ভিন্ন ভিন্ন শস্ত্রাঘাতে উদ্ভূত বিভিন্ন রকমের বিষাক্ত ক্ষত চেনানো এবং তার চিকিৎসা, রক্তপাত বন্ধ করা, ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্যে দিবারাত্র কাজ করতে লাগলাম। মাসখানেকের মধ্যেই আমার ক্ষিদে বাড়লো, শরীরের শিথিলতাও কমে আসতে লাগলো। এখন এই সাদা চুল দেখে যে যাই বলুক, আমি তো নিজেকে বুড়ো বলে বুঝতেই পারি না, আর ব্রাহ্মণীও আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

বৈদ্য এ কথাও বললেন যে, যেদিনই যুদ্ধ আরম্ভ হবে, সেইদিনই কিছু সাহায্যকারী সঙ্গে নিয়ে তিনি উল্কাচলে পৌঁছাবেন। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের চিকিৎসা যতো শীঘ্র শুরু করা যায়, ততো শীঘ্র তা নিরাময় হয়ে যায়। আমি তাঁকে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে এখনি কিছু লোককে রওনা করে দিতে বললাম। অবশিষ্টদের সম্বন্ধে আমি এক রাত আগে খবর পাঠাবো।

ভামা আর রোহিণীকে যখন আমি তাদের সাফল্যের জন্যে প্রশংসা করছিলাম, তখন ভামা বলে উঠলো—কিন্তু দেবর, আমি তোমার প্রশংসা করতে পারছি না।

—কেন বৌদি, সিংহ কি অপরাধ করলো?

—মস্ত বড়ো অপরাধ। তুমি নিগ্রন্থের চেলা হয়েছো।

—ভগবান মহাবীর নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের ধর্মে আমার শ্রদ্ধা আছে, এই তো বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, তাই।

—আমি তাঁকে নিজে দর্শন করেছি, তাঁর মুখনিঃসৃত উপদেশ শুনেছি আর তা আমার কাছে ঠিক বলেই মনে হয়েছে।

—তাহলে সেনানায়কের কর্তব্য তুমি পালন করবে কেমন করে ?

—তিনি আমাকে কর্তব্য পালন করতে বারণ করেননি।

—যাক্, তবু ভালো !

—যদি তাই হতো, তাহলে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মাতো না। কারণ গণ-এর জন্যে যুদ্ধ করা আমি সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য বলে মনে করি।

রোহিণী—কিন্তু আর্যপুত্র, তুমি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছো !

আমি —কারণ আমি আমার হৃদয়ে করুণা বিস্তার করতে চাই। দুধ, মাখন, গুড় প্রভৃতি কতো সুস্বাদু জিনিসই তো আছে, যা খেয়ে আমি জীবিত আর বলিষ্ঠ থাকতে পারি।

ভামা —তাহলে তুমি রোহিণীকেও নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের শিষ্যা তৈরী করতে চাইছো ? যদি এমন চেষ্টা করো, তাহলে তোমাকে আমার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

আমি —বৌদি, বিম্বিসার ছাড়া আমি আর কারো সঙ্গে এখন লড়াই করতে চাই না।

ভামা —এখন আমাদেরও এইদিকেই সব ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধের পর দেখা যাবে কতোদিন তুমি নিগ্রন্থের ফেরে পড়ে থাকতে পারো।

অতঃপর আমি মা, কাকী আর সোমার সঙ্গে দেখা করলাম। মা আর কাকী স্বয়ং অগ্নিবেশের শিক্ষাধীন ছিলেন। তাঁরা অগ্নিবেশের সঙ্গে উল্কাচলে যাবেন বলে জানালেন।

আমি যখন উল্কাচলে ফিরে এলাম, তখন মগধ থেকে আরো ভয়াবহ সংবাদ এসে পৌঁছাতে লাগলো। শুনলাম, রাজগৃহ থেকে গঙ্গাতটের পথগুলি সৈন্যে ভরে গেছে। হাতীগুলোকেও দ্রুত জমায়েত করা হচ্ছে। আর আমাদের পক্ষে দেরী করা সঙ্গত নয়।

পরদিন পাটলিগ্রামের ঘাটে বজ্জীর এক প্রজার সঙ্গে মগধের একজন সৈন্যের ঝগড়া হওয়ায় সৈনিকটি বজ্জীর প্রজাটিকে ধাক্কা দিয়ে অথৈ জলে ফেলে দেয়। প্রজাটি জলে ডুবে মারা যায়। এই খবর পাওয়ামাত্র, সে সময় উল্কাচলে অবস্থিত সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি ঘোড়ার ডাকে করে বৈশালীতে যুদ্ধারম্ভের সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাদের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈনিক রাতারাতি নিঃশব্দে গঙ্গা পার হলো।

এই সৈন্যরা নদীতীরে পৌঁছানোর পরই আমাদের স্থল এবং নৌসৈন্যরা নদীর ওপর থেকে মগধের নৌসৈন্যের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। চারি-দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মগধের নৌসৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গেলো। তারা

একবার আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা করলো বটে ; কিন্তু জ্ঞাত শত্রুর চেয়ে অজ্ঞাত শত্রু চিরকালই ভয়ঙ্কর হয়। ভোরের আলো দেখা দেবার আগেই মগধের নৌবহরের বেশীর ভাগ নষ্ট হয়ে গেলো, না হয় আমাদের দখলে এলো।

আমি মাঝগঙ্গায় নৌকায় চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। যখন আমরা পাটলিগ্রাম ঘাটের আশপাশ শত্রুশূন্য করছিলাম, তখন শোনের নদী-দুর্গে অবস্থিত রণতরীগুলি আমাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলো। কিন্তু ঠিক সেই সময় কপিলের রণতরীগুলির একাংশ এসে পড়ায় তারা নিজেদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী নৌ-বহরের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়লো। কপিলের বাহিনীর আর এক অংশ দুর্গ আক্রমণ করলো। সেখানে খুব কম সৈন্যই ছিলো, সুতরাং কপিল তাদের হটিয়ে দুর্গে লিচ্ছবি সৈন্য মোতায়েন করলো।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার নিম্নভাগ তথা শোন থেকে আগত নৌ-সৈন্য আর পাটলিগ্রামের কাছে অবস্থিত হস্তী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী একবার প্রচন্ড আক্রমণ করলেন। কিন্তু গঙ্গাতটে এখন আমাদের অবস্থান বেশ সুদৃঢ়। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন নতুন সৈন্যদল তীরে এসে নামছে। কপিলের শৃঙ্গযুক্ত তরীগুলোও আশ্চর্য রকমের কাজ দিচ্ছে। শত্রুর তরীর ওপর সবেগে চালিত আমাদের নৌকা-গুলি যখন সংঘর্ষ বাধাচ্ছে, তখন চড়্‌চড়্‌ শব্দে সেই শৃঙ্গগুলি শত্রুতরীর দেহ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে এবং দেখতে দেখতে সেগুলি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। মাগধীরা গঙ্গা পার হয়ে হস্তীবাহিনী দ্বারা উল্কাচল আক্রমণ করতে চেয়েছিলো ; কিন্তু আমাদের তরীর এই শিংই হাতীগুলোকে আর তাদের সঙ্গীদের পর্যুদস্ত করে দিলো।

লক্ষ্য করলাম —ঘাটে আমাদের প্রচুর সৈন্য অবতরণ করছে এবং শোন আর গঙ্গার নিম্নভাগে সৈন্যাবতরণের কাজ ভালোভাবেই চলছে বটে, কিন্তু ওপর দিকে শত্রুসৈন্যের পরাক্রম বেড়ে চলেছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সামনের ঘাট শত্রুর রণতরীমুক্ত না হয়, ততোক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা থাকবেই। তাই ঐ ঘাট শত্রুমুক্ত করতে বেলা দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেলো। আমাদের এই সাফল্যে আমার বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাষাণ-ভার নেমে গেলো।

গঙ্গার নিম্নভাগের সৈন্যদের নেতৃত্বভার ছিলো অমরুর ওপর। শোনের ঊর্ধ্বাংশের সেনাবাহিনীর ভার ছিলো কপিলের হাতে। আমি মধ্যভাগের সৈন্যবাহিনীর পিছনে ছিলাম। কপিল আর অমরু স্থলভাগে শত্রুসৈন্যদলকে ডাইনে, বাঁয়ে এবং পাশে অবিরাম আঘাত করে চলেছিলো। নদীতট শত্রুমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাটলিগ্রামে যুদ্ধরত আমাদের সৈন্যদের সাহায্য করতে নতুন সৈন্যদল নিয়ে পৌঁছালাম। ইতিমধ্যে শান্তনু শত্রুদের কাছ থেকে অধিকৃত নৌকাগুলিকে জুড়ে বাঁশ দিয়ে পুল তৈরী করতে লেগে গেলো।

পাটলিগ্রামের সমতলভূমিতে শত্রুসৈন্য বড়ো রকমের বাধা দিতে পারতো। কিন্তু কপিল আর অমরুর সৈন্য শত্রুর অগ্রবাহিনীর পেছনে গিয়ে পড়ায় তাদের সমগ্র বাহিনীকেই আবার পেছনে হটে আসতে হলো। বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যেই পাটলিগ্রামের আশপাশের এক যোজন ভূমিখণ্ড আমাদের অধিকারে এসে গেলো। পাটলিগ্রামে আমরা আমাদের স্কন্ধাবার [সৈনিকদের ছাউনি] স্থাপন করলাম। কপিলের সেনাবাহিনী শোনের দক্ষিণ তটে বহু দূর পর্যন্ত শত্রুশূন্য করলো।

সন্ধ্যার দিকে আমার এবং অমরুর বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে নৌকার পুলের ওপর দিয়ে দলে দলে সৈন্য আসতে লাগলো। অল্পক্ষণ পর-পরই দ্রুতগামী নৌকা করে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সেনাপতি সুমনকে খবর পাঠাচ্ছিলাম। আবার আমার উপ-নায়কও অশ্বারোহী দ্বারা ঠিক এমনি করেই মুহূর্তে মুহূর্তে আমাকে নিজের অগ্রগতির খবর পাঠাচ্ছিলো। আমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী বেশ সুব্যবস্থিতভাবে নিজের নিজের জায়গায় নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েই অবস্থান করছিলো। কিন্তু প্রথম দিনের যুদ্ধে শত্রুর পরাজয়ের পর সেই পরাজয় থেকে আমাদের অবস্থা আরো সুদৃঢ় করবার জন্যে তারা সব সময় ছোটখাটো আক্রমণ করে চলেছিলো।

রাত্রে গণপতি এবং সেনাপতি পাটলিগ্রাম জয়ের জন্যে আমাকে প্রশংসা করে সাধুবাদ পাঠালেন এবং পরদিনই গণ আমাকে উপ-সেনাপতি পদ প্রদান করলো।

আমরা যখন পাটলিগ্রামে পৌঁছালাম, তখন অধিকাংশ বাড়ীই জনশূন্য পড়েছিলো। উল্কাচলে প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে আমাদের সৈন্যরা গ্রামবাসীদের কোনো জিনিস বলপূর্বক গ্রহণ বা স্পর্শ করেনি অথবা অন্য কোনোরকমে কষ্টও দেয়নি। আচার্য অগ্নিবেশের চিকিৎসা শিবির উল্কাচলে স্থাপিত ছিলো এবং নৌবাহিনী ও তীরবর্তী আহত সৈন্যদের সেবায় ভামার সেনারা নিযুক্ত ছিলো। এই আহত সৈন্যে ভরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আমি এমন অনেক সৈন্যকেই দেখতে পেলাম, যারা নিজেরাও নড়তে-চড়তে অক্ষম, আবার তাদের দেখাশোনা করবার জন্যেও কেউ নেই। আমি পাটলিগ্রামের কতকগুলি বাড়ী —অবশ্য জোর করে নয়, অনুনয়-বিনয় করে আর অর্থের লোভ দেখিয়ে খালি করিয়ে সেখানে সেইসব আহত সৈন্যদের রাখার ব্যবস্থা করলাম এবং তাদের চিকিৎসার জন্যে আচার্য অগ্নিবেশকে পত্র দিলাম। যদিও আমি এসবই শুধু নিজের করুণা বিস্তারের জন্যেই করেছিলাম, কিন্তু এর প্রথম প্রভাব পড়লো পাটলিগ্রামের অধিবাসীদের ওপর। তাদের মধ্যে যারা আশপাশের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলো, তারা সেইরাত্রেই ফিরে এলো।

কারণ তারা খবর পেয়েছিলো যে, লিচ্ছবিদের তরুণ সেনাপতি দয়ার সাগর —তিনি আহত শত্রুরও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। আমি গ্রামজ্যেষ্ঠকে [মোড়ল] ডেকে আশ্বাস দিয়ে বললাম —শুধু আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্যেই আমরা তাদের কয়েকটা ঘর-বাড়ী আপাতত ব্যবহার করছি। আর সেই আহতদের মধ্যেও অধিকাংশই হলো মগধের সৈন্য। ভুলক্রমেও যদি কোনো সৈন্য তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে তখনি তোমরা সে খবর আমার সেনানীদের কাউকে কিংবা আমাকে জানাবে।

শত্রু প্রথম আক্রমণে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু একে আমরা আমাদের জয় বলে মনে করতে পারি না।

সারা রাত লিচ্ছবি চতুরঙ্গ সেনা —পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী সৈন্যদল গঙ্গা পার হয়ে মগধের তটভূমিতে অবতরণ করতে লাগলো। ওদিকে পাটলিগ্রামের তিন যোজন দূরে শত্রুপক্ষও বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। সেই রাত্রেই আমার দু'জন উপ-নায়ককে উল্কাচলে সেনাপতি সুমনের কাছে পাঠালাম।

যুদ্ধের সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা স্থির করলাম —পরদিন ভোরেই শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ করতে হবে। এটা আমরা ভালো করেই জানি যে, মগধের সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি দু'এক দিনে শেষ হবার নয়।

সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করলো। যদিও এখনো পর্যন্ত সমগ্র মাগধী বাহিনীকে ময়দানে সমবেত করা সম্ভব হয়নি, তবুও হাতী আর রথের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। ওদের তুলনায় আমাদের হাতী আর রথ অনেক কম। অবশ্য আমরা জেনেশুনেই রথের সংখ্যা বাড়াইনি। কারণ মগধের ধান্যক্ষেত্রগুলি এখন যদিও শূন্য পড়ে আছে, তবু রথ চালনার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। মগধের চেয়ে আমাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা বেশী। পদাতিকের সংখ্যাও কম নয়।

প্রথমে শত্রুর দু'দিকে অমরু আর কপিলের সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করলো। তার ফলে শত্রুসৈন্যের মধ্যবর্তী হাতীগুলোকে ওরা দু'পাশে নিয়ে এলো। এমন সময় সম্মুখভাগ থেকে আমার বাহিনীও আক্রমণ আরম্ভ করলো। একটা ব্যাপার স্পষ্টই দেখতে পেলাম —আমাদের সৈন্যরা যেমন পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, শত্রুসৈন্যদের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

কপিল আর অমরু —দু'জনেই বর্ম আর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে নিজের নিজের অশ্বারোহণে সেনা সঞ্চালন করছিলো। তাদের দু'জনকেই তক্ষশীলার প্রদত্ত সৈন্ধব ঘোড়া দেওয়া হয়েছিলো। মাগধী রথ সত্যিই সেই ধান্যক্ষেত্রের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হলো। দুপুরের মধ্যেই আমাদের

অশ্বারোহী বাহিনী প্রমাণ করে দিলো যে, ওদের রথগুলো আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার অযোগ্যই শুধু নয়, সেগুলো অন্যান্য বাহিনীগুলোর পক্ষেও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করছে। অবশ্য হাতীগুলো প্রথম দিকে আমাদের কাছে একটা কঠিন সমস্যা বলেই মনে হয়েছিলো। সেই কালো কালো পাহাড়ের মতো জন্তুগুলো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। দেখলাম, এই হস্তী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করা যাচ্ছে না কিছুতেই। সুতরাং হস্তীযূথকে দু'পাশ থেকে আক্রমণ আরম্ভ করলাম। তখন দু'পাশের হস্তী-যূথের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেলো এবং তাদের চাপের প্রভাব অন্যগুলির ওপর পড়তে লাগলো। যদিও এখানকার মুখোমুখি যুদ্ধে প্রথমবার ওরা কিছুটা সুবিধা করেছিলো, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ আমরা নিজেদের ঘাঁটি যথেষ্ট দৃঢ় করে ফেলেছিলাম। মগধের সেনাবাহিনীর পূর্বাহ্নের সফলতা সন্ধ্যার সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

ধনুকের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়াটা এই যুদ্ধে মাগধী বাহিনীর একটা বড়ো রকমের দুর্বলতায় দাঁড়ালো। ওরা রথীদের বাণ বর্ষণের ওপরই ভরসা করেছিলো অনেকখানি। রথের অসফলতার সঙ্গে সঙ্গে সে ভরসা নির্মূল হয়ে গেলো। অথচ আমাদের অশ্বারোহী আর পদাতিকরাও ছিলো বাণ বর্ষণে সুনিপুণ। যেখানেই বাগিচা বা বৃক্ষ পাওয়া যাচ্ছে—আমাদের ধনুর্ধররা সেখানেই গাছের ওপর উঠে বাণ বর্ষণ করছে। মগধের সৈন্যদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ম না থাকার ফলে বাণ, বর্শা ও খড়্গের আঘাত থেকে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারছিলো না।

আজ সারা দিনের যুদ্ধে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে দেখলাম, রথের দ্বারা শত্রুপক্ষের কোনো লাভই হয়নি; কিন্তু হাতীগুলির মোকাবিলা করা এখনো আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। তবে আমাদের অশ্ব আর ভল্লও এতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে—বিশেষ করে পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। মগধের অশ্বারোহীরা যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কিন্তু তাদের বর্মের অভাব থাকায় তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা তো দ্বিপ্রহর থেকে আমাদেরই ভারী হয়ে উঠেছে। সারা দিনে মাত্র এক ক্রোশ আমরা অগ্রসর হয়েছি, আর তার অর্থ হলো শত্রুপক্ষ এখনো এখানে যুদ্ধ করে চলেছে। গতকালের মতো আজও আমরা কয়েক সহস্র মাগধী সৈনিককে বন্দী করেছি। শত্রুপক্ষ এখনো যুদ্ধরত হলেও তারা লিচ্ছবি তরবারির যে আস্বাদ লাভ করেছে, তা মোটেই মধুর নয়।

আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো যুদ্ধরত মানুষগুলিকে আর পশুদের মাঝে মাঝে খাদ্য আর পানীয় পেঁছে দেওয়া। যদিও তাদের কাছে

কিছুটা করে পানীয়, ঝলসানো মাংস আর মধুগোলক আছে, তবু যুদ্ধের মধ্যে খাবার সময় পাওয়া শক্ত।

পরদিন আমরা খবর পেলাম, উত্তর অঙ্গের [অঙ্গুত্তরাপ] থেকে বজ্জীর পূর্ব সীমান্তে জমায়েত মাগধী সৈন্য যথেষ্ট দুর্বল প্রতিপন্ন হয়েছে। এর একটা ফল হলো এই যে, মাগধী সৈন্যের সঙ্গে আমাদের শুধু মগধ-ভূমিতেই লড়াই করতে হবে এবং সেজন্যে যথেষ্ট-সংখ্যক লিচ্ছবি সৈন্য একাধিক নৌ-সেতুতে করে গঙ্গা পার হয়ে আসতে লাগলো। সেই রাত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে একই সৈন্যদল দিয়ে অবিশ্রাম আক্রমণ না করে নদী তরঙ্গের মতো এক দলের পর অপর দল আক্রমণ চালিয়ে যাবে। তাতে আগের দলগুলিও আহারাদির একটু সময় পাবে এবং নতুন বাহিনী অপরিশ্রান্ত উদ্যমে দৃঢ়মুষ্টিতে আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবে। যেহেতু আমরাই আক্রমণ চালাচ্ছি, অতএব আমাদের এ সুবিধাটুকু আছে। নাহলে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যত্নশীল সৈন্যদের ভাগ্যে এ সুযোগ জোটে না।

আমাদের যেমন নতুন নতুন সৈন্যদল এসে পড়েছিলো, মগধের সৈন্যরাও তেমনি সহায়তা লাভ করছিলো। সুতরাং যুদ্ধের তৃতীয় দিনেও শত্রুসৈন্যের সংখ্যা কম ছিলো না। তবে এখন বিপক্ষের যুদ্ধকৌশল আমরা ভালো করেই বুঝতে পারছি। বিপক্ষকে হয়রান করার জন্যে রাত্রে আমাদের সৈন্যরা এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ চালালো। পরদিন আমরা নবাগত সৈন্যদের সামনের দিকে পাঠালাম। তারপর যখন শত্রুসৈন্যের কিছুটা পিছু হটা শুরু হলো, ততোক্ষণে গতকালের সৈন্যদল আহার-বিশ্রামাদি সেরে এসে যোগ দিলো। এইভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করায় আমাদের সৈন্যেরা সারা দিন যুদ্ধ করার হাত থেকে অব্যাহতি তো পেলোই, তাছাড়া শত্রুপক্ষের বলক্ষয় করতেও তারা সফল হলো।

লিচ্ছবি-নারীসেনা এখন সৈন্যদের অন্ন-জল পৌঁছানো, আহতদের অপসারণ এবং সন্ধ্যায় মৃতদেহগুলির সৎকার ছাড়াও রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে জমা করছে। ভামা রোহিণীকে দু'একবার অবশ্য বলেছে যে, নারীসেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রেও যাবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি তাদের কাজের প্রাচুর্য আর গুরুত্বটা বুঝিয়ে বলায় সে জেদ করা ছেড়ে দিয়েছে। আমি এ কথাও বলেছি—বৌদি, আমরা তো এখন এগিয়েই চলেছি। কিন্তু আমাদের যদি পিছু হটতে হতো, তাহলে তোমার বাহিনীকে নিশ্চয়ই তরবারি ধারণ করতে হতো।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করলেও শত্রুপক্ষ পিছু হটলো না। মনে হলো, নিজেদের সবচেয়ে সুনিপুণ যোদ্ধাদের ওরা রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছে। কুমার অজাতশত্রু স্বয়ং হাতীতে আরোহণ করে এই যুদ্ধে

এসেছেন। আমার মনে দুঃখ হতে লাগলো এই ভেবে যে, সামনাসামনি তরবারি চালনা করতে পারলাম না। যোজন যোজন বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্যদের পরিচালনা এমন জটিল কাজ যে, তরবারি চালনার সময় পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু সেদিন যখন যুদ্ধরত সৈন্যদের নিরীক্ষণ করছিলাম তখন অসাধারণ উচ্চ একটা হাতীতে আরোহণ করে এক যোদ্ধাকে যুদ্ধ করতে দেখলাম। ভাবলাম —এই যোদ্ধাই বোধ হয় অজাতশত্রু। তাই আমার বর্শাকে দক্ষিণে বামে চালনা করতে করতে নিজের অশ্বারোহণে হাতীটার দিকে এগিয়ে চললাম। আমাকে অশ্বারোহণে অগ্রসর হতে দেখে লিচ্ছবি অশ্বারোহী সৈন্য মাগধীদের ওপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা কেউ খড়্গ, কেউ বর্শা, কেউ বা গদা চালনা করতে লাগলো। এমনি করে আমরা সেই হাতীটার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাঁর চারপাশের মাগধী অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনী অনেকটা হটে গেলো এবং আমি সেই গজারোহীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার ভল্লকে দু'বার তিনি ব্যর্থ করলেন — মাহুতকে হাতীটাকে দিয়ে আমার দিকে আক্রমণের ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমার ঘোড়া সেই হাতীটার চেয়ে দ্রুতগামী, সুতরাং মাহুতের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। পরমুহূর্তেই পেছন দিকে হাতীর এক পাশ থেকে আমি প্রচণ্ড বেগে বর্শা নিক্ষেপ করলাম। বর্শাটা গজারোহীর বর্ম ভেদ করে তাঁর কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হলো এবং বর্শাটা টেনে নিতেই তিনি হাওদার ওপর লুটিয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময় এক লিচ্ছবি তরুণকে তার ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে হাতীটার ওপর উঠে পড়তে দেখলাম। মুহূর্তের মধ্যে সে মাহুতের পেছনে পৌঁছে গেলো এবং বাঁ হাতে অঙ্কুশটা ছিনিয়ে নিলো —আঘাতে তার তালু থেকে তখন রক্ত ঝরছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে অপর হাতের খড়্গ দেখিয়ে বললো —হাতীকে সামনে চালাও। সেই তরুণের বিদ্যুৎগতি কার্যকলাপে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম হাতীটা আমাদের ছাউনির দিকেই চলেছে, তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিলো না। আমাদের আশপাশে খানিক দূর পর্যন্ত শত্রুসেনার চিহ্নমাত্রও ছিলো না। আমি পাঁচ জন অশ্বারোহীকে আমার সঙ্গে আসার নির্দেশ দিয়ে হাতীর পেছন পেছন চললাম। ছাউনিতে পৌঁছাবার পর তরুণটি হাতীর পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। তরুণটি আমার দিক থেকে অপর দিকে মুখ ঘুরিয়েছিলো। সে মাহুত আর একজন অশ্বারোহীর সাহায্যে গজারোহী সৈনিককে নীচে নামালো। মাহুত সেই তরুণটির সব আদেশই যন্ত্রবৎ পালন করছিলো। যখন সে হাতীর পা কঠিন শৃঙ্খলে বন্ধ করলো, তখন তরুণটি গম্ভীর স্বরে বললো —এখন তোমাকে

প্রাণ দান করা হলো। যাও, এবার আমাদের এই সেনাপতির প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমি তখনো সেই তরুণের মুখ দেখতে পাইনি, তাছাড়া তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো বলেও মনে করছি —এমন সময় মাহুত এসে বললো—প্রভু! এটা মগধরাজ বিম্বিসারের মঙ্গল হাতী নালাগিরি।

আমি —আর এই হাতীর আরোহী কে?

মাহুত —মগধের সেনাপতি ভদ্রিক, যাঁকে চণ্ডও বলা হয়।

চণ্ড ভদ্রিকের নাম শুনে আমার আনন্দের আর সীমা রইলো না। সেনাপতি ভদ্রিক মগধের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন। আচার্য বহুলাশ্বের কাছে তাঁর কথা শুনেছি। ভদ্রিকের প্রেরণাতেই মগধের তরুণরা তক্ষশীলায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে যেতো। ভদ্রিক যদি রাজার তোষামদকারী সেনানায়কদের বিরোধ-ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য না হতেন, তাহলে তিনি মগধের সেনাবাহিনীকে অজেয় করে গড়ে তুলতে পারতেন।

আমি তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের সৈনিকদের খাটিয়া আনতে বললাম। খাটিয়া এলে নিজে ভদ্রিকের শবের একদিক ধরে তাঁকে শয্যায় শায়িত করতে সাহায্যও করলাম। সে সময় আমাদের আশপাশে আরো কিছু সৈন্য জমায়েত হয়েছে। আমি তাদের বললাম—ইনি শুধু মগধের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-বিশারদই নন, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ভদ্রিক।

মাহুতকে আমাদের সৈন্যদের কাছে রেখে হাতীটার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলাম। তারপর ভদ্রিকের শব নিয়ে নিজের শিবিরে পেঁছালাম। ঠিক সেই সময় রণক্ষেত্র থেকে অশ্বারোহী বার্তাবাহক এসে সংবাদ দিলো, শত্রুসেনা ময়দান ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। আমি বিশ্রামরত সৈন্যদের দ্রুত গিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দিলাম।

এবার আমি খানিকটা চিন্তার অবকাশ পেলাম। তখন মনে পড়লো সেই লিচ্ছবি তরুণটির কথা। তার তরবারি চালনার দক্ষতার কোনো পরিচয় আমি পাইনি বটে, কিন্তু সে হাতীটাকে আনার জন্যে যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছে তা অসাধারণ বলা যায়। আমি আমার প্রহরীকে সেই তরুণকে ডেকে আনতে বললাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও তাকে আর পাওয়া গেলো না। সেই বীরকে একটি প্রশংসাসূচক বাক্যও বলতে পারলাম না বলে বড়ো দুঃখ হতে লাগলো। হয়তো সে আবার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবন করতে ছুটেছে, হয়তো তাতে সফল হয়ে আবার ফিরেও এসেছে। আমার যেন নিজের ওপরই রাগ হতে লাগলো—বীরত্বের প্রকৃত সম্মান না করার জন্যে নিজেকে যেন কতকটা অপরাধী বলেও মনে হতে লাগলো। অনুতাপের আগুন থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে আমি সেই হাতীটার কাছে

ফিরে গেলাম। এখন দেখে মনে হলো—হাতীটা গজরাজ ঐরাবতই বটে!

তারপর আবার আমি যুদ্ধক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে লেগে গেলাম। তখন দিনমানের অল্পেই অবশিষ্ট, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হলো। আমি মাহুতকে জিজ্ঞাসা করলাম—মহারাজ বিম্বিসারের মঙ্গল হাতীতে সেনাপতি কেন আরোহণ করেছিলেন?

মাহুত—মহারাজ সেনাপতির গুণ জানতেন। সেনাপতি কুমারকে শিশুমতি বলতেন, তাই তিনি সেনাপতির ওপর বিরূপ। কিন্তু মহারাজ তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তাঁর জন্যে মঙ্গল হাতী তো তুচ্ছ, নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন। ওঁরা দু'জনে সমবয়স্ক বাল্যবন্ধু ছিলেন।

আমি সে সময় কিছুটা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, তাই আবার বললাম —যদি তোমাকে মঙ্গল হাতীর সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি তুমি রাজগৃহে চলে যাবে?

মাহুত—আমাকে ছেড়ে দেবেন?

আমি—হ্যাঁ। একই সঙ্গে বাল্যবন্ধু সেনাপতি আর মঙ্গল হাতী দুটোই হারিয়ে মহারাজ খুবই দুঃখ পাবেন। আমার মনে হয়, মঙ্গল হাতী ফিরে গেলে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

মাহুতকে নীরব দেখে আমি আবার বললাম—তুমি বোধ হয় পথে আমার সৈন্যদের ভয় করছো?

মাহুত—হ্যাঁ প্রভু।

আমি—সে ভয় করো না। আমি তোমাকে আমার সুরক্ষিত সৈন্য-বাহিনীর পঙ্‌ক্তি পার করে দেবো। তুমি যে আহত হওনি, এটাও সুলক্ষণ। যাও, আমার সৈন্যরা তোমাকে আর হাতীটাকে খেতে দেবে। রাজার বাল্য-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখছি। তারপর তোমাকে দ্রুত রাজগৃহে রওনা হতে হবে।

মাহুত যে আমার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছে, সেটা তার হাবভাবেই বোঝা গেলো। আমি যখন তিন ছত্রের একখানি চিঠি লিখে মোহরাঙ্কিত করছি, এমন সময় সেনাপতি সুমন এসে পড়লেন। তিনি এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ললাট চুম্বন করে বললেন—সিংহ, পুত্র আমার—না, লিচ্ছবিদের বিজয়ী সেনাপতি—

আমি—না, আমার কাছে আপনার পুত্র শব্দটাই অধিক প্রিয়।

সেনাপতি—বেশ! তবে শোনো পুত্র—সারা বৈশালী, সমগ্র বজ্জী-ভূমি আজ তোমার জন্যে গর্বিত। আমরা মগধের কাউকে যদি ভয় করতাম তো সে শুধু কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বর্ষকার আর যুদ্ধ-বিশারদ

সেনাপতি ভদ্রিককে। ভদ্রিককে বধ করে তুমি মগধকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছো।

—এবং সেনাপতি, মগধের সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। লিচ্ছবি সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

—পালাচ্ছে! তবে সেনাপতি ভদ্রিকের মৃত্যুর পর এটা অবশ্যম্ভাবী ছিলো।

—কিন্তু একটি অপরাধের জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

—মগধ-বিজয়ীর একটা নয়, শত অপরাধও মার্জনীয় বৎস।

—রাজার মঙ্গল হাতী, যাতে চড়ে মগধ সেনাপতি যুদ্ধে এসেছিলেন–আমি সেটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

—তাহলে মঙ্গল হাতীকেও ধরে এনেছিলে পুত্র!

—এনেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে তরুণ অসাধারণ বীরত্ব আর কৌশল প্রদর্শন করে হাতীটাকে বন্দী করে এখান পর্যন্ত নিয়ে এলো, তাকে একটা মুখের কথা দিয়েও সম্মান দেখাতে পারলাম না। বোধ হয় সে এখন মাগধীদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

—যখন একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হয়, তখন এই ধরনের ভুল হয়েই থাকে। যাই হোক, তুমি যদি মঙ্গল হাতীকে ফেরত দিতে চাও, তবে পাঠিয়ে দাও।

আমি — আর একটা কথা। আমি মগধরাজকে এই পত্রখানি লিখছি—"রাজা মাগধ শ্রেণিক বিম্বিসারকে লিচ্ছবি-সেনাপতি সিংহের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। মঙ্গল হাতীর মতো সেনাপতি ভদ্রিককে জীবিত ধরতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত। লিচ্ছবিরা বীরের প্রতি সম্মান দেখাতে জানে এবং আমরা মগধ-সেনাপতির দাহ-সৎকারাদি উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গেই সম্পন্ন করবো। স্বয়ং লিচ্ছবি-সেনাপতি চিতায় অগ্নিসংযোগ করবেন। আপনার বাল্যবন্ধুর বিয়োগজনিত দুঃসহ শোক কিছুটা সহনীয় হবে মনে করে মঙ্গল হাতীকে আপনার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি।"

সেনাপতি —এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমি মাহুতকে চিঠিখানি দিলাম। সেনা-পঙ্‌ক্তি পার করে দেবার জন্যে তার সঙ্গে দু'জন অশ্বারোহী এবং আমার মুদ্রাঙ্কিত মার্গ-পত্রও দিয়ে দিলাম। তারপর বাগানের কাছে চিতা প্রস্তুত করতে বললাম।

পাটলিগ্রাম থেকে তিন যোজন দূরে এক উদ্যানে আমাদের শিবির সংস্থাপিত হয়েছিলো। সেখানে আমগাছের ছায়ায় সেনাপতির সঙ্গে বসে আছি, এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহীর সঙ্গে কপিল এসে উপস্থিত হলো। সে ঘোড়া থেকে হাত-বাঁধা একজন লোককে নামালো এবং সামনে সেনা-

পতিকে দেখে তাঁকে অভিবাদন করে আমাকে বললো —ইনি মগধের উপ-সেনাপতি উদায়ী। আজ আমরা সবচেয়ে বেশী লোককে যুদ্ধে বন্দী করেছি। এখনো গণনা করা হয়নি অবশ্য ; কিন্তু তাদের সংখ্যা বোধ হয় লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

সেনাপতি কপিলকে সাধুবাদ প্রদান করলেন। আমি তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম —তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান্ কপিল। আমি মগধের সেনা-পতিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে পারিনি।

কপিল —তাহলে মগধের সেনাপতিকে তুমি শেষ করেছো ?

আমি —তাঁকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে পারলে আমি সত্যিই খুশী হতাম। এখন শত্রুপক্ষের অবস্থা কী ?

কপিল —শত্রুসৈন্য খতম হয়েছে। এখন এতো যুদ্ধ-বন্দী পাওয়া যাচ্ছে, যাদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করাই একটা সমস্যা।

সেনাপতি বন্দীর কাছে গিয়ে বললেন —উপ-সেনাপতি উদায়ী! মগধের সেনাপতির দাহ এবং অন্তিম সৎকার কার্যে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন বলেই আশা করি।

উদায়ী -নিশ্চয়। এ তো আমার সৌভাগ্য!

আমি উদায়ীর উভয় হস্ত নিজের হাতে নিয়ে বললাম -আর আমাকে ক্ষমা করবেন সেনাপতি। আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আমার যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে।

উদায়ী --কিন্তু, আমি তো বন্দী।

আমি ---তবু আপনি বীর। চিরকাল এক পক্ষই জয়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বীরত্ব উভয় পক্ষের মধ্যেই দেখা যায়। আমার সৈন্যরা আপনাকে কষ্ট দেয়নি তো ?

উদায়ী ---আপনার সেনানায়কের [কপিল] সৌজন্যের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

কপিল —কিন্তু আমি আপনার হাত বেঁধে দিয়েছিলাম।

উদায়ী -- না বাঁধলে এতো সহজে হয়তো আমাকে আনতে পারতেন না।

আমি ---যাই হোক, আপনি এখন কিছু খাবেন ?

উদায়ী —শুধু একটু জল পান করবো।

উদায়ীর জল পানের পর আমরা শব তুললাম। চিতার ওপর শব তুলে নেবার পর সেনাপতি সুমন অগ্নি-সংযোগ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অগ্নির রক্তিম লেলিহান শিখার মধ্যে চণ্ড ভদ্রিকের দেহ ঢাকা পড়ে গেলো।

ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর সৈন্যদের সঙ্গে উদায়ীকে উল্কাচলে পাঠাবার আদেশ দিলাম। তারপর আমি আর কপিল সেনাপতি সুমনকে

যুদ্ধের সমস্ত পরিস্থিতি জ্ঞাপন করলাম। অল্পক্ষণ পরেই সেনাপতি সুমন বৈশালীর পথে যাত্রা করলেন।

আমি কপিলকে বললাম —মিত্র কপিল! সফলতাই হলো কার্যের আসল পুরস্কার।

কপিল —ঠিক বলেছো। কৌশল করে তুমি এই মহান্ বিজয় সম্পন্ন করেছো।

আমি —আমার সাফল্যের কথা মনে করে এইমাত্র যা বললে, আমি তোমার বিষয়েও ঠিক ঐ একই কথা মনে করেছি। এখন এসব কথা যেতে দাও, খাওয়ার কথা বলো। আমার কথা জানোই তো। ভামার ভাষায়, 'ন্যাংটার শিষ্য' হয়ে গেছি। সুতরাং আমার মাছ-মাংস-মদের কোনো দরকার নেই।

কপিল —আর ঠিক এইগুলোই আমার দরকার।

আমি — তাহলে তোমার সেনানীকে তার ফরমাশ দাও।

সে রাত্রে শুক ক্ষীর-পোয়া তৈরী করেছিলো। তা খেতেও বেশ ভালোই হয়েছিলো। কিন্তু আমার তা খেতে ভালো লাগছিলো না। আমার সঙ্গীরা মাংস আর সুরার সঙ্গে উৎসবে মত্ত। কে আর আমার সাথী হবে? অবশ্য সেজন্যে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। নিজে জেনে-শুনেই তো এ পথ বেছে নিয়েছি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনীত বন্দীদের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমার উপ-নায়ক এবং সেনানীরাই যথেষ্ট। তাছাড়া সপ্তাহাধিক স্বল্পনিদ্রাবশত চোখের পাতা দুটোও ভারী হয়ে আসছিলো। সুতরাং একটু সকাল-সকালই শুয়ে পড়লাম।

মাঝ রাত্রে কার ডাক শুনতে পেলাম। প্রথমে ভাবলাম, হয়তো স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু দু'তিনবার ডাকার পর বুঝতে পারলাম, কপিল ডাকছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

— কি হয়েছে কপিল ভাই?

—তোমার প্রগাঢ় নিদ্রারই প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকেছি। সেনাপতি সুমনের দেহান্ত হয়েছে।

—সুমনের দেহান্ত! কেমন করে? তিনি তো এই কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে রওনা হলেন।

উল্কাচলে পেঁছেই সেনাপতি যদিও দূত মারফৎ একখানি পত্র বৈশালীতে পাঠিয়ে ছিলেন, তবু মন মানলো না। তিনি ভাবলেন যুদ্ধজয়ের সংবাদ গণ-পরিষদকে নিজে গিয়েও দেবেন। উল্কাচল থেকে প্রস্থান করে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গী অশ্বারোহীরা দেখে যে তাঁর প্রাণবায়ু

বহির্গত হয়ে গেছে। তাদের একজন এখানে খবর দিতে এসেছে, অবশিষ্টরা সেনাপতির শব নিয়ে বৈশালীতে যাত্রা করেছে।

আমার সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কপিল বললো—সেনাপতি উল্কাচলে নেই। পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধপ্রায়। তবুও সেখান থেকে যে সংবাদাদি আসবে, তার ব্যবস্থা কে করবে?

আমি এ কথা ভুলিনি যে, আমিই লিচ্ছবিদের উপ-সেনাপতি। তাই কপিলকে বললাম—যতোক্ষণ গণ অন্য কাউকে নিযুক্ত না করছে, ততোক্ষণ তাঁর কাজের ভার আমারই ওপর। বন্ধু কপিল! দক্ষিণের যুদ্ধক্ষেত্রের ভার তোমার ওপর রইলো। যতোক্ষণ মগধের দূত এসে শান্তি প্রার্থনা না করছে, ততোক্ষণ মাগধী সেনার পশ্চাদ্ধাবন করতে ক্ষান্ত হবে না। যুদ্ধ-বন্দীদের উল্কাচলে পাঠাবে। অমরুর জন্যে আমি চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমার ঘোড়াটা আনিয়ে দাও।

আলোর সামনে বসে চিঠি লিখলাম। কপিল 'অশ্ব তৈরী' বলে খবর দিলো। তাকে পত্রখানি দিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললাম—বলা যায় না বন্ধু, এ সময় কে কাকে অন্তিম আলিঙ্গন করছে। পরিস্থিতি দেখে যা বুঝবে, তাই করবে। আর এখান থেকে তিন যোজন দূরে আমি তো আছিই।

সে এক নিস্তব্ধ রাত্রি। রাতের একটা শাঁই-শাঁই শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঝুম। আমাদের পাঁচটি ঘোড়ার পদশব্দই শুধু সেই নীরবতা ভঙ্গ করছিলো। একদিন আগে যে ভূমি রুধিরে কর্দমাক্ত ছিলো, আমরা সেই ভূমি অতিক্রম করছিলাম। আমরা এতো দ্রুত পথ অতিক্রম করছিলাম যে, নিজেদের মধ্যে কথা বলার অবকাশ ছিলো না।

পাটলিগ্রামে সেনানীকে ডেকে বলে দিলাম, আমি উল্কাচলে যাচ্ছি। এখানের ভার সেনানায়ক কপিলের ওপর রইলো। তিন যোজন দৌড়ানোর পর ঘোড়া ক্লান্ত হওয়ায় আমরা কিছুক্ষণ পাটলিগ্রামে বিশ্রাম করলাম। তার পর ধীরে ধীরে নৌকার সেতু পার হয়ে উল্কাচলে পেঁছালাম। আমার সঙ্গী অশ্বারোহীরা প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাওয়ায় তাদের ফিরতে বললাম এবং সেনাপতির সাহায্যকারী সেনানীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুয়ে পড়লাম।

একুশ

সন্ধি

সকালে উঠেই দেখলাম, গণপতির দূত পত্র নিয়ে আমারই প্রতীক্ষা করছে। আমি চিঠি নিয়ে পড়লাম। যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে গণপতি আমার প্রশংসা করেছেন এবং যে-পর্যন্ত গণ একজন সেনাপতি নির্বাচন না করছেন সে-পর্যন্ত আমাকেই সেনাপতির কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আদেশ পালনে আমার সম্মতি জানিয়ে দূতকে বিদায় দিলাম।

দলে দলে যুদ্ধবন্দী উল্কাচলে এসে পৌঁছাচ্ছে। আহতদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি দেখে আমি বেশ খুশীই হলাম এবং যখন সে কথা আচার্য অগ্নিবেশকে বললাম, তখন তিনি বললেন —দিনের পর দিন ব্যবস্থা আরো উন্নত হচ্ছে। এতোগুলি আহত লোককে একই সময়ে চিকিৎসা করার সুযোগ আমার আর কখনো হয়নি। কিন্তু যেমন যেমন সমস্যা আমার সামনে দেখা দিয়েছে, তেমন তেমন সমাধানও খুঁজে পেয়েছি।

তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম —লিচ্ছবি-নারীরা কেমন কাজ করছে ?

—লিচ্ছবি, অ-লিচ্ছবি সব স্ত্রীলোকদের মধ্যেই একটা অদ্ভুত উৎসাহের জোয়ার এসেছে। তারা পুরুষের সমান কাজ করে চলেছে। আর তাদের নায়িকা ভামার কথা আর বলো না। তার আদেশ যেন লিচ্ছবি সেনাপতির আদেশ।

—তার আদেশ ঠিক অমনিভাবেই পালন করা হয় ?

—নিশ্চয়।

—তার সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন, আমি এখানেই আছি।

সেনাপতি, এ যুদ্ধ আমাদের বজ্জী-বাসীদের মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চার করেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও এতে কোনো-না-কোনো উপায়ে সাহায্য করতে চায়। অন্তত আমার মানবিকার কাছে এটা আশা করিনি। সে সারা জীবন ধরে আমাকে তার ফরমাশের জ্বালায় শুধু জ্বালিয়েই এসেছে।

—বলেন কী !

—তাছাড়া কী ! যখন তার প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা হলো, তখন তো

আমার প্রাণ যাবার দাখিল। বলে কি-না —খেলনা আনো। আমার বাচ্চা খেলা করবে।

—হুকুম মতো সব খেলনা এনে দিতেন তো আচার্য ?

—কি করবো ? মানবিকা তখন তরুণী —তার ক্রোধকে আমার বড়ো ভয় ছিলো। বাচ্চার খেলার জন্যে একটা ঘরই খেলনায় ভরিয়ে তুললো। তারপর কি হলো জানো ? একটা মেয়ে।

—তাহলে খেলনার গতি কি হলো ?

—পরের সন্তানটি ছেলে হবে, এই আশায় যত্ন করে রেখে দিলো। কিন্তু তার পাঁচটি সন্তান হলো —সবই মেয়ে। মানবিকা কেমন ছিলো, এটা তার একটা নমুনা। শরীরটাকে একটু নড়ানো-চড়ানোও তার অপছন্দ ছিলো। কিন্তু সে যখন তোমার মা মল্লিকাকে কাছা দিয়ে কাপড় পরে আহতদের পটী বাঁধা, বিছানা করা, দুধ পান করানো ইত্যাদি কাজ করতে দেখলো, তখন যেন একেবারে বদলে গেলো।

—আমার মা ? কাছা দিয়ে কাপড় পরছেন ?

—আর মানবিকাও। বলছি না, বজ্জীর স্ত্রীজাতির মধ্যে এক নতুন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আর যে পরিমাণ আহত লোক আসছে, তাদের দেখাশোনা করতে গেলে কারো পক্ষে গজেন্দ্রগমনে চলা সম্ভব নয়।

—মা কোথায় আচার্য ?

—এখনো আসেনি, তবে আসার সময় হয়ে এলো। মানবিকা আর মল্লিকা দেবী —দু'জনে বাল্যসখী।

—তাহলে আচার্য, মাকে আর ভামাকে বলবেন, দুপুরবেলা আমি সেখানে যাবো।

—গান্ধারী বৌকেও বলবো তো ?

—হ্যাঁ।

—আমার মানবিকা তাকে খুব ভালোবাসে। বলে, সখীর বৌ নিজেরই বৌ। গান্ধারী বৌ আর ভামার দর্শন, বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

—কাজের চাপ তো খুব।

—কাজের কথা আর বলো না সেনাপতি। আহতদের ভীড় লেগেই রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র যে কতোদূরে, তাও জানি না। কিন্তু সদ্য আহতের দলকেই তো আসতে দেখছি।

—দ্বিতীয় দিনেই রণক্ষেত্র তিন যোজন দূরে সরে গিয়েছিলো আচার্য।

—তাহলে তো মেয়েরা আহতদের নিয়ে রীতিমতো ছোটাছুটি করছে দেখছি।

—যুদ্ধক্ষেত্রে তো নিশ্চয়। তারপর ডিঙি আর রথও আছে। তবুও

যা দেখছি, লিচ্ছবি মেয়েরা দিন-রাত মানছে না, দুপুরের উত্তপ্ত রোদও নয়। প্রচণ্ড তীর বর্ষণের মধ্যেও তারা ভয় পাচ্ছে না। একজন আহত লোককেও এক মুহূর্তের জন্যে রণক্ষেত্রে ফেলে রাখতে চায় না তারা।

—তবে বোঝো সেনাপতি! বলছিলাম না, সদ্য আহতদের দলই আমার কাছে আসছে। আর আঘাতের পর যতো দ্রুত আমার কাছে আসবে, ততো দ্রুত তাদের আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকবে।

—তাহলে আচার্য, মাকে বলবেন আমি দ্বিপ্রহরে আসবো।

—আর মানবিকাকেও বলবো সেনাপতি। সেও তোমাকে দেখার জন্যে উৎসুক।

আমি 'আচ্ছা' বলে চলে এলাম।

দুপুরে খাওয়ার আগে আমি আবার অগ্নিবেশের চিকিৎসালয়ে গেলাম। মা যে ঘরে আহতদের দেখাশোনা করছিলেন, বৈদ্যাচার্য আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। মা-র মুখমণ্ডল তখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, আমি তাঁকে চিনতেই পারলাম না। তাঁর মাথায় লিচ্ছবি পুরুষদের পাগড়ী, দেহে কঞ্চুক এবং পরিধানে দু'কচ্ছ-করে-পরা ধুতি। আচার্য বলার পর মা আমাকে লক্ষ্য করলেন। তিনি এসে আমাকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। আমি যেন তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুটিই আছি। অতঃপর তিনি আমার ললাট, কেশ বারংবার চুম্বন করতে লাগলেন।

আমি বললাম —মা, তুমিও ভামার নারী-সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছো?

মা —ভামার আর রোহিণীর সৈন্যবাহিনীর বলো। যখন ওরা লিচ্ছবি-নারীসেনাবাহিনীর কথা বলছিলো, তখন প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাদের যখন একান্ত মনোযোগ দিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সব কিছু শিক্ষা করতে দেখলাম, তখন বুঝলাম যে এটা খেলা নয়। তাছাড়া যার মাথার ওপর নগ্ন তরবারি ঝুলছে, তার আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ কোথায়?

তারপর একজন সমবয়স্কা স্ত্রীলোককে আসতে দেখে মা বললেন —এই আমার সখী সুর্যা, আচার্য অগ্নিবেশের স্ত্রী।

অগ্নিবেশ —হ্যাঁ, এই আমার মানবিকা, সেনাপতি।

ব্রাহ্মণী আমার অবনত মস্তকে চুম্বন করে বললেন —তাহলে ব্রাহ্মণ, তুমি সেই বাচ্চার খেলনার গল্পও শুনিয়েছো বোধ হয়?

অগ্নিবেশ বিড়বিড় করে বললেন —আর ক্রোধ করো না। ইনি আমাদের সেনাপতি।

ব্রাহ্মণী —সেনাপতিও বটে, আবার আমার বাল্যসখীর পুত্র বলে আমার পুত্রও বটে। কি বলো পু—সেনাপতি!

আমি —না আচার্যাণী, আমাকে পুত্রই বলুন। আমি বাল্যে আপনার কোলে খেলা করেছি।

ব্রাহ্মণী — আর আমি তোমাকে দুগ্ধপানও করিয়েছি।

মা —হ্যাঁ, সখী! তখন উমা আর সিংহকে আমরা ভিন্ন চোখে দেখতাম না।

ব্রাহ্মণী —কিন্তু আজ কী পরিবর্তন! আমি দূর থেকে বৈশালীতে যেতে দেখেও চেহারা দেখে বিশ্বাস করতে পারিনি!

আমি — আচ্ছা আচার্য, শুনলাম সুকুলা কাকীও না-কি আপনার চিকিৎসা বিভাগে কাজ করছেন?

আচার্য —মাত্র প্রথম দিন সেনাপতি। তারপর ভামার সঙ্গে ওপারের রুগ্নালয়ে চলে গেছেন।

আমি —ভামারও তো কোনো খোঁজ নেই আচার্য!

আচার্য —না। আজ আহতও আসছে খুব কম।

আমি — আর আসবে না আচার্য।

মা —আসবে না বৎস?

আমি —না মা। মগধের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। গতকাল থেকেই আমাদের সৈন্যরা ওদের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

অগ্নিবেশ - সেনাপতি সুমন এই বিজয় দেখে যেতে পারলেন না, এই বড়ো দুঃখ।

আমি —দেখে গেছেন আচার্য। এই সংবাদ শুনেই বৈশালীতে খবরটা দেবার জন্যে তিনি বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই জন্যেই তিনি প্রাণ হারালেন। তবে বিজয়ী সৈন্যদের পক্ষে এটা দুঃখের কথা যে, আজ তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে, স্বাগত জানাবার জন্যে তাদের সেনাপতি জীবিত নেই।

চিকিৎসালয় পরিদর্শন করে আমি শস্ত্রাগার দেখতে গেলাম। সেখানে মাগধীদের কাছ থেকে দখল করা অস্ত্র-শস্ত্র জমা করা হচ্ছে। উপ-নায়ক শান্তনু তখন শস্ত্রাগারে উপস্থিত ছিলো। তার তরীগুলি শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র-শস্ত্র জমা করার কাজে নিযুক্ত ছিলো। আমরা দু'জনেই দু'জনকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলাম। সে আমাকে যুদ্ধ জয়ের জন্যে প্রশংসা করতে লাগলো।

আমি বললাম —এই বিজয়ে তক্ষশীলার দান কম নয়।

শান্তনু —তক্ষশীলা যে ভগ্নী বৈশালীর কিছুটা সেবা করতে পেরেছে, সেটাই আমাদের আনন্দের কারণ।

আমি —এ কি সাধারণ সেবা! আপনাদের সেবা আমাদের কাছে চির-

স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার সংগঠিত বাহিনী প্রথম আক্রমণেই শত্রুকে যে পর্যুদস্ত করেছিলো, তা আর তারা সামলাতে পারেনি। আজ তো মিত্র কপিল ওপারের সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনা করছে। যুদ্ধ অবশ্য এতোক্ষণে প্রায় সমাপ্ত, আমরা মগধরাজের কাছ থেকে তাঁর পরাজয় স্বীকারের অপেক্ষায় আছি।

আমার আবাসে ফিরে আবার সংবাদাদি গ্রহণ আর আদেশ দান করতে লাগলাম। সন্ধ্যার তখনো কিছুটা দেরী আছে, এমন সময় কপিলের কাছ থেকে খবর এলো—'শত্রু যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছে।' আমি উত্তর দিলাম—'পশ্চাদ্ধাবনের কাজ বন্ধ রাখো। আমি আগামীকাল উত্তর পাঠাবো।'

অতঃপর তখনি অশ্বারোহণে বৈশালী যাত্রা করলাম। পথের মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত ঘোড়া বদল করতে করতে সূর্যাস্তের কিছু পরে বৈশালীতে পেঁছালাম। কয়েকমাস পরে আজ গণপতি সুনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে সাধুবাদ প্রদান করতে লাগলেন। আমি তাঁকে কপিলের প্রেরিত সংবাদ প্রদান করলাম। তখনি অমাত্য-পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হলো।

প্রশ্ন হলো—যুদ্ধ বন্ধ করা হবে কি-না? যদি বন্ধ করা হয়, তবে কি শর্তে বন্ধ করা হবে?

অমাত্য মহানাম বললেন—আমরা কয়েকবার মগধের আক্রমণের স্বাদ পেয়েছি। ওদের সঙ্গে কোনো সন্ধিই স্থায়ী হবে না। সন্ধি করে আমরা শুধু ওদের আবার প্রস্তুত হয়ে নতুন আক্রমণের সুযোগ দিচ্ছি মাত্র। সুতরাং এই বিবাদের একেবারে মূলোৎপাটন করা দরকার।

গণপতি—অর্থাৎ মগধরাজ্যের সমাপ্তি ঘটানো চাই।

মহানাম—নিশ্চয়।

গণপতি—তাহলে পাঠা. মগধ, অঙ্গ-দক্ষিণ, অঙ্গ-উত্তর সবই বজ্জীর অধিকারে আনতে হয়।

মহানাম—সে তো খুবই ভালো কথা।

গণপতি—কিন্তু সেখানে আমাদের শাসনটা কি রূপ নেবে? গণ শাসন, না রাজ-শাসন?

মহানাম—বজ্জীর মতোই গণ-শাসন।

গণপতি—কিন্তু বজ্জীতে লিচ্ছবিদের সংখ্যাই অধিক, তাই তাদের শাসন গণ-শাসনের রূপ নিয়েছে। মগধ বা অঙ্গে লিচ্ছবি প্রজা নেই।

মহানাম—আমরা এখানে অ-লিচ্ছবি প্রজাদের ওপর যেভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করি, ওখানেও সেইভাবেই করবো।

গণপতি —আমাদের সেনাপতি উত্তরাপথ, তক্ষশীলার অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু বলুন, এই আমার ইচ্ছা।

আমি —পূজ্য গণপতি! আমি সৈনিক মাত্র, তাই রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে গণতন্ত্রের রাজনীতি সম্বন্ধে যে কথা বলবো, সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করবার সময় আপনারা মনে রাখবেন যে এটা কোনো রাজনীতিজ্ঞের সিদ্ধান্ত নয় —একজন যোদ্ধার সিদ্ধান্ত মাত্র। উত্তরাপথে গান্ধারের মতো গণ-এ দাস প্রথা নেই, বর্ণ ভেদের প্রশ্নও নেই। কারণ সেখানে সবাই আর্য এবং গোটাকয়েক পরিবার ব্যতীত সবই গান্ধারী। তাই সেখানে গণ-প্রথা আরো শুদ্ধ রূপে পাওয়া যায়। সেখানে পরস্পরের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব দেখা যায়, এখানে তা একান্ত দুর্লভ। আমার মনে হয়, তক্ষশীলার [গান্ধার] গণ-প্রণালী আমাদের আদর্শ হতে পারে। আমাদের এখানে দাস প্রথা আছে, আর্য ছাড়া অন্য প্রজাও প্রচুর, তার ওপর অ-লিচ্ছবি আগন্তুকের সংখ্যাও কম নয়। তার পরিণামে দেখা যাচ্ছে, অ-লিচ্ছবিদের ওপর আমাদের শাসন কঠোর না হলেও তাকে গণ-শাসনের মতো বলা চলে না। কারণ আমাদের শাসন, আমাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার কোনো পথই তাদের নেই। বজ্জীর মধ্যেই অ-লিচ্ছবি প্রজাদের ওপর এমনি করে আমরা গণ-শাসন চালাতে ব্যর্থ হয়েছি। তার ফল হলো, লিচ্ছবির কতকগুলো পরিবারের বিত্তের সীমা নেই, আবার কতকগুলো বড়োই গরীব। নিজের নিজের অর্থের পরিমাণ অনুসারে লোকের গণ-এর ওপর প্রভুত্বের ইচ্ছা জাগে, ফলে গরীব লিচ্ছবি ধনী লিচ্ছবিদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে।

যখন বজ্জীর মধ্যেই অবস্থা এইরকম, তখন যদি অঙ্গ-মগধের মতো অ-লিচ্ছবি দেশকে আমাদের বজ্জীর সঙ্গে মিলিত করি, তাহলে এর প্রভাব গণ প্রণালীর ওপর বেশী করে পড়বে। আপনারা এখান থেকে কাউকে রাজা করে ওখানে পাঠাবেন না বটে; কিন্তু একজন শাসক তো ওখানে পাঠাবেন! আর সেই শাসকের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করার জন্যে সেখানে লিচ্ছবি-গণ থাকবে না। আপনারা যদি বেশীদিন একজনকে সেখানে শাসক থাকতে দেন, তবে বুঝে দেখুন আপনারা দ্বিতীয় মগধরাজ তৈরী করবেন কি-না। অর্থের সঙ্গে সেখানে প্রভুত্বেরও সম্বন্ধ থাকবে। যখন আপনারা তাকে সরাতে চাইবেন, তখন সে তা পছন্দ করবে না। এইভাবে কিছুকাল চলার পর একটা মস্ত বড়ো বিপদের সৃষ্টি হবে।

এ কথার পর মহানামের সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত আলোচনা হলো—

মহানাম —যদি আমরা বেশীদিনের জন্যে কাউকে না পাঠাই, ধরুন মাত্র তিন বছরের জন্যে রাখি?

—তিন বছর যথেষ্ট সময়। এর মধ্যে চতুর লোক শিকড় গেড়ে বসতে

পারে। অঙ্গ-মগধের প্রভাবশালী লোকদের ষড়যন্ত্র আর প্রবাসী কিছু লিচ্ছবিদের সাহায্য তুফান সৃষ্টি করতে পারে।

—আর যদি মাত্র এক বছরের জন্যে পাঠানো যায়?

—তাহলে সেই অল্প সময় সেই দেশের রীতি-নীতি, রাজনীতিক অবস্থা ব্যবস্থা বোঝবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত হবে না।

—তাহলে মগধকে গণ-এর সঙ্গে যুক্ত করলে লিচ্ছবি গণ-শাসন প্রণালীকেই আঘাত করা হবে বলে মনে করেন?

—হ্যাঁ, পশ্চিমের গণ-এর অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথাই পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

—কিন্তু কিছুকাল পর-পরই মগধের সঙ্গে এইরকম যুদ্ধের পথ বন্ধ করার উপায় কি?

—শুধু এই কথাই নয় পূজ্য অমাত্য, আরো বড়ো বিপদ আছে। এ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হয়েছি। কিন্তু যদি একবার মগধ জয়ী হয়, তাহলে সে এই গণ-শাসন চিরকালের জন্যে উচ্ছেদ করে ছাড়বে। আমাদের এখানে প্রচুর অ-লিচ্ছবি প্রজা আছে, তাদের গ্রাম-শাসনের অধিকার নেই। মগধ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখার অছিলা করে লিচ্ছবি, অ-লিচ্ছবিদের সবাইকে সমান পরাধীন করে দেবে।

—এ কথা খুবই ঠিক সেনাপতি। ওরা একবার জয়ী হলেই আমাদের গণ-প্রণালীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। এমন সর্বনাশকারী শত্রুর অস্তিত্ব রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু বিম্বিসারকে সরিয়ে দ্বিতীয় লিচ্ছবি বিম্বিসার খাড়া করলে বিপদ আরো বাড়বে। বিম্বিসার শুধুই বিম্বিসার—আর দ্বিতীয় বিম্বিসার হবে অঙ্গ-মগধের প্রভু, তার ওপর লিচ্ছবি। তার ফলে সে আমাদের লিচ্ছবিদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হবে। অর্থাৎ শ্রেণিক বিম্বিসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেখানে সার লিচ্ছবি গণ একমত, সেখানে লিচ্ছবি বিম্বিসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা একমত হবে কি-না সন্দেহ। সেক্ষেত্রে বিপদ কি আরো বৃদ্ধি পাবে না? তাহলেই প্রথম প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—আমরা কি আমাদের শত্রুকে দূর করতে গিয়ে লিচ্ছবি গণ-এর একতাই ধ্বংস করে ফেলবো?

—আমার ধারণা কোনো লিচ্ছবি শিশুও তা পছন্দ করবে না।

—তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আমাদের একতা বজায় রেখে কেমন করে শত্রুর অস্তিত্ব ধ্বংস করতে পারি?

—হ্যাঁ, আমাদের এমনি কোনো উপায় বার করতে হবে। এমন কোনো পথ আপনি কি বলতে পারেন সেনাপতি?

—এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পূজ্য মহানাম। আমি একটা পথ বলতে পারি, কিন্তু সে পথও সম্পূর্ণ সন্দেহরহিত নয়।

গণপতি —কি সে পথ সেনাপতি?

আমি —অঙ্গ আর মগধের প্রজাদের স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেওয়া।

মহানাম —বিম্বিসারের সৈন্যদের পরাস্ত করে আমরা তা অনায়াসেই করতে পারি।

আমি —কিন্তু অঙ্গ আর মগধের প্রজারা কি সে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে চাইবে?

মহানাম —স্বাতন্ত্র্য কে না চায়?

আমি —স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক জবাবদিহি, অনেক চিন্তা-ভাবনা, অনেক স্বার্থত্যাগ, এমন কি প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করার দায়িত্ব প্রায়শই জড়িত আছে। দীর্ঘকালের দাস এসব গুণ প্রায়শই হারিয়ে ফেলে।

মহানাম —অতএব আপনার সিদ্ধান্ত এই যে, একবার যে দাস হয়, সে চিরকাল দাস হয়ে থাকতে চায়?

আমি —আমি এখানে প্রায়শ শব্দটা ব্যবহার করেছি। প্রজাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ সেখানে আর একটা গণতন্ত্র কায়েম করা। মগধ-গণ, অঙ্গ-গণ প্রতিষ্ঠা।

মহানাম —এইভাবে প্রাচীতে গণ-এর সংখ্যা উদীচীর [পঞ্জাব] মতো বৃদ্ধি করাই কি মঙ্গলজনক নয়?

—এমন হলে তো মাঝে মাঝে এ-রকম যুদ্ধের পরিণাম ভালোই বলতে হবে। গণ-এর শত্রু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে গণ-প্রণালীর আর কোনো আশঙ্কাই থাকবে না। কিন্তু যাকে আমরা ঠিক বলে ভাবছি, তাই যে করতে পারবো তা তো বলা যায় না।

—কেন, আমরা কি অঙ্গ-মগধের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারি না?

—যদি কোনো মগধ-রাজ বা অঙ্গ-রাজকে সেই স্বাধীনতা সমর্পণ করতে চান, তাহলে অবশ্য তা করা খুবই সহজ।

—আমরা প্রজাদের হাতে সমর্পণ করার কথা বলছি।

—অর্থাৎ মগধ-গণ, অঙ্গ-গণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। কিন্তু তার জন্যে লিচ্ছবিদের মতো এক রক্তের সম্বন্ধযুক্ত শুক্লবর্ণ আর্য —কোনো বৃহৎ অঙ্গ জাতি বা মগধ-জাতির দরকার।

—এমন কোনো জাতি কি নেই?

—মগধ-ক্ষত্রিয় জাতি আছে, মগধ-ব্রাহ্মণ জাতি আছে —মগধ-শিল্পী, মগধ-চণ্ডাল, মগধ-গৃহপতি পাবেন। কিন্তু আমাদের লিচ্ছবিদের মতো বহু-সংখ্যক একজাতীয় লোক নেই।

—এদের মধ্যে আর্য শুক্লবর্ণ জাতি —ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের একত্র করে আমরা তো মগধ-গণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

—কিন্তু ব্রাহ্মণদের এজন্যে আমরা প্রস্তুত করতে পারবো না। কারণ তারা মনে করে যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি তাদের কাজ। শাসন হলো ক্ষত্রিয়দের কাজ।

—গণ-এর প্রভুত্ব আর স্বাধীনতার জন্যে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের পুরুত-গিরি ছাড়তে রাজী হবে!

—তাহলে তাদের ত্রিবেদের সব মন্ত্রই লোপ পাবে —কোনো মন্ত্র স্মরণ করবার জন্যে একটি বালকও অবশিষ্ট থাকবে না।

—সে কী!

—ব্যাপারটা সেইরকমই। কারণ অষ্টক, বামক, বামদেব, জমদগ্নি, ভৃগু বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যাঁরা তিন বেদ তৈরী করেছেন, তাঁরাই ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ সৃষ্টি করার মুখ্য কারণ হয়েছেন। উদীচীর [পঞ্জাব] আর্যরা বেদ তৈরী করেনি। কুরু-পঞ্চালেও বামদেব, অষ্টক প্রভৃতি পাবেন না। প্রাচীই বেদ তৈরী করেছে, তাই এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভেদটা বড়ো প্রবল।

—আমরাও তো প্রাচীতেই আছি, আমাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের ভেদ নেই কেন ?

—উত্তরাপথের [পঞ্জাব] গণ-জাতিগুলিকে দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছি যে, আর্য বা শুক্লবর্ণদের পূর্বপুরুষরা কোনোরকম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভেদ রাখতেন না। গান্ধার, কম্বোজ আর উত্তর কুরুতে আজও এই অবস্থাই চলছে। আগন্তুক অ-লিচ্ছবিদের কথা ছেড়ে দিলে আমাদের মধ্যেও একই নিয়ম। অস্ত্রধারণ, শাসনকার্য পরিচালনা প্রভৃতিতে সমান অধিকারের জন্যে বাইরের লোকেরা আমাদের লিচ্ছবি-ক্ষত্রিয় বলে। তারা ক্ষত্রিয় কথাটা যখন বলে, তখন ব্রাহ্মণ কথাটাও তাদের মনে নিশ্চয়ই দৃঢ় আসন পেতেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলো শ্রেষ্ঠ পুরোহিত জাতি, ক্ষত্রিয় তাদের নীচে এক শাসক-যোদ্ধা জাতি। তাদের এই সিদ্ধান্তে কি আপনারা একমত ?

—নিশ্চয়ই না। রক্তের শুদ্ধতা বা বর্ণের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে আমরা ব্রাহ্মণদের আমাদের সমান বলে মনে করতে পারি না। তারা আমাদের চেয়ে নীচে। সেইজন্যেই আমরা ব্রাহ্মণ-কুমারী বা কুমারের দ্বারা লিচ্ছবি-কুমার বা কুমারীর সন্তানকে লিচ্ছবিদের সমান অধিকার দিতে রাজী নই। ব্রাহ্মণরা লিচ্ছবি-কন্যার গর্ভজাত সন্তানকেও নিজের দলে ভিড়িয়ে নেয় —তাকে যজ্ঞ, ভোজ ইত্যাদিতে সমান অধিকার দেয়। নিজের কন্যার লিচ্ছবি-দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেও নিজেদের নানা গোত্র আর বংশে গ্রহণ করে।

—বস্তুত কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি স্থানে যেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভেদ দেখা দিয়েছে, সেখানে আমাদের গণ-জাতিরা তা স্বীকার করে নেয়নি। তারা সেই প্রাচীন আর্য জন [জাতি] হয়েই আছে। তারা কুরু-পঞ্চালের মতো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং প্রাচীন আর্য জাতির মতোই গণ শাসন বজায় রেখেছে। আগে একবার হয়তো প্রশ্ন উঠেছিলো লিচ্ছবিরা ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়। যদিও অপরে বলে বলেই আমরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলি, কিন্তু তা শস্ত্রধারী শাসক অর্থে, ব্রাহ্মণের নীচে, এই অর্থে নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মণ ঋষিদের ব্যবস্থিত বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা এখনো অন্তর্ভুক্ত হইনি। এতো কথা বলার কারণ হলো, গণ প্রতিষ্ঠার জন্যে যেমন এক জাতি, একই পরম্পরা প্রয়োজন, তা অঙ্গ-মগধে নেই। ওখানকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা গৃহপতিরা এখানকার লিচ্ছবিদের মতো একজাতি নয়।

—তাহলে সেখানকার ক্ষত্রিয়দেরই বা কেন গণ-জাতি বলে স্বীকার করা যাবে না?

—মগধ-ক্ষত্রিয়রা গণ-পরম্পরার কোনো স্মৃতি পর্যন্ত রক্ষা করে না। কেবল তাদের পূর্বপুরুষ কোনো রাজার স্মৃতিই তারা রক্ষা করে চলেছে। গণ নয়, কোনো সামন্তকেই তারা নিজেদের প্রধান বলে মনে করে। তারা কেমন করে গণ-প্রণালীর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবে?

গণপতি —ঠিক বলেছো সেনাপতি। আমারও মনে হয়, বিম্বিসারের রাজবংশ উচ্ছেদ করে সেখানে ক্ষত্রিয় জাতির হাতে শাসন-ব্যবস্থা তুলে দিলেই গণ স্থাপন করা সম্ভব হবে না। ওদের ক্ষত্রিয় বলা হয় বলেই ওরাও যে কোনোদিন লিচ্ছবিদের মতো স্বাধীনতা সম্ভোগ করতো, এ কথা বলা যায় না। তারা কেবল রাজার আজ্ঞা পালনকারী মাত্র। আরো একটা কথা। মগধের জাতিগুলি দাসত্ব বা পরাধীনতা বাধ্য হয়ে ভোগ করতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় গণ-স্বাধীনতা সকলে সমানভাবে ভোগ করতে রাজী হবে না। তাই কয়েকটি জাতিকে মিলিত করে অঙ্গ-গণ বা মগধ-গণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আসলে ওখানে জাতির খিচুড়ি এমন পাকিয়েছে যে, গণ-প্রতিষ্ঠার কথা মনে স্থান না দেওয়াই ভালো।

আমি —আর আমি প্রথমেই বলেছি যে সেখানে লিচ্ছবি গণ-এর শাসন প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হবে লিচ্ছবিদের একতা এবং লিচ্ছবি গণ-এর ধ্বংসেরও ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য অমাত্যরা এই বিষয়ে বিবেচনা করে আমার সিদ্ধান্তই ঠিক বললেন। মহানামের আগ্রহ ছিলো —অন্তত বিম্বিসারের রাজবংশকে শেষ করে দেওয়া হোক।

এ বিষয়ে আমি বললাম —পূজ্য মহানাম! এবার আপনি যে প্রশ্ন

করেছেন সেটা আমার নিজস্ব বিষয়ের —অর্থাৎ যুদ্ধ এবং রণবিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং সে কথা বলার আগে একটা কথা বলে রাখি। মনুষ্য-দেহের মতো রাজবংশেরও তারুণ্য আর বার্ধক্য আছে। আমরা কি মগধকে একটা তরুণ রাজবংশের হাতে নিজেরাই তুলে দেবো ?

গণপতি—এ কথাটা অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা নেকড়ের পাল ছেড়ে সিংহের দলের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না।

আমি—তাছাড়া একজন যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করে আমি বলতে পারি, মগধ রাজবংশকে পরাজিত করা আর তাকে উচ্ছেদ করা এক কথা নয়। তাদের পরাস্ত আমরা করেছি। কিন্তু উচ্ছেদ করা অনেক দূরের কথা। আমার বিশ্বাস, আমরা মগধের দলবদ্ধ শক্তিকে চূর্ণ করতে পারি, কিন্তু তার জন্যে আমাদের কয়েক হাজার লিচ্ছবি-তরুণকে প্রাণ বলি দিতে হবে। মাসের পর মাস বজ্জীকে অন্য সব কাজ বন্ধ রেখে কেবলমাত্র যুদ্ধের কাজেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমার মনে হয়, লিচ্ছবি-পুরুষ কেন, কোনো লিচ্ছবি-নারীও এই আত্মবলিদানে পশ্চাৎপদ হবে না।

সুপ্রিয় —লিচ্ছবি-নারীদের বর্তমান তৎপরতাই তার প্রমাণ।

আমি —তাছাড়া আমাদের সৈন্যদের রাজগৃহ দুর্গ জয় করতে হবে।

কয়েকজন অমাত্য একসঙ্গে বলে উঠলেন —রাজগৃহের দুর্গ ?

আমি —হ্যাঁ, কারণ যতোদিন আমরা রাজগৃহের দুর্গ দখল না করছি, ততোদিন বিম্বিসারের রাজবংশ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়।

গণপতি —সারা জম্বুদ্বীপে বিখ্যাত দুর্ভেদ্য সেই রাজগৃহের দুর্গ কি তুমি দেখেছো সেনাপতি ?

আমি দেখিনি বটে, কিন্তু তার সামরিক গুরুত্ব ভালো করেই জানি।

গণপতি —যদি নালন্দার পরবর্তী ঘাঁটি দখল করতে কয়েক মাস লাগে, তাহলে তো রাজগৃহের দুর্গ জয় করতে কয়েক বছর লাগবে !

আমি—পূজ্য গণপতি ! দক্ষিণ দিকের একটা সংকীর্ণ পথ ব্যতীত রাজগৃহ বৈসার, বিপুল, পান্ডব প্রভৃতি পাঁচটি পর্বতের শৃংখলে সুরক্ষিত। এই পর্বতের ওপর সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার—বিশাল পাথরের দেওয়াল —শত শত গলিপথের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাকারের স্থানে স্থানে সৈন্যের প্রহরা। সেখানে তাদের একজন সৈন্যকে মারতে কতোজন লিচ্ছবিকে জীবন দিতে হবে তার ঠিক নেই। বাইরে থেকে ওদের অবরোধ করার মতো অতো সৈন্য আমাদের নেই, আর যদি থাকেও, তবু বিম্বিসার বৎসরের পর বৎসর রাজগৃহের মধ্যে থাকতে পারেন। এই গিরি-দুর্গের মধ্যে সুমাগধার মতো বিশাল সরোবর আছে, তার জলধারায় সিক্ত

হাজার হাজার ক্ষেত আছে। সুতরাং রাজগৃহের দুর্গ অবরোধ করে আমরা বিম্বিসারের সৈন্যদের অনাহারে মারতে পারবো না।

মহানাম —কিন্তু আমরা যদি আক্রমণ করি সেনাপতি ?

আমি —পাঁচটা পাহাড়ের ওপর তৈরী দেওয়ালগুলোকে ভাঙবার মতো কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। যদি থাকতো, তাহলেও তো পাহাড়ের নীচে থেকে আগে ওপরে উঠতে হবে। আর ওপরে কোনো সমতল জায়গা বা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ওদের ধনুর্ধররা আমাদের কি-রকম ক্ষতি করতে সক্ষম, এ তো আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। তারপর প্রাকার পার হলেও দুর্গরক্ষীদের হাতে আমাদের কতো যোদ্ধা মরবে, সেটাও ভেবে দেখবেন।

সুপ্রিয় —বৈশালী কি এতো লিচ্ছবিকে বলি দিতে পারে ?

আমি —দিতে চাইবে। কিন্তু এতো বলি দেবার মতো লোকই তো আমাদের নেই। যদি তিন পুরুষ ধরে প্রত্যেক লিচ্ছবি-নারী 'কুড়িটি করে পুত্রসন্তানের জননী হয়, তবেই তা সম্ভব।

মহানাম —আর ঠিক ঐ-সংখ্যক কন্যাও।

আমি —সে কথা খুবই সত্যি! নাহলে দ্বিতীয় পুরুষেই অ-লিচ্ছবি মেয়ে বিয়ে করে তাদের সন্তানরা অ-লিচ্ছবি হয়ে যাবে। তাহলে পূজ্য পরিষদ! আমার ধারণা আমরা যদি রাজগৃহ দখলের সংকল্প করি তো সে সংকল্প-সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্ধ, নুলো, খোঁড়া আর পঞ্চান্ন-ষাট বছরের বৃদ্ধ আর পনেরো বছরের কম বালক ছাড়া লিচ্ছবি পরিবারগুলিতে কেউ জীবিত থাকবে না।

সুপ্রিয় —লিচ্ছবি-নারীদের সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যায়।

আমি—না, তা বলা যায় না। কারণ লিচ্ছবি নারীসেনা-বাহিনীতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের কম বয়স্কা মেয়ের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের বেশী হবে না। যুদ্ধের পর যথেষ্ট-সংখ্যক এমন লিচ্ছবি-তরুণী বেঁচে থাকবে, যাদের লিচ্ছবি-স্বামী পাবার কোনো আশাই থাকবে না।

মহানাম —এর পরিণামও তো খুব খারাপই হবে, সেনাপতি!

আমি —নিশ্চয়। কারণ আমরা তরুণী লিচ্ছবি-নারীদের কাছে এটা প্রত্যাশা করতে পারি না যে, তারা আজন্ম পুরুষ ব্যতীতই নিজের ঘরে বসে কাটিয়ে দেবে। তখন তাদের সঙ্গে অ-লিচ্ছবি আর্য, অ-লিচ্ছবি দাস কর্মকরের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। আর তাতে শুধু লিচ্ছবি-রুধিরেরই ক্ষতি হবে না, লিচ্ছবি গণ-এর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। যেহেতু লিচ্ছবি-নারীরা —যাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশীই হবে —তারা, নিজেদের সন্তানদের হীন অবস্থা দেখে নীরব থাকবে না।

মহানাম —তাহলে সেনাপতি, আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের এতো লোকসংখ্যা নেই, যার দ্বারা বিম্বিসারের রাজবংশ উচ্ছেদ করা যায় ?

আমি —উচ্ছেদও করতে পারে, অথচ লিচ্ছবি-গণ দৃঢ়প্রতিষ্ঠও রাখতে পারে, এমন লোকসংখ্যার অভাব ।

গণপতি —তাহলে সেনাপতি, আমরা কি করতে পারি সে বিষয়ে তোমার মতামতটা জানাও ।

আমি —আমাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে শত্রুর সামরিক বল হ্রাস করে এমন অবস্থায় রাখতে হবে, যাতে তারা আবার মাথা তুললেও লিচ্ছবিদের অবস্থাটা সুবিধাজনক থাকে । আমার মনে হয়, অস্থায়ী সন্ধির জন্যে মগধরাজের কাছে আমরা এই শর্ত উপস্থিত করতে পারি যে, আমাদের সীমান্তবর্তী নদীগুলির ওপারেও চার যোজন পর্যন্ত শত্রুসৈন্য থাকবে না এবং স্থায়ী সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করবে ।

অতঃপর কিছুক্ষণ আলোচনা চললো । তারপর পরিষদ আমার সিদ্ধান্তই মেনে নিলো ।

সেই রাত্রেই সংস্থাগারে গণ-সংস্থার বৈঠক বসলো । গণ অস্থায়ী সন্ধির জন্যে আমার শর্ত স্বীকার করে নিলো । আমাকে প্রশংসা করে লিচ্ছবি গণ-এর সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো এবং পরিষদকে স্থায়ী সন্ধির শর্ত স্থির করার ভারও দেওয়া হলো ।

পরদিন আমি উল্কাচলে সেনানায়ক কপিলকে লিখলাম, মগধরাজ এই সন্ধির শর্তে রাজী হলে যুদ্ধ স্থগিত রেখে সন্ধি-দূতকে আমার কাছে নিয়ে আসবার জন্যে ।

পরে জানতে পারলাম, সেনাপতির মৃত্যুতে আর উপ-সেনাপতি বন্দী হওয়ায় রাজা বিম্বিসার শোকাতুর এবং চিন্তিত হয়েছেন । এ যুদ্ধের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না । তাই যুদ্ধের এই পরিণাম দেখে তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন । বর্ষাকার কৌশলে নিজেকে রাজার কৃপাপাত্র করে রেখেছেন । যখন মাহুত নালাগিরির সঙ্গে আমার পত্র নিয়ে পৌঁছালো এবং প্রশংসাই করতে লাগলো, তখন বিম্বিসার বললেন —এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করা খুবই অন্যায় । কুমারের মতে যদি তিনি চলতেন, তাহলে আমাদের অস্থায়ী সন্ধির শর্তে কখনোই মত দিতেন না । কিন্তু রাজা অস্থায়ী সন্ধিতে রাজী হয়ে স্থায়ী সন্ধির জন্যে মহামাত্য বর্ষাকার এবং অমাত্য [মন্ত্রী] সুনীথকে নিযুক্ত করলেন । সৈন্যদেরও সীমান্ত থেকে চার যোজন পিছু হটে আসতে আদেশ দিলেন । চার যোজনের শর্তানুসারে পাটলিগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদিও আমাদের কিছুটা পিছু হটে আসতে হলো, কিন্তু দক্ষিণ সীমান্তের অধিকাংশ স্থানে এবং পূর্ব

সীমান্তে আমাদের সৈন্যরা চার যোজন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করলো।

জয়ের সংবাদ শোনামাত্রই বজ্জীর স্থানে স্থানে বিজয়োৎসব পালিত হতে লাগলো। আর উল্কাচলে তো আমাকে নিজের কাজকর্ম ছেড়ে ক'দিন ধরে লিচ্ছবি-বৃদ্ধদের ধন্যবাদ গ্রহণ করতে বাইরের আঙ্গিনায় বারবার বেরিয়ে আসতে হলো। গণ সাত দিন পরে বিজয়-নক্ষত্র [উৎসব] ঘোষণা করলো। সেদিন সারা বৈশালী তোরণ আর ধ্বজা-পতাকায় সুসজ্জিত হলো। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল-কলসও স্থাপিত হলো। বৈশালী তার বিজয়ী বীরপুত্রদের অন্তর দিয়ে স্বাগত জানাতে চাইছে।

আমাদের সৈনিক শোভাযাত্রায় প্রথমে গণপতি, তারপর আমি, তারপর গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক, রথী, নৌসৈনিক, সর্বশেষে অশ্বারোহী আর পদাতিক দু'রকমেরই লিচ্ছবি-নারীসেনা, তারপর আহতদের পাল্কী আর অগ্নিবেশের নেতৃত্বে বৈদ্যরা ছিলো। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্যে শান্তনু, কপিল, অমরু, আর ভামাও এসেছিলো। আহতের সংখ্যার কথা মনে করে খুব অল্প লোককেই চিকিৎসা বিভাগ থেকে আহ্বান করেছিলাম। বোধ হয় সেইজন্যেই রোহিণী আসতে পারেনি। শোভাযাত্রা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈশালীর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে নগরের প্রধান প্রধান সব রাস্তাগুলোই পরিভ্রমণ করলো। নগরের নর-নারীরা আবালবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলে সৈন্যদের ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলো। বৈশালীর কতো পুত্রই না এই যুদ্ধে মারা গেছে! কিন্তু এই বিজয়ের আনন্দ তার সব শোকই যেন ভুলিয়ে দিলো।

রাত্রে দীপমালায় নগর সজ্জিত হবে। কিন্তু আমি, কপিল, অমরু এবং আরো অনেককে দুপুরেই উল্কাচলে, তারপর পাটলিগ্রামে চলে যেতে হলো।

স্থায়ী শান্তি সম্বন্ধে মাগধীদের দিক থেকে এখন আর আমাদের কোনো চিন্তা ছিলো না। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। সমস্ত জায়গা থেকেই শত্রু-সেনার সন্ধি-শর্ত পালনের সংবাদ পাচ্ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, পঁচিশ বছর আগের যুদ্ধে মগধের এতোটা ক্ষতি কিংবা এমন শোচনীয় পরাজয় হয়নি।

যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে তিন মাস আমার খাওয়া শোয়ার কোনো স্থিরতা ছিলো না। এই সময়ে রোহিণী দু'চার দিন আমার সঙ্গে দেখাও করেছিলো, কিন্তু সে যে আমার কাছে নেই এ কথাটা অনুভব করার অবকাশ পর্যন্ত আমার ছিল না। এখন কাজকর্মও বিশেষ নেই, তাই রোহিণীর কথা মনে পড়তে লাগলো। কিন্তু একটা দিন আর এক রাতের বেশী সে চিন্তাও করতে হলো না। পরদিন ভোরবেলা উঠে তাঁবুর দরজার

কাছে যেতেই দেখি, রোহিণী এদিকে আসছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে নিলাম এবং আমার মুখ থেকে গদগদ স্বরে এই কথা বেরিয়ে এলো—আমার ঊষা! ঊষার মতোই রক্তিম, ঊষার মতোই আনন্দ ছড়িয়ে এই অরুণোদয়কালে তুমি এসেছো! কাল থেকেই আমি তোমার বিরহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছি। এতো কাতর আর আমি কখনো হইনি রোহিণী।

—এ তো স্বাভাবিক আর্যপুত্র! আমি যে কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাতে আর কোনো কিছুই খেয়াল থাকতে পারে না। কাল আমি মায়ের কাছে ছিলাম, সেইজন্যেই আসতে পারিনি। আর্যপুত্রকে অক্ষত শরীরে দেখে আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে! আর একটা খুশীর খবর শোনাবো।

—শোনাও প্রিয়ে!

রোহিণী লজ্জা পেয়ে চুপ করেই রইলো।

—আনন্দের খবরটাও লুকিয়ে রাখবে প্রিয়ে!

—আমার শরীর ভারী হচ্ছে।—এই কথা বলে সে লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলো।

আমি বারবার তার মুখচুম্বন করে আমার আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে বললাম —প্রিয়ে, আমাদের লিচ্ছবি-সন্তানের প্রয়োজন আছে। বিম্বিসারের মতো কিংবা আমাদেরই পঁচিশ বছর আগের যুদ্ধের মতো অতো সংখ্যায় না হলেও, এ যুদ্ধে অনেক বীরকেই আমরা হারিয়েছি।

তার বাম হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিলাম। তখনি সে শিউরে উঠলো। আমি ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —কি হলো প্রিয়ে?

—হাতে আঘাত আছে।

আমি হাতটা ধরে দেখলাম, তাতে প্রায় চার আঙুল চিরে গেছে—সেখানে পটি বাঁধা রয়েছে।

—এ ক্ষত তো এখনো শুকোয়নি দেখছি!

—অনেকটা ভালো হয়েছে! তবে চাপ দিলে ব্যথা লাগবে।

—কি করে এমন আঘাত পেলে প্রিয়ে?

—আহতদের ওঠাতে গিয়ে। আমরা তো মাগধী আহতদের আনছিলাম। একজন আহত—বোধ হয় সে বিকারের ঘোরে ছিলো, ভেবেছিলো আমি তাকে মারতে গেছি। সে বর্শা দিয়ে আঘাত করেছিলো।

—আহতদের অপসারণেও তাহলে আশংকা ছিলো?

—বিশেষ করে শত্রুসৈন্যদের অপসারণে।

রোহিণী এখন আমার পাশে —তাই আমার জীবনের নীরবতা, নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেলো।

আমাদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না। বিম্বিসারের সন্ধি-দূত, বর্ষকার আর সুনীথ এসে পড়লেন। তাঁরা মঙ্গল হাতী ফেরত দেওয়ার জন্যে বিম্বিসারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন —মগধরাজ চিরকালের জন্যে লিচ্ছবি গণ-এর সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক।

আমি মগধের অমাত্যদের বৈশালীতে নিয়ে এলাম। পরিষদ আমাকে আর গণপতিকে সন্ধির কথাবার্তা বলতে নিয়োগ করলো। কথাবার্তা চলার সময় সন্ধি-দূতদের দু'বার রাজার কাছে লোক পাঠাতে হলো। শেষে আমাদের এই শর্ত হলো—

১। দশ বছরের জন্যে গঙ্গা, কমলা আর বগ্‌মুদার [বাগমতী] মগধের তটভূমিতে এবং তার পরে এক ক্রোশ পর্যন্ত ভূমিতে লিচ্ছবিদের অধিকার থাকবে।

২। যেসব যুদ্ধসামগ্রী লিচ্ছবিরা হস্তগত করেছে, তা তাদেরই থাকবে, আর লিচ্ছবিদের যা কিছু মগধ সেনা হস্তগত করেছে, তা খুব শীগ্‌গিরই ফিরিয়ে দেবে।

৩। দু'পক্ষেরই যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। প্রথমে মগধরাজ মুক্তি দেবেন।

৪। মগধে লিচ্ছবি প্রজাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫। ওপরের শর্তগুলি পূরণ করার পর লিচ্ছবি সেনা সরিয়ে আনা হবে।

মগধের অমাত্যরা আমাদের পরিষদের এই শর্ত নিয়ে রাজগৃহে ফিরে গেলেন। বৃদ্ধ বিম্বিসার কুমার অজাতশত্রুকেও মন্ত্রণার জন্যে আহ্বান করলেন এবং লিচ্ছবিদের সন্ধি-শর্ত সম্পর্কে মতামত দিতে বললেন। প্রথমে তো অজাতশত্রু বললেন যে, আপনিই রাজা, স্বীকার-অস্বীকার যা করার আপনিই করবেন! তারপর বিম্বিসার তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, পুত্র! লিচ্ছবিরা আমাদের প্রতিবেশী। আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি; তোমাকেই তো রাজ্য রক্ষা করতে এবং লিচ্ছবি প্রতিবেশীকে নিয়ে বাস করতে হবে।

অজাতশত্রু —যখন আমার সময় আসবে, তখন আমি দুর্ভোগ ভুগবো মহারাজ!

বিম্বিসার —তাহলে তুমি লিচ্ছবিদের সঙ্গে এমনি করে যুদ্ধ করবে, আর আমার রাজবংশের প্রভুত্ব নাশ করবে?

অজাতশত্রু —আমি লিচ্ছবিদের সর্বনাশ করে ছাড়বো! কিন্তু সে হলো আমার সময়ের কথা। এখন আপনি যা চান, তাই করুন।

বিম্বিসার —তবে তুমি লিচ্ছবিদের সঙ্গে মৈত্রী করতে চাও না ? পুত্র ! এটা খুবই খারাপ। লিচ্ছবি গণ —ওরা পরের দেশ অপহরণ করতে চায় না। নাহলে ওরা এখন এমন অবস্থায় আছে যে, ইচ্ছে করলে সারা অঙ্গ, মগধ আর পাঠাকে নিজের অধীন করে আমার রাজবংশ ধ্বংস করে ছাড়তে পারে।

—আমি তা স্বীকার করি না। গিরিব্রজ [রাজগৃহ] জয় করা এতো সহজ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। —বলে অজাতশত্রু উঠে চলে গেলেন।

রাজা বিম্বিসারকে সন্ধি-শর্ত স্বীকার করতেই হলো।

বর্ষা আসতে-আসতেই সামরিক জীবনের সমাপ্তি ঘটলো —কেবল সীমান্তের সেনারাই রইলো।

আমরা বৈশালীতে চলে এলাম।

বাইশ

বুদ্ধের অনুগামী

এখন আমি সেনাপতি। সুতরাং সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। তবে এখন আর সে ব্যস্ততাও নেই, চিন্তাও নেই। কপিল, শান্তনু, অমরু প্রভৃতি আমার রণ-নিপুণ বন্ধু এবং ভামা, ক্ষেমা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প-গুজবের সময় পাই প্রত্যহই। ভামা এখন সত্যি-সত্যিই আমার জৈনব্রতে মৃদু মৃদু আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিলো। তপস্যা দ্বারা দেহের পাপ প্রক্ষালন এবং অহিংসা প্রতিপাদন সম্পর্কে যা কিছু বলার ছিলো, তা একদিনেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল নীরবে তার শ্লেষবাক্য শোনা ছাড়া উপায় নেই। শ্লেষের চেয়ে অসহ্য লাগে—যখন সারা ঘরে এখানে-ওখানে মাংস ভোজন চলে আর পানের পর সকলে নৃত্যে মত্ত হয়। তখন যেন বেশী করে জাতি-বহিষ্কৃতের মতো আমাকে আলাদা বসে চেয়ে থাকতে হয়।

একদিন আমরা কোনো কাজে সংস্থাগারে জমায়েত হয়েছিলাম। কাজ শেষ হবার পর, সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, সদস্যরা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলো। একজন বললো—আজকাল বৈশালীর পরম সৌভাগ্য যে, একজন নয়, দুজন ধর্মাচার্য এখানে উপস্থিত আছেন। গণাচার্য তীর্থংকর নিজের পারিষদবর্গের সঙ্গে এখানে বর্ষাবাস করছেন। আর শ্রমণ গৌতম মহাবনে কূটাগারশালাতে নিজের পাঁচশো শিষ্য নিয়ে উপস্থিত আছেন। নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র আছেন বহু-পুত্রক চৈত্যের কাছে।

অপর একজন বললো—বৈশালীবাসীর পক্ষে এটা মস্ত বড়ো সুযোগ। তারা এমন মহান্ ধর্মাচার্যের উপদেশ শুনতে পাচ্ছে।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন—শ্রমণ গৌতমের প্রতিভার কথা আর বলার কিছু নেই। আজ সারা জম্বুদ্বীপে তাঁর খ্যাতি।

এরপর গণপতি বললেন—ধর্মাচার্য আর তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবুও সেইদিনটি আমার মনে আছে—যেদিন গৌতমের মাসী আর তাঁর স্ত্রী পায়ে হেঁটে বৈশালীতে এসে পৌঁছালেন। গৌতমের স্ত্রী যশোধরা সে সময় তরুণী ছিলেন। সৌন্দর্যের কথা কি আর বলবো! তিনি শুধু একটা জনপদেরই নয়, বহু জনপদের কল্যাণী

হতে পারতেন। কপিলাবস্তু থেকে এখান পর্যন্ত হেঁটে আসায় তাঁর চেহারা ম্লান, এবং তাঁর রক্তিম ওষ্ঠ দীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, পা দুটিতে ক্ষত হয়েছিলো। গৌতম শাক্য গণ-এ পিতা শুদ্ধোদনের সমৃদ্ধ কুল ত্যাগ করে ভিক্ষাচর্যা স্বীকার করেছেন বলে যারা শুনেছিলো, তারা যখন যশোধরার রূপ-লাবণ্য দেখলো তখন গৌতমের মহান্ ত্যাগের পরিমাণ বুঝতে পারলো। আমি তো শাক্য গণপতি শুদ্ধোদনের নাম আর পদমর্যাদার সঙ্গে সমধিক পরিচিত ছিলাম। তাই গৌতমের ধর্মব্যাখ্যা শোনার জন্যে কখনও ব্যগ্র হইনি। তবু গৌতমের ব্যক্তিত্বকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি, আর লিচ্ছবিদের তো তিনি পরম মিত্র। যখন আমাদের এখানে মহামারী দেখা দিয়েছিলো, তখন তিনি এসে সকলকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। এবারও যখন মগধের দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলো, তখন আমাদের অজেয়তা সম্বন্ধে মগধরাজকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে যুদ্ধ তো বিম্বিসারের জন্যে নয়, অজাতশত্রুর জন্যেই বেধেছিলো। যদি তিনি অজাতশত্রুর কথা না শুনতেন, তবে সে নিজের পিতাকেই বন্দী-গৃহে আবদ্ধ করতো —এ কথা বিম্বিসারের ভালো করেই জানা ছিলো।

প্রথম লিচ্ছবি —শ্রমণ গৌতমের একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। তিনি অপরের মনের গতি পরিবর্তন করতে পারেন। তা কোনো যাদু বা মন্ত্র দ্বারা নয়। তাঁর বাচনভঙ্গী বড়ো মধুর। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, একজন গরীব লোক থেকে প্রসেনজিৎ বা বিম্বিসার পর্যন্ত সকলের প্রতিই তাঁর ব্যবহার সমান স্নেহপূর্ণ। আর তাঁর প্রতিভার কথা কি বলবো। আমাদের এখানে এক নগ্ন সাধু ছিলো। বৈশালীতে এসে সে বেশ জমিয়ে বসেছিলো। সে খাদ্য হিসেবে কেবল মাংস আর পানীয় হিসেবে কেবল সুরা পান করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। লোকে তো তাকে সিদ্ধপুরুষ বলেই মনে করতো। সে বড়াই করতো যে —আমার কাছে গৌতম কিছুই নয়। কিন্তু একদিন যখন সে শ্রমণ গৌতমের সামনে পড়ে গেলো, তখন আর তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না।

অনেকক্ষণ ধরে এমনি সব নানা কথার পর যে যার বাড়ীতে ফিরলো।

কিছুদিন পরে সংস্থাগারে আবার সেইরকম বাইরের কথা আলোচনা হচ্ছিলো। অনেক রাজা আর ধর্মাচার্যের কথা লোকে বলাবলি করছিলো। তারই মধ্যে গৌতমের কথাও উঠলো।

প্রথম লিচ্ছবি —শ্রমণ গৌতমকে যে বুদ্ধ বলা হয়, তা সত্যিই তিনি বুদ্ধ। তাঁর বোধ অপার এবং অপরকেও বোধ অর্থাৎ জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। তিনি অন্ধ ভক্তির বশে শ্রদ্ধা কামনা করেন না।

দ্বিতীয় লিচ্ছবি— আপনারা বোধ হয় শুনেছেন, তিনি কেশপুত্রবাসী

কালামদের [একটি জাতি] কী সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন। কেশপুত্র কোশলে অরণ্যবর্তী একটা বড়ো গ্রাম। শ্রাবস্তীগামী প্রত্যেকটি সার্থকে সেখানে বিশ্রাম করতে হয়। আমিও একবার সেখানে সার্থের সঙ্গে দু'দিন দু'রাত ছিলাম। গ্রামের সব কালামরাই বুদ্ধের শিষ্য। ভ্রমণ করতে করতে যখন গোতম কেশপুত্রে পেঁছালেন, তখন কালামরা তাঁকে প্রশ্ন করলো —যতো তীর্থংকর, যতো ধর্মাচার্য দেখি, তাঁরা সকলেই একে অপরের বিরোধী। আমরা তাঁদের মধ্যে কার কথা সত্য বলে বুঝবো ? গোতম কি উত্তর দিলেন জানেন ? তাঁর উত্তর অত্যন্ত সুন্দর অথচ সরল ছিলো : সোনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করবার জন্যে যেখানে যতো সোনা আছে তার পেছনে ছোটাছুটি করলে কোনো ফল হবে না। নিজের কাছে যে কষ্টি-পাথর আছে, তাতেই সোনার আসল-নকল যাচাই করতে হবে। অতএব তোমরা কোনো ধর্মাচার্যের রূপ-সৌন্দর্য, তাঁর বাগ্মিতা বা লোকপ্রসিদ্ধি দেখে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করো না। পরন্তু তার জন্যে তোমরা তোমাদের বুদ্ধি এবং অনুভবকে কষ্টিপাথর করো।—রূপ-সৌন্দর্য, বাগ্মিতা বা লোকপ্রসিদ্ধির দিক থেকে গোতমের মতো আর কেউ নেই, তবুও তিনি কি-রকম স্পষ্ট কথাই না বললেন !

অপর একজন লিচ্ছবি বললেন —সব ধর্মাচার্যই বলেন; আমার উপদেশ-রত্ন বজ্রমুষ্টিতে রক্ষা করো। কিন্তু গোতমের উপদেশ একেবারে উল্টো। তিনি একবার একটা উপমা দিয়েছিলেন—একজন লোক বর্ষাকালে অচিরবতী [রাপ্তী] নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিলো। নদীর দু'কূল ভরা— সেখানে কোনো নৌকা বা সেতু নেই —অথচ সেই লোকটাকে পারে যেতে হবে। তাই সে ভাবতে লাগলো। তারপর কতকগুলো কাঠ একত্র করে সে একটা ভেলা তৈরী করে সেই ভেলায় চড়ে নদী পার হলো। ভেলাটা তার কতোটা উপকার করেছিলো তা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই উপকারের কথা স্মরণ করে সে যদি ভেলাটাকে মাথায় তুলে নেয়, তাহলে যে গ্রামে সে যাবে সেখানে তাকে সকলেই নিরেট মূর্খ ভাববে। তারা বলবে —ওরে মূর্খ, ভেলা নদী পার হবার জন্যে ; মাথায় নিয়ে বেড়াবার জন্যে নয়।—এই কথা বলে তিনি শিষ্যদের বললেন —আমার উপদেশ ভেলার মতো কেবল পারে উত্তরণের জন্যে —ধরে রাখবার জন্যে নয়।

সেদিন শ্রমণ গোতমের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগলো। এ বিষয়ে যখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের সঙ্গে কথা বললাম, তিনি বললেন —সিংহ, সেই নাস্তিক অক্রিয়াবাদীর [যিনি ভালো-মন্দ ক্রিয়া স্বীকার করেন না] কাছে কিসের জন্যে যাবে ?

আরো অনেক কিছু বলে তিনি নিষেধ করলেন। নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের

ওপর আমার শ্রদ্ধা এত বলবতী ছিলো যে, তাঁর কথা শুনে আমি আমার সংকল্প ত্যাগ করলাম।

দু'জন ধর্মাচার্য'ই বর্ষার তিন মাস অতিবাহিত করবেন বলে বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের সংস্থাগারে জমায়েত হতেই হতো। সংস্থাগারে বসে যাঁরা কথাবার্তা বলেন, তাঁরা রাস্তার সাধারণ লোক নন —সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবির দল। একদিন কথাবার্তা হতে হতে আবার শ্রমণ গৌতমের প্রসঙ্গ এসে পড়লো।

সুপ্রিয় বললো --ভাই, শ্রমণ গৌতম আমাদের গণ-ক্ষত্রিয়দের মহান্ গৌরবের পাত্র। এ-পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা গণ-এর লোকদের মেষ নাহলেও, লড়িয়ে নেকড়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতো না। বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন বলে ব্রাহ্মণরা আমাদের তিরস্কার করতো। কিন্তু আজ অঙ্গ-মগধের কূটদন্ত, স্বর্ণদণ্ডের মতো বিখ্যাত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রমণ গৌতমের শিষ্য হয়েছেন। বজ্জী বিদেহের অদ্বিতীয় বিদ্বান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীর্ঘায়ুও গৌতমের শিষ্য। পাঁচশো বিদ্যার্থী'র বেদ-অধ্যাপক রাজগুরু ব্রাহ্মণ মহাশালও শ্রমণ গৌতমকে নিজের গুরু এবং একজন মহান্ ঋষি বলে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণরা নিজেদের অষ্টক, বামদেব প্রভৃতি ছাড়া কোনো গণ-সন্তানকে যে ঋষি বলে স্বীকার করবে, এটা ছিলো ধারণারও অতীত। শুধু তাই নয় —শ্রমণ গৌতমের শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকাত্যায়নের মতো প্রতিভা-শালী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মকুল থেকে প্রব্রজিত হয়েছেন। তাঁরা বিদ্যা আর প্রতিভার দিক দিয়ে এতোখানি উচ্চে যে ইচ্ছা করলে নিজের নিজের আলাদা মত প্রচার করতে পারতেন, আর তাহলে তাঁরা বড়ো তীর্থংকর বলে খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা শ্রমণ গৌতমকেই নিজেদের উপদেষ্টা বলে স্বীকার করেন। যে কুরু-পঞ্চালকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের বেদ এবং জ্ঞানের খনি বলে মনে করতেন, সেখানেও আজকাল গৌতমের উপদেশ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা হয়। তক্ষশীলার প্রাক্তন গণপতি কপ্পিন অপরের মুখ থেকে কোথায় যেন গৌতমের উপদেশ শুনে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করে এসে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের [বৌদ্ধ ভিক্ষু] অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এমনি ঘটনা কতো যে আছে, বলে শেষ করা যাবে না।

মহানাম —হাতের মধুগোলকের [লাড্ডু] মিষ্টত্বের প্রশংসা মুখে বলার অপেক্ষা রাখে না। সে তো জিভে পড়লেই বোঝা যায়। আজকাল তো আমাদের হাজার হাজার নর-নারী প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহাবনের কূটাগার-শালায় গিয়ে শ্রমণ গৌতমের উপদেশবাণী শ্রবণ করে আর প্রশংসাও করে থাকে।

সেদিন আমার মন শ্রমণ গৌতমের কাছে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে

উঠলো। প্রত্যহের মতো আজ যখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রকে দর্শন করতে গেলাম, তখন তাঁকে বললাম —পূজ্য, শ্রমণ গৌতম কে, তা আমি জানি না। আমি শুধু তাঁর নাম শুনেছি। কিন্তু লিচ্ছবিরা তাঁর খুব প্রশংসা করে। আমার বিশ্বাস, আপনার মতো তাঁর তপ-তেজ নেই। আমি সেখানে গিয়ে শ্রমণ গৌতমকে দর্শন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।

মহাবীর —সেই তপ-তেজহীন ব্যক্তির কাছে তুমি কিজন্যে যাবে সিংহ? সে গদিতে শয়ন করে, কাশীর কোমল কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করে, নানারকম সুস্বাদু মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করে। তার কাছে কি তপস্যার গন্ধমাত্রও পাওয়া যাবে?

—এইজন্যেই আমি তাঁকে চোখে দেখতে চাই। আর মোহগ্রস্ত লিচ্ছবিদের তাদের ভ্রান্তিটা বুঝিয়ে দিতে চাই।

মহাবীর —অন্য কিছু নয় সিংহ! বশ আবর্তনী মায়া [যাদু] তার জানা আছে, যার দ্বারা সে অপরের মন পরিবর্তন করতে পারে! সেই মায়াবীর কাছে যেয়ো না সিংহ!

নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র আরো অনেক রকমে বুঝিয়ে আমার সেখানে যাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এইরকম কথাবার্তার ফল আমার ওপর উল্টোই হলো। সেখান থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে আমি নিজের মনেই বললাম—নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের কাছে আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি বিক্রী করে তো দিইনি! কোথাও পরীক্ষা করতে আমার যাওয়া-আসায় বাধা দেবার কোনো অধিকার তাঁর নেই। আমি নিজে গিয়ে দেখবো যে শ্রমণ গৌতম কেমন পুরুষ, তাঁর কি গুণ আছে যার ফলে বিশিষ্ট লিচ্ছবিরা তাঁর এতো প্রশংসা করছেন।

সন্ধ্যায় অসংখ্য লিচ্ছবি নর-নারী কূটাগারশালার দিকে যাচ্ছিলো। তাদের মধ্যে আমার মা, কাকী, ভামা আর রোহিণীও ছিলো। আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম।

আমার ওপর ভামার নজর পড়েছিলো। সে চুপিসারে আমার কাছে চলে এসে আমার হাত ধরে বললো —আজ আবার কি হলো দেবর যে তুমি সেই নগ্ন শ্রমণকে ছেড়ে এদিকে চলে এলে? এমন অকাল-কুসুম ফুটলো কি করে?

—বৌদি! তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যখন শ্রমণ গৌতমের উপদেশ শুনতে যাচ্ছো, তখন এইরকম হাস্য-পরিহাস করতে সংকোচ বোধ হচ্ছে না?

—শ্রমণ গৌতম শরীর এবং মনের স্বাস্থ্য পছন্দ করেন। শরীর-মনকে শুকনো করে মারা পছন্দ করেন না।

—তোমরা দেখছি শ্রমণ গৌতমের পাকা শিষ্যা বনে গেছো?

—গৌতমের কাছে পাকা-কাঁচার প্রশ্ন নেই। তিনি চান —সকলকেই

তাদের বর্তমান স্থিতি থেকে অগ্রসর হতে হবে। আর যারা অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাদের দেখে খুশী হতে হবে।

—তুমি নিজের সমগ্র লিচ্ছবি নারী-সেনাবাহিনীকে গোতমের সেনা-বাহিনীতে পরিবর্তন করতে চাইছো না তো?

—সারা সৈন্যবাহিনীকে পরিবর্তন করার কথাই এখানে উঠছে না দেবর! এখানে প্রত্যেককে নিজের বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত করতে হয়।

—মা আর কাকী কবে থেকে উপদেশ শুনতে শুরু করেছেন?

—কতো বছর হবে তা তো বলতে পারি না। বোধ হয় তুমি যখন তক্ষশীলায় গেছো, তখন থেকেই। তারা বলতে তবেই প্রথম দিন আমি এখানে এসেছিলাম।

—আর রোহিণী?

—তুমি রোজই নগ্ন শ্রমণের উপদেশ শুনতে যাও, বেচারা একা ঘরে পড়ে থাকে। তাই তাকে বললাম, তুমিও শ্রমণ গোতমকে দর্শন করবে চলো।

—তাহলে আমার অজ্ঞাতেই আমার বাড়ীতে গোতমের অধিকার হয়ে গেছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে দেবর! একদিন রোহিণী তো গোতমের উপদেশ শোনার পর এমন কথাও বললো যে, ভগবন্, আমার গর্ভে এই যে সন্তান আছে, তার পক্ষ থেকেও আমি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

—বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ?

—যে শ্রমণ গোতমের ধর্মকে স্বীকার করে, সে ত্রিরত্ন অর্থাৎ তিন রত্ন —বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ নেয়। অর্থাৎ এদেরই নিজের পথ-প্রদর্শক বলে স্বীকার করে।

—শরণের অর্থ তো বুঝলাম। কিন্তু ত্রিরত্ন বলে কেন?

—বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘকে ত্রিরত্ন বলে। কারণ এই জগতে রত্নের মতোই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ।

—বুদ্ধ কি?

—সংক্ষেপে বুদ্ধ বলা হয় তাঁকে, যিনি বোধ-জ্ঞান-সত্য দর্শন করেছেন। অর্থাৎ জীবনপথে অগ্রসর হতে হতে যিনি জ্ঞান, দয়া এবং সহিষ্ণুতার চরমে পেঁছেছেন। প্রাণী কেবল নিজের চেষ্টায় —কোনো ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা মার্গ-এর সহায়তায় নয় —শুধু নিজের চেষ্টাতেই নিজের জীবনকে উন্নত করতে করতে শেষে বুদ্ধত্ব লাভ করে। বর্তমানে শাক্যপুত্র এমন একজন বুদ্ধ। এমন বুদ্ধ আগেও অনেক হয়েছেন, পরেও হবেন। এমন বুদ্ধগণ যাত্রাপথে পথ-প্রদর্শকরূপে সহায়ক হন। বুদ্ধ শ্রমণ গোতম নিজেকে কেবলমাত্র মার্গাখ্যায়ী [পথ-প্রদর্শক] বলে অভিহিত করেন, ধরে-বেঁধে পথে নিয়ে যাবার লোক বলেন না।

—আর ধর্ম ?

—বোধগম্য মার্গকেই বলা হয়, যা বুদ্ধ নিজের চিন্তন, নিজের প্রযত্ন দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু ধর্মের শরণ গ্রহণের ব্যাপারে বুদ্ধ অন্ধ শ্রদ্ধার কথা বলেন না।

—এখন বলো, সঙ্ঘ কি ?

—বুদ্ধ আর ধর্মকে মার্গাখ্যায়ী [পথ-প্রদর্শক] আর মার্গ [পথ] স্বীকার করে যেসব স্ত্রী-পুরুষ—ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা —যথাশক্তি সেইমতো চলবার চেষ্টা করে, তারাই সঙ্ঘ। মানুষ যদি নিজের সিদ্ধান্তকে সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্যে একের অধিক বুদ্ধি আর অনুভবের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার কাজ সহজ হয় আর ঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছাবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী থাকে।

—কিন্তু বৌদি, তুমি তো কখনও এ কথা আমাকে বলোনি, এখানে আসতেও অনুরোধ করোনি !

—আমি বুঝেছিলাম, মেধাবী লোককে কখনও কেউ পথ আটকে রাখতে পারবে না। তাই সময়ের প্রতীক্ষা করছিলাম।

—কিন্তু নিগ্রন্থ-পন্থ তো এখনো আমাকে আটকে রেখেছে।

—এটা কিন্তু ভারী আশ্চর্য দেবর ! আমি তো শুনেছিলাম যে নিগ্রন্থ নিজের শ্রাবক-শ্রাবিকাদের অন্য কোনো ধর্মের উপদেশ শুনতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। যাক্, এখন আমরা কূটাগারের কাছে এসে গেছি। এখন আমাদের আলোচনা বন্ধ করা উচিত।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করার সময় সেখানকার নীরবতা দেখে আমি ভামার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম—বৌদি, এখানে শ্রমণ গৌতম কি একাই থাকেন ?

—না। তাঁর পাঁচশো ভিক্ষুও এখানে থাকেন। আর এখন তো শত শত গৃহস্থ শিষ্য-শিষ্যাও এসে পড়েছে।

—কিন্তু কোনো শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি না।

—বুদ্ধ নীরবতা পছন্দ করেন। তাঁর শিষ্যরাও হৈচৈ করে অপরকে উত্যক্ত করতে চায় না।

কূটাগারের একদিকে অন্ধকুটীর ছিলো। তার সামনে বৃহৎ আঙ্গিনায় গন্ধকুটীরের কাছে এক আসনে বুদ্ধ আসীন ছিলেন। তাঁর পেছনে দক্ষিণ দিকে অরুণবর্ণ কাষায় বস্ত্রধারী বহু ভিক্ষু বিনীতভাবে বসে আছেন। আর বাম দিকে বহু কাষায়বসনা ভিক্ষুণী উপবিষ্টা। সামনের দিকে স্ত্রী পুরুষ পৃথক-পৃথকভাবে বসে আছেন। প্রত্যেক লোকই শ্রমণ গৌতমকে বন্দনা করছে, তারপর সুবিধামতো জায়গায় গিয়ে বসে পড়ছে। এই ব্যবস্থা

আমার বড়োই ভালো লাগলো। শ্রমণ গোতমকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিলো, সুতরাং আমি তাঁর কাছে গিয়ে বন্দনা করে ভূমিতে বসতে বসতে বললাম —পূজ্য গোতম! আমাকে নানারকম কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। লিচ্ছবি-সেনাপতির কাজ এমনই। কয়েক দিন ধরেই আপনাকে দর্শন আর কয়েকটি প্রশ্ন করবো বলে আসতে চাইছি, কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্নের জন্যে তা আর হয়ে উঠছিলো না।

বুদ্ধ —তুমিই তাহলে লিচ্ছবি-সেনাপতি সিংহ! আহত শত্রুদের প্রতি তুমি যে উদারতা আর দয়া দেখিয়েছো, তা খুবই প্রশংসনীয়। নিজের দয়ার ক্ষেত্র বাড়ানো উচিত। যখন সেই দয়ার ক্ষেত্র বাড়তে বাড়তে শত্রুকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তখনই মানুষের মধ্যে দেব-ভাব আসে।

আমি —কিন্তু আমি তো সামান্য কাজই করেছি।

বুদ্ধ —কাজটা সামান্য ছিলো না। তাছাড়া কাজের মহত্ত্ব পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে হৃদয়ের ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্বের ওপর। এই যুদ্ধের মধ্যে আমি তোমার আরো অনেক গুণের কথা শুনেছি। আমি জানি তোমার অনেক কাজ। অতএব তোমার যা প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারো।

আমি —পূজ্য! আপনার বিরোধীরা বলে বেড়ায় যে আপনি নাস্তিক, আত্মা আর পরলোক মানেন না! যারা আপনার সম্বন্ধে এ কথা বলে, তারা কি সত্যি কথা বলে, না আপনার ওপর মিথ্যা আরোপ করে?

বুদ্ধ —তারা সত্যি কথাই বলে, আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে না। আমি এমন কোনো আত্মাকে মানি না, যা দু'পলও একই রকম থাকে-সারা জন্ম, কিংবা এক দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবেশ করার মতো নিত্য-ধ্রুব আত্মা তো দূরের কথা! আচ্ছা সেনাপতি, যখন পাংশু-ক্রীড়া করতে, তখনকার মতো এখনো কি তুমি ঠিক তেমনি আছো মনে করো?

আমি —ঠিক বলেছেন ভগবন্! আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে আমার জ্ঞান, রুচি, প্রবৃত্তি প্রভৃতিতে বরাবরই পরিবর্তন দেখে আসছি। আমার সন্দেহ হয়েছে যে তক্ষশীলা যাবার সময় আমি যেমন ছিলাম, ফেরার পর আর তেমনটি নেই। এই দুটি অবস্থার মধ্যে আমি প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। কেবল আত্মা-আত্মা বলে লোকের প্রচারের জন্যেই এতোদিন আত্মাকে স্বীকার করে এসেছি। কিন্তু যদি এইরকম পরিবর্তনের জন্যে কোনো নিত্য-ধ্রুব আত্মাকে না মানতাম, তাহলেই বোধ হয় ঠিক হতো।

বুদ্ধ —এই আত্মাকেই না মানার জন্যে আমার বিরোধীরা আমাকে নাস্তিক বলে। জড়-চেতন, দেব-ব্রাহ্মণ —কোনো কিছুকেই আমি নিত্য-ধ্রুব বলে মনে করি না। যা কিছু আছে, তা জন্মগ্রহণ করেছে। যা কিছু

জন্মেছে, তা-ই মরণশীল, নষ্ট হবে। নিত্য-ধ্রুব আত্মার কথা শুধু ভ্রম আর লোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনকে আমি অস্বীকার করি না সেনাপতি। কিন্তু জীবন নদীর প্রবাহ —তা প্রতি মুহূর্তেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। যদি তা পরিবর্তিত হবার, নতুন হবার সুযোগ না থাকতো —তাহলে আমাদের সমস্ত সুকর্ম, সুবিচার, সুবচন সবই নিষ্ফল হতো। কারণ নিত্য-ধ্রুব জীবনের ওপর তার কোনো প্রবাহ সম্ভব হতো না। আমি জীবনের নিরন্তর পরিবর্তনের, নতুন হওয়ার কথা স্বীকার করি। তবে ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক বা অপরাপর তীর্থংকররা যেভাবে মানেন, আমি সেভাবে মানি না। তাই তাঁরা আমাকে নাস্তিক বলেন। কিন্তু আমি তো জীবনকে বা জীবনের উচ্চ স্তরে যাবার সম্ভাবনা অস্বীকার করি না। আর এই জন্যেই আমার সম্বন্ধে যারা সত্য কথা বলে, তাদের আমাকে আস্তিক বলা উচিত।

আমি —আর আমি বলবো, ঠিক অর্থে আপনিই আস্তিক। কারণ যারা জীবনকে নিত্য-ধ্রুব স্বীকার করে তাতে কোনো স্রোত, কোনো প্রবাহের সুযোগ রাখে না, তাদের জীবনকে স্বীকার করা না-করা একই কথা।

বুদ্ধ —আত্মার নামে যে মিথ্যা ধারণা, যে অকর্মণ্যতা দেখা দিয়েছে, তা দেখেই আমি বলি —আত্মাকে দেখার দৃষ্টি, বিচার-প্রণালীটাই মিথ্যা দৃষ্টি বা বিচার-প্রণালী। যে নিত্য-ধ্রুব আত্মায় বিশ্বাসী, সে কেন জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে? সে শুধু ভাগ্যবাদী, অকর্মণ্যতাবাদীই হতে পারে।

আমি —বুঝেছি ভগবন্! আপনি যথার্থবাদী। অযথার্থবাদী নন। আপনি বস্তুবাদী। কল্পনাবাদী নন। আর একটা কথা —আমি আপনার বিরোধী শ্রমণ আর ব্রাহ্মণদের বলতে শুনেছি যে শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী! এ কথাটা যারা বলে, তারা কি আপনার সম্পর্কে সত্য কথা বলে, না আপনার ওপর মিথ্যা আরোপ করে?

বুদ্ধ —এক অর্থে তারা সত্য কথাই বলে, সেনাপতি। কতো শ্রমণ আর ব্রাহ্মণ আছেন —যাঁরা আহার করা ছেড়ে দিয়ে, অনাহারে থেকে শরীরকে শুষ্ক করা, প্রাণত্যাগ করাকে পর্যন্ত ক্রিয়া বলেন। তাঁরা বলেন, এমনি করে পুরানো পাপ দূর করে মানুষ নিষ্পাপ হতে পারে। আমি তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে মূঢ়তা বলি। তাঁরা যখন আত্মা আর শরীরকে পৃথক বলেই মনে করেন, তখন শরীরকে শুকোলে আত্মা কি করে শুদ্ধ হবে সেনাপতি? অনাহারে মরলে, উলঙ্গ থাকলে কিংবা দেহকে কষ্ট দিলে জীবনের শুদ্ধিলাভ হয় —এটা যারা মনে করে তাদের জ্ঞান মিথ্যা, বুদ্ধি বালকের মতো। আমি বহু বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা, ক্রিয়াদি করেছি।

আমি দেখেছি, জীবনের ওপর তার কোনো প্রভাব নেই। আমাদের বিচার, আমাদের মনঃসংযম, রাগ-দ্বেষ-মোহের মূলীভূত কারণগুলিকে দূর করার চেষ্টাই জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে দেখতে গেলে আমি অক্রিয়াবাদীও বটে। কারণ ঐসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাকে ক্রিয়া বলেন তাকে আমি অক্রিয়া বলি। কিন্তু সেনাপতি, আমি সেইসঙ্গে ক্রিয়াবাদীও বটে! কারণ আমি সুকর্ম, সুবচন, সুবিচারকে মানি এবং এদের দ্বারা জীবনের উন্নতি লাভের কথা স্বীকার করি।

আমি —চমৎকার! আপনার অক্রিয়াবাদ জীবনের উচ্চ স্তরে পেঁছাবার প্রকৃষ্ট উপায়। হে ভগবন্! আপনার বিরোধীরা বলে, শ্রমণ গৌতম তপ-তেজহীন। তাদের এ কথা কি ঠিক?

বুদ্ধ —তারা যে কাকে তপ-তেজ বলে, আমি জানি না। যদি তারা তপ-তেজ বলতে কৃচ্ছ্রসাধন, অর্থাৎ শরীরের অযত্নকে বোঝায়, অথবা শরীরকেই সার মেনে নিয়ে তার সেবা করা, তাহলে আমি সে কথা স্বীকার করছি। আমি দু'রকমের পথকেই খারাপ বলে মনে করি। মানুষের দেহের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করাও যেমন উচিত নয়, তেমনি শরীরকে শুষ্ক করে তাকে অকর্মণ্য করাও উচিত নয়। আমি এই দুই চরম পথ ত্যাগ করে মধ্য পথে চলতে বলি। এইজন্যেই ওরা বলে শ্রমণ গৌতম তপ-তেজহীন।

সন্তুষ্টচিত্তে আমি বললাম —ভগবন্! আপনার বিষয়ে আমি যেমন শুনেছিলাম, তার চেয়ে মহত্তর রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়েছি। আমি বুদ্ধ ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ নিলাম। আজ থেকে ভগবন্ আমাকে আপনার শ্রাবক [অনুগামী] বলে মনে করবেন। আগামীকাল অনুগ্রহ করে সংঘের সঙ্গে আমার ভোজন-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

ভগবান্ মৌন থেকে আমার প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃতি দিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ষাট বৎসর অতিক্রান্ত। কিন্তু তখনো তাঁর সুদীপ্ত মুখমণ্ডল থেকে যেন প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে। তাঁর সুবিশাল নয়নযুগলের দৃষ্টিতে মৈত্রী আর করুণা ঝরে পড়ছে। আমি তাঁর চরণ বন্দনা করে ফটকের বাইরে আসতে আসতে দেখলাম, মা, কাকী, রোহিণী আর ভামাও পেঁছে গেছে।

মা অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন —দেখলে তো পুত্র, আমাদের ভগবান্ কেমন অর্থসঙ্গত, বুদ্ধিসঙ্গত, সুন্দর ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।

আমি —এ কথা ঠিক মা। সংস্থাগারেই ভগবানের প্রশংসা শুনেছিলাম। কিন্তু যখনি এখানে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, তখনি নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নিষেধ করেছেন। আজ আমি সে নিষেধ মানতে রাজী হইনি। জাতি গৌরবের সম্মানেই জ্ঞাতৃপুত্রের ধর্ম আগে মেনে নিয়েছিলাম।

পরদিন আমি গো-ঘাতক, শূকর-ঘাতকের নিকট যে তৈরী মাংস ছিলো, তা আনিয়ে নিলাম এবং খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে ভগবান্‌কে সংবাদ দিলাম। যখন সঙ্ঘের সঙ্গে ভগবান্ ভোজন করছিলেন, তখন নিগ্রন্থরা [জৈন সাধু] বৈশালীর চৌমাথার ওপর দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলছিলো —সেনাপতি সিংহ অধর্মী —সেনাপতি সিংহ পাপী। সে শ্রমণ গৌতমের জন্যে গরু মেরেছে, শূকর মেরেছে। শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শ্রামণ্য সন্ন্যাস এখন কোথায়? নিজের জন্যে বধ করা গরু ও শূকর-মাংস খাবার সময় শ্রমণ গৌতমের ধর্ম কোথায় গেলো?

নিগ্রন্থদের এসব কথা একেবারেই মিথ্যা ছিলো। আমি পশুকে হত্যা করিনি বা হত্যা করাইনি। সে-রকম কোনো মাংস আমি ভগবান্‌কে দিইনি। আমি দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ওদের দুঃখ হয়েছিলো —তাই নির্বোধ শিশুর মতো ওরা চিৎকার করছিলো।

তেইশ

সেনাপতি সিংহ

আমি এখন সেনাপতির গৃহে বাস করছি, আর আমার বন্ধুদেরও অধিকাংশ সময় কাটছে আমারই কাছে। নিগ্রন্থের ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়েছি বলে এখন আমি মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলতে পারি, মাংসে স্বাদগ্রহণ করতে পারি, পান এবং নৃত্যেও অংশগ্রহণ করতে পারি। ভামার মধুর বাক্যাবলীও হৃদয়রঞ্জনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

একদিন মগধ-সেনাপতির কথা উঠলো। আমি বললাম —তিনি সত্যিকারের নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। সৈন্যদের অধিকাংশ ছত্রভঙ্গ হবার পরও তিনি নিজের হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

কপিল —তাহলে মিত্র সিংহ, এবারও আবার তুমি সেই মহাসিন্ধুর তটেরই পুনরাবৃত্তি করেছো ?

—ঠিক পুনরাবৃত্তি বলতে পারি না মিত্র। আমি কেবল যুদ্ধের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়িনি। হাতীটার বৈশিষ্ট্য দেখে আমার মনে হয়েছিলো যে, সম্ভবত ওর আরোহী অজাতশত্রু। আর আমি তাঁকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু সেখানে শত্রুসেনার সংখ্যা ছিল প্রচুর।

—কিন্তু কখনো কখনো এ-রকম সাহস দেখাতেই হয়। কিন্তু মিত্র, দু'বার মগধ-সেনাপতি আমার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করেছেন এবং প্রত্যাক্রমণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় বার আর পারেননি। কপিল, সেই লিচ্ছবি-তরুণের কার্যকলাপে আমি বিস্মিত হয়েছি। কি আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গেই না সে মাহুত আর হাতীকে কাবু করে তাদের স্কন্ধাবারে [সৈন্যদের ছাউনি] আসতে বাধ্য করেছিলো ! সমগ্র যুদ্ধের মধ্যে এই একটি মাত্র আপসোস আমার থেকে গেছে যে, সামান্য একটা মুখের কথা বলেও আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি। আর সেও যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

ভামা —দেবর, তুমি তাকে চিনতে পারোনি ?

—তার চেহারাটা আমার স্মরণ নেই। তবে তার মুখের ওপর ছোট ছোট গোঁফ ছিলো। কিন্তু আমি ভালো করে তার চেহারা দেখতে পাইনি। শিরস্ত্রাণ, বর্ম, খড়্গ তো সকলেরই একরকম। শুধু একটা কথা মনে আছে,

অঙ্কুশটা কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে তার হাতে চোট লেগেছিলো। আমি রক্তপাত হতে দেখেছিলাম।

—হাতে চোট লেগেছিলো ? তাহলে তো দেবর সেই সৈনিককে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

—না বৌদি ! সে বোধ হয় আবার মাগধী সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলো। বেঁচে ফিরে এলে সে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করতো। মুখে কিছু বলবার অবকাশ আমার হয়নি, কিন্তু আমাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছিলো যে তার বীরত্বে আমি কতোটা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

—কিন্তু দেবর ! এমন অনেক সৈনিকও তো আছে, যারা পারিতোষিকের আশা না করে নিজের কাজ গোপন রাখারই চেষ্টা করে !

—হ্যাঁ, এমন বীরও আছে। কিন্তু বৌদি, এ ব্যাপারে আমার আপসোস চিরকাল থেকে যাবে।

—যদি আমি সেই তরুণকে খুঁজে বার করতে পারি ?

—তাহলে আমি তোমার কাছে সত্যিই অনুগৃহীত হবো।

—আমার কাছে তুমি কতো যে অনুগৃহীত হবে, তা আমি অনেক বারই দেখেছি। আমরা কতো কষ্ট করে তীর-তরবারি চালনা শিক্ষা করলাম, তোমার কাছে জোড়হাত করেই রইলাম —তবু আমাদের সুযোগ দিলে না। তুমি লিচ্ছবি-নারীদের লিচ্ছবি-পুরুষদের পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়াবার যোগ্য বলেই মনে করো না।

—কিন্তু যে কাজ তোমরা হাতে নিয়েছিলে, তাতেও বিপদের মাত্রা কম ছিলো না। আমি রোহিণীর হাতে বর্শার আঘাতের ক্ষত দেখেছিলাম।

—বর্শার আঘাত খাওয়া আর বর্শা চালানো এক কথা নয় দেবর।

—সে কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের সংখ্যার তুলনায় কাজটা এতো বেশী ছিলো যে লড়াইয়ের কাজে আর টেনে আনা উচিত মনে করিনি।

—কিন্তু যা তুমি স্বেচ্ছায় দাওনি, আমরা তা নিজেদের ইচ্ছায় গ্রহণ করেছি।

আমি আশ্চর্যভাবে বললাম —তোমাদের সেনাপতির আদেশ ছাড়াই তোমরা যুদ্ধে তরবারি-চালনা করেছিলে না-কি ?

—বিনা আদেশেও বলতে পারো, আবার আদেশ অনুসারেও বলতে পারো।

—সে আবার কী ?

—লড়াই চলার সময় বর্শা আর তীর বর্ষণের মধ্যে আহতদের বার করে আনা তো আদেশ-বিরুদ্ধ নয় ?

—না।

—সে সময় কার্যরতাদের রক্ষার জন্যে শস্ত্রধারিণীদের দল প্রস্তুত থাকাও তো আদেশ-বিরুদ্ধ নয় ?

—না।

—এখন আমি জানতে চাই, কতোদূরে পর্যন্ত গেলে আদেশ অমান্য করা হয়। আর সে সময় যদি লিচ্ছবি-নারীর নয়, লিচ্ছবি-পুরুষের প্রাণরক্ষার জন্যে তরবারি-চালনা করতে হয়, তাহলে সেটা আদেশ-বিরুদ্ধ নয় তো ?

—কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলো না যে তোমরা এতোদূর পর্যন্ত যাও।

—আমি আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করছি সেনাপতি।

—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদেশ নিতে হতো।

—আদেশ-বিরোধী কাজ হতো না তো ?

—এক অর্থে আদেশ-বিরোধী হতো না, এক অর্থে হতো।

—তোমার উত্তরের পূর্বার্ধটুকুই আমাদের প্রয়োজন।

—তাহলে তোমরা তরবারি-চালনা করেছিলে বৌদি ?

—নিশ্চয়। কিন্তু তুমি যতোটা অপরাধী, আমরা ততোটা নই দেবর।

—কেমন করে ?

—তুমি উপ-সেনাপতি ছিলে কি-না ? আর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনার ভার তোমার ওপর ছিলো তো ?

—ছিলো বৈকি।

—তুমি মগধ-সেনাপতিকে একা আক্রমণ করার সময় কি এ কথা খেয়াল করেছিলে যে, তোমার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ পরিচালনা কতোটা কঠিন হবে ? এক কথায়, এর ফলে জয় পরাজয়ে পরিবর্তিত হবার আশংকা ছিলো কি-না ?

—আমার এই ত্রুটি আমি স্বীকার করছি।

—তাহলে এমন ত্রুটিকারক নিজেদের সেনাপতিকে রক্ষার জন্যে যদি লিচ্ছবি-নারীসেনারা চেষ্টা করে, তাকে তো আদেশ-ভঙ্গ বলা হবে না দেবর ?

—আদেশ-ভঙ্গ সম্বন্ধে আমার মতামতের কথা বাদ দাও। সত্যিই কি তোমরা এ-রকম সাহস করেছিলে বৌদি ?

—আমাদের সাহস ছিলো বলেই সাহস করেছিলাম !

—আর সেই সময়, যখন মগধ-সেনাপতি হাতীর ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন —তাই নয় কি ?

—সে সময় তো বটেই, তাছাড়া অন্য সময়ও। তুমি অনেক বারই শরীর-রক্ষী ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলে কি-না ?

—কিন্তু আমি কখনো নিজেকে একলা হতে দেখিনি।

—শিবির থেকে বেরোবার সময় ?

—শিবির থেকে বেরোবার সময় অবশ্য অনেক বারই একলা ছিলাম ।

—সে সময় লিচ্ছবি-নারীরা যদি নিজেদের উপ-সেনাপতির শরীর রক্ষার ভার নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সেটা আদেশ-ভঙ্গ বলবে না তুমি ?

—আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। এখন বলো, নালাগিরিকে ধরার সময় সেখানকার লিচ্ছবি সেনাদের মধ্যে তোমরা কতোজন ছিলে ?

—সেখানে লিচ্ছবি সৈন্য খুব কমই ছিলো, আমরাই অধিক সংখ্যায় ছিলাম।

—এ কথা তুমি আমাকে এতোদিন বলোনি বৌদি !

—এখনো বলতাম না, যদি না দেখতাম যে সেই লিচ্ছবি-তরুণকে তার বীরত্বের পুরস্কার না দিতে পারার জন্যে এতোটা ক্ষুব্ধ হয়ে আছো ।

—তাহলে সেখানে কে-কে ছিলো ?

—আমাদের একটা পুরো দলই ছিলো। সেখানে ক্ষেমা, ভামা, রোহিণীও ছিলো।

—ক্ষেমা ! তুমি—আমাদের জনপদ-কল্যাণী ! আমি আমার পাশে উপবিষ্টা মৃদু হাসারতা ক্ষেমার মাথায় হাত রেখে বলে উঠলাম ।

ক্ষেমা —জনপদ-কল্যাণী না থাকলেও কিছু ক্ষতি হতো না সিংহ ভাই । কিন্তু সেনাপতি না থাকলে কি হতো, তুমিই বুঝে দেখো !

ভামা —এখন বলবো কি, সেখানে কোন তরুণ ছিলো, যে নালাগিরিকে গ্রেপ্তার করেছিলো ?

আমি —নিশ্চয়, বলো ।

—সে হলো আমাদের গান্ধারী বৌ ।

—রোহিণী !

—হ্যাঁ, রোহিণী। এখন সে রান্নাঘরে গেছে, ফিরে এলেই তার পুরস্কারটা পাওয়া চাই ।

—পুরস্কার ?

—হ্যাঁ, যে পুরস্কার তুমি দিতে চাইছিলে !

—এখন সে পারিতোষিক দেবার জন্যে আমার কাছে কি আছে ?

—তুমি নিজেকে এতো দরিদ্র মনে করো ? আচ্ছা, আমিই বলে দিচ্ছি —বিশেষ করে এই বীরত্ব স্মরণ করে চুম্বন, আলিঙ্গন। আর দেবর, হাতীর সঙ্গে যে অশ্বারোহী দল স্কন্ধাবারে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে ভামা আর ক্ষেমাও ছিলো ।

—স্কন্ধাবারে ?

—শুধু তাই নয়, রাত্রে যে অশ্বারোহী দল উল্কাচলে তোমার সঙ্গে এসেছিলো, তাদের মধ্যেও এই তিন জন ছিলো ।

—সেনাপতি সুমনের মৃত্যুর দিন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু রোহিণীকে পুরস্কার দেবার সময় দেখে নিও তার হাতে অংকুশ কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে যে আঘাত লেগেছিলো, তার চিহ্ন আছে কি-না ?

—আছে। আমি তা আগেই দেখেছি।

—তাহলে আমিও কি কিছু পুরস্কার পাবো দেবর ?

—পাবে। তবে কি পুরস্কার চাও, সেটা তোমাকেই বলতে হবে বৌদি।

—আমার মনোরথকে তোমার কাছেই রাখবে, যাতে আমি আর রোহিণী এক জায়গায় থাকতে পারি।

—এটা আমার সাধ্যায়ত্ত বৌদি। আমি মনোরথকে আমার কাছেই রাখবো; এতে তো আমারও স্বার্থ আছে।

—তোমার স্বার্থের সঙ্গে আমাদের দুটি প্রাণীর স্বার্থেরও মিল আছে। এবার ছোট বোন ক্ষেমার পুরস্কারটা ?

তুমিই বলো বৌদি !

—ও তোমার আর একটি বৌদি হোক।

—আর একটি বৌদি ! এ কথার অর্থ ?

—ভাবো। মনোরথ ছাড়া তোমার বড়ো ভাই কে আছে ?

কপিল ! বৌদি, পুরস্কার আর কি হতে পারে ? এ তো আমার কাছে মস্ত খুশীর খবর —বলে আমি ক্ষেমার ললাট চুম্বন করলাম।

ভামা—খুশীর খবরও পুরস্কার হতে পারে দেবর।